বসু মল্লিক ব্রাদার্স ॥ কলিকাতা ॥

মদন দত্ত
বন্ধুবরেষু

Mogol Sandhya, a historical fiction.
By
Nigurananda
Price 7·00 only

হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা। মুহূর্তের মধ্যে সুলতানী আমলের দৈন্য কাটিয়ে ভারতবর্ষ যেন শিল্প, সাহিত্য আর ঐশ্বর্যের এক আশ্চর্যলোকে এসে উপস্থিত হয়—যার পরিচয় অদ্যাবধি বিদ্যমান মোগল বাদশাদের অতুলনীয় স্থাপত্যকীর্তি—আগ্রা দুর্গ, ফতেপুরসিক্রি, সিকিন্দ্রা, ইতিমাদউদ্দৌলার সমাধি, লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ এবং সর্বশেষে মৃত্যুঞ্জয়ী মর্মরশিল্প তাজমহলের মধ্যে। ঐশ্বর্যের ঘনঘটায় সমস্ত বাদশাহী আমলটা যেন এক কিংবদন্তীর মনোরম কাহিনী।

কিন্তু মোগল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় কাহিনী বোধহয় লুকিয়ে আছে—শেষ অধ্যায়ে তার পতনের মুহূর্তে—যে পতন আরম্ভ হয়েছিল বাদশা আওরংজেবের মৃত্যুর সময় থেকে। করুণ দীর্ঘশ্বাসে ভরা সে পতন যেন স্বতস্ফূর্ত এক বিয়োগান্ত নাটক—যে নাটকের করুণ বিষাদাচ্ছন্ন সুর উপন্যাস অপেক্ষাও পাঠককে বেশী আকর্ষণ করে। কবি কীটস্-এর সেই গভীরতর আত্মদর্শণ 'our sweetest songs are those that tell of saddest thought' যেন পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। বর্তমান উপন্যাস সেই বিশাল মহীরুহের উৎপাটন যন্ত্রণার মর্মরধ্বনি, যার প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ, ঐতিহাসিক সত্যতায় পরিপূর্ণ।

মোগল বাদশাদের বংশ তালিকা

[তারকা চিহ্নিত বাদশাদের আমলের কাহিনী]

খুদার মর্জি বোঝা ভার। কখনো কলম হাতে নিয়ে কিতাব লিখব সেকথা জন্মেও ভাবিনি। ভাবিনি এজন্যে নয় যে জেনানা আদমির কিতাব লিখবার এলেম নেই। শাহজাদী জাহান আরা যথেষ্ট বিদুষী ছিলেন। জেব-উন্নেসা রীতিমত কাব্য রচনা করে গেছেন। কিন্তু খুদা তাঁদের এলেম দিয়েছিলেন, সেরকম মর্জিও দিয়েছিলেন। দুনিয়ার মালিক আমাকে সে এলেম দেননি। আর সেরকম মর্জিও দেননি। তবু কলম হাতে নিয়ে কিতাব লিখতে বসেছি বলেই মনে হচ্ছে—খুদার মর্জি বোঝা ভার।

আমার নাম সাহিবা মহল। দিল্লীর এক অভিজাত ঘরেই আমার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু অভিজাত ঘরে জন্মালেও খুব বড় একটা স্বপ্ন আমার ছিল না। অথচ নসিব একদিন আমাকে হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদায় বসিয়ে দিল। বাদশার বেগম হয়ে ঢুকলাম দিল্লী হারেমের খাসমহলে। হিন্দুস্থানের একজন জেনানার পক্ষে এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার আর কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু নসিবের প্রহসন তখন কে জানতো। কে তখন জানতো যে দিল্লীর ঐ তক্তে তাউসের চাইতে সাধারণ একজন বরকন্দাজের ঘর ভালো। তগদীর নিয়ে সেখানে এমন ছিনিমিনি খেলা নেই। খাসমহলে রঙ্গিনী নারী হবার যার স্বপ্ন তাকে কিনা লিখতে হয় জীবনের রোজনামচা—তারিখ-ই !

শুনেছি শাহজাদী জাহান আরা ভাগ্য প্রবঞ্চনায় যখন নিতান্ত বিমর্ষ ছিলেন তখন আত্মকাহিনী লিখে অবসর যাপন করতেন। তবে সে আত্মকাহিনীর সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। সে শাহজাদীর বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, প্রতিভা ছিল। কোনদিন যদি আত্মকাহিনীর

সে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় লোকে পড়ে হয়তো আনন্দ পাবে। শিল্পবোধ বা রুচিবোধ আমার কিছু নেই। আমার শুধু রোজনামচা—যে রোজনামচা লেখবার এলেম না থাকলেও আমি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। জানিনা সাহিত্যগুণপ্রসাদশূন্য এ রোজনামচা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে কিনা। ভাবী দুনিয়ার মানুষের হাতে এ রচনা গিয়ে পড়বে কিনা॥ যদি কখনো পড়ে, নসিবের প্রতারণা কাকে বলে মানুষ জানবে। সেই যে কথা আছে 'মানুষ চিন্তা করে মানুষের মত খুদা মর্জি করেন তাঁর মত' ঠিক যেন তাই।

আলমগীর বাদশা এক সময়ে নাকি বলেছিলেন: 'বারহার সঈদদের সঙ্গে খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। ওদের পেয়ার কোরো কিন্তু বড় কোন রাজপদ দিও না। কারণ সরকারী ক্ষমতায় জবরদস্ত কোনো অংশীদার থাকে তবে বাদশাহী ক্ষমতা সে নিজেই দখল করতে চায়। লাগাম যদি ওদের হাতে সামান্যও ছেড়ে দাও পরিণতিতে তোমার সম্মানহানি ঘটবে।' কিন্তু কবরের তলার মানুষের কথা দুনিয়ার উপরের মানুষ আর ক'জন শোনে? সেই সঈদদের হাতের পুতুল হয়েই একদিন বাদশা ফররুকসিয়র দিল্লীর তক্তে বসলেন বাদশা জাহান্দার শাকে খতম করে। পরিণতি যা হবার তাই হল। তক্তে তাউসের দিকেই হাত বাড়ালেন সঈদ কুতব-উল্-মুলক আবদুল্লা আর আমির-উল্-উমরা হুসেন আলি। অর্থাৎ প্রকৃত ক্ষমতার অধীশ্বর হতে চাইলেন তাঁরাই। বাধলো বিরোধ। আলমগীর বাদশা গাজীর হুঁসিয়ারীই সত্য হল। গদিচ্যুত হলেন ফর্‌রুকসিয়র। হিজরী ১০৯৭ সাল। আঁখের দৃষ্টি হারিয়ে বাদশা গেলেন ত্রিপলীর অন্ধকুপে। সঈদ ভাইয়েরা তক্তে বসালেন শাহজাদা রফি-উদ্-দরজাতকে। কিন্তু তখন ক্ষয় রোগে সে শাহজাদা প্রায় নিঃশেষিত। সুতরাং তাঁকে বদল করে গদি দেওয়া হল শাহজাদা রফি-উদ্-দৌলাকে। কিন্তু খুদা বাদ সাধলেন। তক্তে বসতে না বসতেই কবরের ডাক এল রফি-উদ্-দৌলার। অবশেষে

দেওয়ান-ই-আমে তক্তে বসলেন রৌসন আখতার। মেহেরবান খুদতালাকে সেদিন কতই না কুরাণের বয়েত আউরে সালাম জানিয়েছিলাম। কারণ রৌসন আখতারের সিংহাসন লাভের অর্থই ছিল আমার উপর নসিব খুসমেজাজ হওয়া। হ্যাঁ, আমি সাহিবা মহল শাহজাদা রৌসন আখতারের সাদী করা বেগম।

রৌসন আখতার দেওয়ানী আমে আমীর ওম্‌রাদের নজরানা নিয়ে তক্তে তাউসে বসলেন বাদশা মহম্মদ শা হয়ে। একে নসিবের খুসমেজাজ ছাড়া আর কি বলা যায়! বাদশার ঘরে জন্মেও রৌসন আখতার তো প্রায় বন্দী জীবনই কাটিয়েছেন দিল্লী-হারেমে। বাদশা শাজাহানের ময়ূর সিংহাসনে কখনো শাহজাদা রৌসন আখতার বসবেন একথা তিনি যেমন কদাচ স্বপ্নেও ভাবেন নি আমরাও কখনো চিন্তা করিনি। অথচ সেই অঘটনই ঘটে গেল। খুদাতালাকে ধন্যবাদ জানাবো না'তো কাকে জানাবো। ধন্যবাদ জানালাম বিশেষ করে আমি সাহিবা মহল এবং বেগম মালেকা-ই-জামানী। আমরা দুজনই তখন তাঁর সাদী করা বেগম।

দাম্পত্য সুখের অভাব আমাদের ছিল না। সতের বছর বয়সের এমন সুপুরুষ এবং এমন শক্ত সমর্থ শাহজাদা মোগল হারেমে তখন আর কেউ নেই। সুখের উপর এল সম্মান। সেই সঙ্গে ক্ষমতাও। ভুলে গেলাম নিয়তি বলে কোন জিনিষ আছে। ভুলে গেলাম যে সবার উপরে আছেন দুনিয়ার মালিক খুদাতালা। তাঁর মনের কথা কেউ জানে না। যা ঘটে বা যা দেখি তাই শেষ নয়।

সম্মান আর শক্তি স্বস্তি আর শান্তির উপর কুঠার হানলো সজোরে। কেউ ভাবেনি যে সঈদ ভাইদের হাতের মুঠার বাইরে রৌসন আখতার কোন দিনও সত্যিকারের বাদশা হতে পারবেন। কিন্তু রৌসন আখতার অসাধ্য সাধন করলেন। দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিজাম-উল-মুলকের সঙ্গে গোপনে সাট করে

হুসেন আলিকে খুন করালেন রৌসন আখতার। বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করে হেরে গিয়ে কারাগারে চালান হয়ে গেলেন আবহুল্লা। নয়। বাদশার হুকুম হল এবার থেকে ওদের পরিচয় হবে 'নামাখারাম' আর 'হারাম নামক' বলে। খাস মহলের হায়াত্‌বক্‌স বাগানে প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা উৎসব করলাম সন্ধ্যা বেলায়। কিন্তু হায়রে নসিব! সঈদ ভাইদের হটিয়ে দিতেই বাদশার দৃষ্টি গেল বদলে। তখন সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর নিজের হাতে। বয়স অল্প। নিজেকে উপভোগ করতে হবে। তার চতুর্দিকে তেমনি স্তাবকও জুটে গেল। শেষ পর্যন্ত ঢালাও স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন যা খুশী তাই করবার।

সঈদ ভাইদের হটিয়ে দিয়ে প্রথম ওয়াজীর হয়েছিলেন মহম্মদ আমিন খাঁ। দাক্ষিণাত্যের নিজামের চাচা। লোকে বলত ইতিমাদ-উদ্দৌলা। কিন্তু তুইমাস ওয়াজিরী করতে না করতেই মারা গেলেন। লোকে বলে পয়গম্বরের বংশ বারহার সঈদ ভাইদের হত্যা করবার জন্যই খুদার অভিশাপে ক্ষমতা ভোগ করতে পারলেন না আমিন খাঁ। আমিন খাঁর পরে এলেন স্বয়ং নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক। কিন্তু তিন বছর ওয়াজিরী চালিয়ে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই তিনি এ পদ ত্যাগ করলেন। করবেন কি—বাদশা তখন কোন ভাল কথাই শোনেন না। যখন তখন কথার খেলাপ্‌ করেন। তাঁর বুদ্ধি জোগায় চাটুকারের দল। দরবারে এখন চরিত্রহীন চাটুকার ব্যক্তির অভাব নেই। অল্প বয়সের বাদশার মাথায় হাত বুলিয়ে হিন্দুস্থান পরিচালনার কর্তৃত্ব নিতে চায় সকলেই। চাটুকারের দল হয়েছে তুটো—এ দেশের পুরানো বাসিন্দা তুরাণীরা এবং ইরাণ থেকে সদ্য বিতাড়িত ইরাণীরা। সে দেশে আফগানদের অত্যাচারে ভিটেমাটি ছেড়ে হিন্দুস্থানে আশ্রয় পাবার আশায় দলে দলে এসে রোজই কিছু না কিছু ইরাণী দিল্লীতে জুটছে। শক্তি সাহস ও চরিত্র বলতে কারোরই কিছু নেই। থাকলে

নিজের দেশ আফগান দস্যুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে কেউ পালায়?

নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক ওয়াজিরী ছেড়ে দিলেন হিজরী ১১০২ সালে। কিন্তু দরবারে তখন ইরাণীরা বেশ জমজমাট হলেও ওয়াজিরী পেলেন তুরাণী দলের লোকেরাই। ওয়াজীর হলেন ভূতপূর্ব ওয়াজীর মহম্মদ আমিন খাঁর পুত্র কামরুদ্দিন। লোকে তাকেও ডাকে ইতিমাদ-উদ্দৌলা বলে।

নতুন ওয়াজীরের মত এমন অপদার্থ লোক সারা হিন্দুস্থানে ইতিপূর্বে আর বোধহয় কেউ জন্মায় নি। কামরুদ্দিনের একমাত্র উদ্দেশ্য যে-করেই হোক ওয়াজীরের পদ আঁক্‌ড়ে থাকা। যে-জন্যে বাদশার কোন ইচ্ছাতেই সে বাধা সৃষ্টি করে দাঁড়ায় না– তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। আমাদের বদ্‌নসিব বাদশার কোন খেয়ালই এখন ভাল খেয়াল নয়। তাঁর সেই বদ্‌খেয়ালেই রসদ জোগানো ওয়াজীরের একমাত্র কাজ। অথচ ওয়াজীরের দায়িত্ব হল সমস্ত রাজ্যের ভালমন্দ বিচার করে বাদশাকে পরামর্শ দেওয়া তাতে বাদশা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট যা-ই হোন না কেন। এ হেন অপদার্থ ওয়াজীর আলমগীর বাদশার আমলে হলে কবে পয়জার মেরে দরবার থেকে তাঁকে বিদেয় করে দিতেন তিনি।

ময়ূর-তক্‌তে বসতে না বসতেই সাদী করে বাদশা আরো কয়েকটা বেগম হারেমে ওঠালেন। সুন্দরী জেনানার নাম শুনলে কাফের অ-কাফের বিচার নেই বাদশার। রাজপুত থেকে হিন্দুস্থানী, ইরাণী, তুরাণী সবই ঘরে উঠছে তাঁর। কোন কালে যে আমাকে আর মালেকা-ই-জামানীকে সাদী করেছিলেন তিনি সেকথা বোধহয় মনেও নেই তাঁর। অথচ নতুন সাদী করা বেগমদের কাছেও যদি হররকত আসেন।

বেগমে কুলাচ্ছে না বাদশার। যত রাজ্যের তওফাওয়ালীরা এসে ভিড় জমাতে লেগেছে দিল্লীতে। আমীরদের নিত্য করণীয়

বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাদশাকে তওফাওয়ালী উপঢৌকন দেওয়া। যার তওফাওয়ালী যত সুন্দর বাদশা তার উপর তত খুস্‌মেজাজ। তওফাওয়ালীর পরই বাঁদী। সুন্দরী বাঁদীতে হারেম ভরে যাচ্ছে। দেখে বোঝা ভার কে বেগম কে বাঁদী। সন্ধ্যার পর ছায়া না নামতেই রং মহলের ঝাড়গুলো জ্বলে উঠছে। পাখোয়াজ, বাঁশী আর ঘুঙুরের শব্দে সমস্ত হারেমটা উচ্চকিত হয়ে উঠছে। দিল্লী হারেমের ইজ্জত আর কিছু রইল না।

সরাব পান হারাম, গোস্তাকী। স্বয়ং পয়গম্বর এ-সব নিষেধ করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু কয়জন মুসলমানই বা এখন পয়গম্বরের সে নির্দেশ মেনে চলে! মেনে চলে না বলেই খুদাতালা আর খুস্‌মেজাজ নন এখন। মোগল রাজত্ব জাহান্নামে যেতে বসেছে। স্বয়ং বাদশাই যখন গোল্লায় গেছেন তখন অপরের আর কথা কি। কে জানতো শাহজাদা রৌসন আখতার ময়ুর-তক্‌তে বসেই এমন পাল্টে যাবেন। আগে তাকে সামান্যই সরাব পান করতে দেখেছি, অন্য নেশা তো দূরস্থান। এখন শুনছি ইরাণের সিরাজী ভেট দেয় বলে বাদশার দরবারে ইরাণী আমীরেরা কৌলিন্যে উঠেছেন। অথচ আলমগীর বাদশা ইরাণীদের ধারে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না ওরা সিয়া বলে। শুনেছি হজরত পাদিশা মহম্মদ শার সিরাজীতেও নেশা হয় না। আফিং খান, চরস টানেন। কি লজ্জা! কি লজ্জা!

দুর্ধর্ষ মধ্য এশিয়ার মোগলদের মধ্যে এই নির্লজ্জ নেশা কে ঢুকিয়েছিল কে জানে। এক আলমগীর বাদশা বাদে কম বেশী সব মোগল বাদশাই নেশা করতেন। বাবুর বাদশা সরাব খেয়ে পাগলামী করতেন, কিন্তু কাপুরুষ হননি। বাঘের মত শক্তি আর সিংহের মত সাহস ছিল তাঁর। হুমায়ুন বাদশা বরং ছিলেন নেশার দাস, কিন্তু চরিত্রহীন ছিলেন না। আকবর বাদশাকে সরাব সিরাজী কখনো নেশাগ্রস্ত করতে পারে নি। হিন্দুস্থানে এ সাম্রাজ্য পত্তন করেছেন তিনিই। রক্তের মধ্যে অপনেশার দোষ চেপেছিল

প্রথম বাদশা জাহাঙ্গীরেরই। তাঁর নেশাবিকারের নানাকথাই শুনতে পাই। শুনি তিনি দিনে রাতে বড় বড় পেয়ালার বিশ পেয়ালা সরাব খেতেন—ষোল পেয়ালা দিনে, চার পেয়ালা রাতে। এত কড়া সরাব যে সাগর পার থেকে আসা শ্বেতচর্ম সাহেব টমাস রো পর্যন্ত সে সরাবের গন্ধ শুঁকেই বমি করে ফেলবার উপক্রম করেছিলেন। বাদশা জাহাঙ্গীর নিজেই তার আত্মকাহিনীতে লিখে গেছেন যে—'একসের মদ আর আধসের মাংস খেতে পেলে আর আমি কিছুই চাই না'। সান্ধ্য ভোজের পর পাঁচ পেয়ালা সরাব পান করেও তাঁর নেশা হোত না। তখন খেতেন আফিং। তারপর পাকা দু' ঘণ্টা ঘুমাতেন। দু ঘণ্টা পর ঘুম ভেঙে জাগিয়ে তাঁকে যখন নৈশ আহার দেওয়া হোত তখন নিজে হাতে তুলে খাবার ক্ষমতা থাকত না আর। মুখে তুলে দিতে হোত।

কিন্তু তবু তিনি এত অপদার্থতার পরিচয় দেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে এতটুকু ভয় পেতেন না। তখন তাঁকে দেখে মনে হোত না যে তিনি নেশাগ্রস্ত মানুষ। শিকার করতে গেলে শের বা সিংহ যাই সামনে পড়ুক না কেন ভয় পেতেন না এতটুকু। বলতে লজ্জা পাচ্ছি আমার স্বামী বর্তমান বাদশা হজরত মহম্মদ শা একা যুদ্ধযাত্রা তো দূর-স্থান হারেমের বাইরে শিকার যাত্রায়ও কোন দিন বের হন না। দিল্লী হারেমের বাইরে বছরে একবার করে কাছেপিঠে লোনি উদ্যান বা গড় মুক্তেশ্বরের মেলায় দু একবার যান।

হারেমের বাইরে শুধুমাত্র যমুনার তীরেই যা একটু যান তিনি। তাই বা যান কোথায়? শা বুরুজ থেকে বসে বসে যমুনার বালুতটে পোষা শূয়রের লড়াই দেখে মজা লোটেন। যে কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে ভয় পান বাদশা। লজ্জায় মুখ দেখাবার উপায় নেই। শুধু মেয়েমানুষ, মদ আর আফিং। দিনরাত এই নিয়েই পড়ে আছেন।

এমন যে খেয়ালী বাদশা জাহাঙ্গীর তিনিও দেওয়ানী আম আর

দেওয়ানী খাসে রীতিমত রাজকার্য চালাবার জন্য দরবার বসাতেন। শুধু অপরাহ্ণ আর রাতটুকু ছাড়া হারেমে কাটাতেন না বেশীক্ষণ। মেয়েমানুষের মোহ থাকলেও লম্পট ছিলেন না। তওফাওয়ালী আনারকলিকে ভালবাসতেন বলে তার কবরের উপর সৌধ তুলে দিয়েছেন। প্রথম সাদী করা বেগম মূনাবাঈ (যাকে বাদশা নাম দিয়েছিলেন শা বেগম) মারা গেলে চারদিন তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করেন নি। এমন কি মদ পর্যন্ত খান নি। জাহাঙ্গীরের হারেমের জেনানা সংখ্যা ছিল আট শতের মতো। কিন্তু তবু তিনি নূরজাহান ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর কাকেই বা পেয়ার করতেন! আর আমাদের বর্তমান বাদশা? প্রথম দিকের সাদী করা বেগম এই যে আমি আর মালেকা-ই-জামানী, আমাদের নাম পর্যন্ত তাঁর মনে আছে কি? অথচ হারেমের বাইরে মুহূর্তের জন্যও তো তিনি বের হন না।

যত দুশ্চরিত্রই হোন না কেন, বাদশার একটা নিয়ম কানুন আছে, তাঁকে সেটা মানতে হয়। ঝরোকায় গিয়ে প্রত্যেকদিন সকাল বেলায় নিতে হয় প্রজাবর্গের 'বাদশা সালামত'। দুপুর বেলা যদি খেলাধূলা কিছু থাকে তবে তাই। বিকেলে কেল্লার পশ্চিম দরজায় আবার প্রজাদের দর্শন দান। এর মধ্যেকার সময়ে হল দরবারের কাজ—দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, শা বুরুজের বৈঠক, এইসব। অপরাহ্ণে একসময় হারেম। খাওয়া দাওয়া থেকে হারেম উপভোগ যা কিছু করবার—এই সময়। তার পর সন্ধ্যায় আবার দেওয়ানী খাসের দরবার। দরবারের পর তওফাওয়ালীর নাচ দেখ, হৈ হুল্লোড় কর, যা খুশী। তারপর সারারাত হারেমে। হারেমে শুয়েও খেয়াল হয় বড় বড় বাঈজীদের গান শুনতে শুনতে ঘুমাও। বাদশা শাজাহান ঘুমাবার আগে বাঈজীদের গান শুনতেন।

কিন্তু লজ্জায় মরে যাই। আমাদের বাদশা সে সব আদব কায়দা, নিয়ম কানুন, কোন কিছুর ধার ধারেন না। ময়ূর তক্‌তে বসবার আগে আমাদের বাদশাকে দেখে কে বলতে পারতো যে

শাহজাদা রৌসন আখতার কখনো এমন বয়ে যাবেন? ছোট বেলা যারা ভাল থাকেন বড় হয়ে ক্ষমতা পেলে তারা বুঝি এমন করেই বয়ে যান। সুলতাননামায় পড়েছি দিল্লীর সুলতান কায়কোবাদ বেহেস্তের ইস্রাফিলের মতই জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু তক্‌তে বসে ক্ষমতা হাতে পেয়েই বয়ে গিয়ে একেবারে দুশ্চরিত্রতার নিম্নস্তরে নেমে গেলেন। আমাদের বাদশার কি গতি হবে কে জানে। সকাল বেলায় ঝরোকায় গিয়ে 'বাদশা সালামত' না নিয়ে তিনি গিয়ে বসেন তাঁর মোসাহেবদের নিয়ে যমুনার তটে। বসে বসে পোষা জানোয়ারদের ঝগড়া দেখেন। দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাসে রাজকার্য চুলোয় গেছে। সে দায়িত্ব এখন ঐ লম্পট ওয়াজীর কামরুদ্দিনটার। দেওয়ানী আমে সে কি করে খুদাতালাই জানেন। তবে দেওয়ানী খাসে এখন আর কোন দরবারই বসে না। দিন রাত সেখানে তওফাওয়ালীদের নাচ আর হৈ হুল্লোড় লেগেই আছে। আমীররা দেওয়ানী খাসে আসেন বাদশাকে তওফা-ওয়ালী বা বাঁদী ভেট দিয়ে খুশী করবার জন্যে। হায়রে মোগল আমীরের দল!

হিজরী ১১১৩ সাল। জমজমাট হারেমের মধ্যেও বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম আমি আর মালেকা-ই-জামানী। নিঃসঙ্গবোধ করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। হারেমে এখন জেনানার সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এসেছে অনেক নতুন নতুন বেগম। তারো চেয়ে বেশী এসেছে অসংখ্য সুন্দরী বাঁদী। নয়া বেগমেরা সেই সব বাঁদীদের নিয়ে হৈ হুল্লোড় করে দিন কাটান। বাঁদীদের সঙ্গে মিশতে তাঁদের কোন সঙ্কোচ নেই। থাকবেই বা কেন। তাঁরা যেসব পরিবার থেকে এসেছেন সেখানকার মেয়েরা কখনো কোন অভিজাত ঘরের বেগমের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। তাঁরাও বাঁদীদেরই সমতুল্য। সুতরাং বাঁদীদের সঙ্গে ফুর্তি করতে তাঁদের আটকায় না। হামাম ঘরে গোলাপ জলে স্নান করে, শিষ মহলের স্নিগ্ধ

ফোয়ারা ভোগ করে। দামী সালোয়ার কামিজ ওড়না অফুরন্ত। পারস্যের সিরাজী থেকে হিন্দুস্থানের সরাব যখন চাও তখনই পর্যাপ্ত। তার উপর হারেমের খানা—কোর্মা, পোলাও, কাবাব, কোপ্তা। এ-সব কিছু ওরা স্বপ্নেও দেখেনি। পেয়ে ভাবছে জীবন সার্থক। কিন্তু আমাদের জীবনের ধারা ভিন্ন।

মোগল হারেমের রীতিনীতি আমরা জানি। এই আবহাওয়ার মধ্যেই আজন্ম আমরা মানুষ। আমরা জানি বেগমদের বিলাস শিকারে বাদশার সহযাত্রিনী হওয়া, পাঞ্জাব বা সুদূর কাশ্মীরে সঙ্গিনী হওয়া বা কোন যুদ্ধ যাত্রায় মোগল শিবিরের পশ্চাৎপটে থাকা, নয়া বেগমেরা বুঝবে কি যে মোগলদের চলমান শিবির জীবন স্পন্দনে ভরা আর এক হারেম। সেই হারেমের উন্মাদনা এই লালকেল্লার স্থবির হারেমের চাইতে অনেক বেশী। সে স্বাদ বুঝবার নসিব নয়া বেগমদের আর হবে না। ঘর ছেড়ে যে বাদশা কাছেপিঠের কোন এক অরণ্যে শিকার যাত্রায় পর্যন্ত বেরোন না, তাঁর সঙ্গে শিবিরসঙ্গিনী হবার সুযোগ তাঁদের কোথায়? বাদশা আজ নামেই, কাজে একজন কাপুরুষ। কে বুঝতে পেরে-ছিল যে শেষ পর্যন্ত হজরত মহম্মদ শাহ এমন একটা অপদার্থ ব্যক্তিতে পরিণত হবেন।

মালেকা-ই-জামানী আর আমি এক মহলেই পাশাপাশি থাকি। হারেমে থেকেও স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছি আমরা। ছোটলোক আমদানী করে হারেমের ইজ্জত নষ্ট করেছেন বাদশা। সবার সঙ্গে থেকে নিজেদের সম্মানতো আর খোয়াতে পারি না। তাই নিজেদের আমরা গুটিয়ে নিয়েছি। দুঃখ করে সন্ধ্যাবেলায় এ নিয়েই আলোচনা করছিলাম আমরা। মালেকা-ই জামানী আমায় বলছিলেন: মোগল বাদশার বেগম হবার চাইতে পথের ভিখারীকে সাদী করা এযুগে অনেক ভাল। আমি জবাব দিয়েছিলাম: তা একশবার হক্ কথা। আলমগীর বাদশার পর মোগল বাদশাদের

আর ইজ্জত নেই। বাদশা তো নয় এক একটা লম্পট। মেয়ে-ছেলে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকে যে পুরুষ, সে আবার মানুষ নাকি? জাহান্দার শার যা হয়েছে, ফররুকসিয়রের যা হয়েছে, আমাদের হজরত সাহেবেরও তাই হবে। বেগম বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পাই।

মালেকা-ই-জামানী বলেছিলেন: লম্পট হোক সে জন্যে লজ্জা নেই। পুরুষ মানুষ হাজারো জেনানা এনে হারেম ভরুক না, তাতে কি। কিন্তু রুচি থাকবে তো? বাঁদীদের যদি বেগম করে হারেমে ওঠানো হয় তাহলে আর থাকে কি? এই সব বাঁদীদের বাচ্চারাও শা'জাদা শা'জাদী হবে নাকি? সিংহের জন্য সিংহী চাই। শিয়ালের পেটে যদি সিংহের বাচ্চা জন্মায় তার সিংহের দর্প থাকে না। এ কথা বুঝেই বাদশা আকবর আনারকলিকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছিলেন। যাতে শাহজাদা সেলিম তাকে সাদী করতে না পারেন। এমন কি পারস্যের অভিজাত ঘরের মেয়ে হলেও মিহির উন্নিসাকে পর্যন্ত সাদী করতে দেননি সেলিমকে। তবে না বংশের ইজ্জত ছিল।

আমি বলেছিলুম: এমন চললে কোনদিন দেখব বাজারের বাঈজীও বাদশার বেগম হয়ে হারেমে ঢুকেছে।

মালেকা-ই-জামানী বলেছিলেন: তাতে আর বিচিত্র কি। যে হারে আমীরেরা তওফাওয়ালী আর বাঁদী ভেট পাঠাতে আরম্ভ করেছে—তাতে কোনদিন বাজারের নাচনেওয়ালী মেয়েও হয়তো বেগম হয়ে হারেমে উঠবে।

সত্যি বাদশার এমন নির্লজ্জ নীচু স্বভাব দিনে দিনে আমাদের লজ্জার কারণই হয়ে উঠছিল। মালেকা-ই-জামানী আর আমি দুজনই এনিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। হারেমে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলতে আমরা দুজন ছাড়া এখন আর কেউ নেই বললেও চলে।

বিমর্ষ চিত্তে দুজনে নীরব হয়ে সে কথাই চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ এমন সময় দেওয়ানী খাসের আলোর ঝাড়-গুলো জ্বলে উঠতে লাগলো। খাসমহলের দরজার ঝালরের ফাঁক দিয়ে দেওয়ানী খাসের আঙিনাকে স্পষ্ট দেখা যায়। আমরা দুজনে সেদিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, খোজাগুলো ব্যস্ত সমস্ত ভাবে দেওয়ানী খাসের চত্বরে ভিড় করছে। আরো বেশ কিছু লোক বাদ্যযন্ত্র হাতে সেখানে উপস্থিত হচ্ছে। ওদের দেখ-লেই আমরা চিনতে পারি ওরা কে। বুঝতে পারি কি হতে চলেছে। মোগল বাদশাদের কি অবস্থা! যে দরবার খুব জরুরী প্রশাসনিক বৈঠকের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল আজ তা তওফাওয়ালীর আসরে পরিণত হয়েছে।

ছোটলোকের মেয়েগুলোকে অধিকাংশই বাদশা হারেমের রং মহলে উঠিয়েছেন। বাঁচা গেছে। ওদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায়। নির্লজ্জ ঐ বেয়াদব বেগমগুলোকে দেখলে শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। মেজাজ গরম হয়ে উঠে। কিন্তু তবু যদি বেয়াদবগুলোকে এড়িয়ে চলা যায়! সভ্যতাভব্যতা বলতে কিছুই জানা নেই ওদের। দেওয়ানী খাসের অর্থই ওরা জানে না। ওরা ভাবে দেওয়ানী খাস একটা নাটমহল। দেওয়ানী খাসে আলো জ্বললেই দলে দলে এই সব বেগমরা এসে খাস মহলে ভিড় জমাতে থাকে। মহলের ঝালরের ফাঁকে দল বেঁধে সব বসে যায়। ওরা জানে যে এখনই তওফাওয়ালীর নাচ হবে, বাঈজীর গান হবে।

আজো দেওয়ানী খাসে আলো জ্বলতে দেখেই খাস মহলে নয়া বেগম আর তাদের বাঁদীদের ভিড় জমে গেল। একটা কলকণ্ঠ ফুটে উঠলো যেন। হারেমের জেনানাদের রীতিনীতি পর্যন্ত জানেনা ওরা। বৈঠকখানার মেঝেতে বাঁদীদের নিয়ে সারে সারে সকলে বসে গেল। মালেকা-ই-জামানী আর আমি ছিলাম খোয়াব ঘরে।

এখানেই এখন আমরা দুজন থাকি। বাদশার মুখ্য বেগমের জন্য এই ঘরই নির্দিষ্ট। তবু ভাগ্যি এখনো এখানে আছি।

নয়া বেগমদের ভিড় দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মালেকা-ই-জামানী আমার দিকে তাকালেন : ব্যাপার কি ?

বললুম : নাচ টাচ হবে বোধ হয়।

—এখন দেখি সন্ধ্যা বেলাই নাচের আসর বসছে ?

—কি আর হবে। খোদ দেওয়ানী আমেই উনি এখন আর দরবারে বসেন না।

—বাদশা কোথায় আছেন ?

—বোধহয় ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে শা বুরুজে বসে আছেন। নয়তো গোছলখানায় বসে আমীরদের নিয়ে সিরাজী খাচ্ছেন। এখন তো শুনছি সিরাজীতেও নেশা হয় না। আফিং খান।

মালেকা-ই-জামানী আর কোন কথা না বলে চুপ করে থাকলেন। চোখের সামনে এমনি করে বাদশা বয়ে যাচ্ছেন দেখে তিনি বেশ ব্যথা পাচ্ছেন। মালেকা ই-জানানীকে চুপ করে থাকতে দেখে আমিও কোন কথা বললুম না। খোয়াব ঘরটা নীরব হয়ে থাকলো। বৈঠকখানা থেকে নয়া বেগমদের কলকণ্ঠ এসে খোয়াব ঘরের দেয়ালে আছড়ে পড়তে লাগলো।

সত্যি এসব মোটে ভাল লাগে না। সহ্যও হতে চায় না। আমার মনে হল তস্‌বিখানায় গিয়ে আল্লার কাছে নীরবে তাঁকে একটুখানি ডাকি। দুনিয়ার মালিক তিনি ছাড়া মোগল হারেমকে রক্ষা করবার এখন আর কেউ নেই। কিন্তু বৈঠকখানার উপর দিয়ে যেতে হবে ভেবে আর উঠলুম না।

সন্তর্পণে একটা বাঁদী এসে দাঁড়ালো খোয়াব ঘরে। নেহাৎ নিত্য করণীয় দায়িত্ব সারবার জন্যেই যে সে এসেছে—তার মুখ-চোখ দেখলেই তা বোঝা যায়। বৈঠকখানায় বেগম বাঁদীদের ভিড়ে গিয়ে বসবার জন্য সে যেন ছটফট করছে।

এগিয়ে এসে মালেকা-ই-জামানী আর আমাকে কুর্নিশ জানিয়ে সে বলল : হুজরত সাহেবা জেনানা মুসায়েরের সায়ের শুনবার হুকুম করেছিলেন। মুসায়েররা হাজির। হুকুম করেন তো ওদের খোয়াব ঘরের দরজায় নিয়ে আসি।

হঠাৎ চটে উঠে মালেকা-ই-জামানী বললেন : বেয়াদব কোথাকার! এটা সায়ের শোনবার সময়? দূর হয়ে যা সামনে থেকে।

বাঁদী বলল : হুজরত সাহেবা ওদের যে হুকুম করেছিলেন? ধমকে উঠলেন মালেকা-ই-জামানী। বললেন : হুকুম করেছিলাম শুনব না। যা ওদের এখন যেতে বল।

এরকম হুকুমে বাঁদীটাকে খুসমেজাজ বলেই মনে হল। সেওতো এই চায়। হুকুম তামিল করবার নামে এখন যদি তাকে খোয়াব ঘরে বসে থাকতে হয়—তবে তার চাইতে দুঃখ আর কিছু নেই। হুজরত সাহেবা মালেকা-ই-জামানীকে সালাম জানিয়ে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল সে।

আমি তাকে ডাকলুম : দাঁড়া উল্লুকীটা।

ফিরে দাঁড়িয়ে কোমর বাঁকিয়ে সে মাথা নিচু করল : হুকুম হয় বেগম সাহেবা।

বললুম : দেওয়ানী খাসে আজ সাত সকালেই এত তোড়জোড় কেন রে?

বাঁদী বলল : খুব বড় এক মুসায়ের আসবেন আজ। হুজরত বাদশা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবেন।

—নাম কিরে মুসায়েরের?

—অত জানিনা বেগম সাহেবা। তবে শুনেছি খুব বড় মুসায়ের। বাদশার বাঈজীর জন্য এবার থেকে তিনিই গজল লিখবেন।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম : হুঁ।

বাঁদী বলল : আসি বেগম সাহেবা?

—যা।

বাঁদী চলে গেলে মালেকা-ই-জামানীর মত আমিও গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলুম।

কয়েকদিন পরেই মুসায়েরের পরিচয় পেলুম। মুসায়েরের বংশ পরিচয় ভালই। ইস্‌পাহানের এক বড় ঘরের ছেলে। ছোটবেলা থেকেই ভাল সায়ের আর গজল লেখেন। নাম আলি কুলি খাঁ। জন্ম হিজরী ১০৯০ সালে। দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন। ইরাণের সফাভি শাহকে তাড়িয়ে দিয়ে অসভ্য আফগানেরা সেখানে ক্ষমতা লাভ করে। আফগানদের রুচি নেই, সংস্কৃতি নেই, সভ্যতাও নেই। সমস্ত দেশের উপর তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দেয় তারা। সেই সময়ই বহু ইরাণী পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন হিন্দুস্থানে। বড় বড় ঘরের ছেলেরা আবার সভ্যতা আর রুচির নামে একেবারেই কাপুরুষ হয়ে পড়েছেন। অসভ্যদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার ক্ষমতাও নেই তাঁদের। আফগানেরা তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছে সমস্ত দেশটাকে। সেই অসভ্যদের হাত আলি কুলি সাহেবের উপরও পড়তে ভুল করেনি।

আপন চাচাতো বোন খাদিজা সুলতান বলে একটি মেয়েকে ভালবাসতেন আলিকুলি। শোনা যায় সেই ভদ্রমহিলাও যথেষ্ট বিদুষী ছিলেন। সায়ের গজল লিখতে পারতেন। দেখতেও ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। আলি কুলির উপর তারো যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। কিন্তু কাপুরুষের ভাগ্যে যেমন নেই ক্ষমতা ভোগের সুযোগ, তেমনি নেই নির্বিঘ্নে জীবন উপভোগ করবার উপায়। বীরভোগ্যা এ দুনিয়া। আফগানেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার প্রিয়তমাকে। শুধুমাত্র আলিকুলি নয় বহু অভিজাত ঘরের জেনানাই এমনি করে আফগানদের হাতে ইজ্জত হারিয়েছেন।

কোন অভিজাত ঘরের লোক নয় এমন এক তুর্কোমান গরীব মেষ-পালক তাঁর দলবল নিয়ে আফগানদের হাত থেকে ইরাণকে রক্ষা করেছেন—তার নাম নাদির কুলি। রুচির বালাই তাঁরো নেই। যেকালে

বাহুবলের সাহায্যে তুনিয়ায় নিজেকে বেঁচে থাকতে হয়—সেকালে শক্তি-হীন রুচির মূল্য কি? ভাল হয় শক্তি এবং রুচি তুইই যদি কোন এক ব্যক্তির মধ্যে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু আমাদের বদ্‌নসিব যে, একালে রুচি বলতে তু একটি সায়ের গজল আর হারেমের মধ্যে জেনানাদের নিয়ে বেয়াদবি হৈ হুল্লোড়কে বোঝায়। ফলে রুচির সঙ্গে শক্তির কোন যোগাযোগ নেই। অপর পক্ষে শক্তি যাদের আছে, তাদের কোন সুকোমল বৃত্তিই নেই। না শিল্প, না সঙ্গীত, না সাহিত্য। আছে শুধু নির্মম নিষ্ঠুরতা আর পশু শক্তি।

একমাত্র মূর্খই বিশ্বাস করে যে নিজে নিবীর্য হয়ে অপরের শক্তির উপর নির্ভর করে রাজক্ষমতা উপভোগ করা যায়। নিবীর্য বংশধরদের ঐতিহ্যকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। একালের মোগল বাদশারা তাই শক্তিশালী আমীরদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। অবশ্য আমাদের কালে শক্তিশালী আমীরই বা কোথায় আছেন? নাদির কুলি অশিক্ষিত হলেও শক্তির অধিকারী তো বটেই। এতবড় একটা কাজ করবার পর ক্ষমতার লোভ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। ঘুনে ধরা উত্তরাধিকারীর ঐতিহ্যের তোয়াক্কা রাখে কে? স্বল্পকালের জন্য সফাভিদ বংশের শা দ্বিতীয় তমাশকে সিংহাসনে রেখে হিজরী ১১০ সালে তাকে সামান্য অজুহাতে পদচ্যুত করলেন নাদির কুলি। তারপর নিজের ইচ্ছামত শাহের এক শিশুপুত্র শা তৃতীয় আব্বাসকে তক্‌তে বসিয়ে চার বছর নিজেই দেশ শাসন করলেন। অবশেষে হতভাগ্য শাহের মৃত্যু ঘটিয়ে নাদির কুলি এখন নাদির শা নামে নিজেই ইরাণের শা হয়েছেন।

জ্ঞানী গুণী, কবি শিল্পীর মর্যাদা নাদির কুলির কাছেও তেমন নেই। তাই ইরাণ থেকে আমীর ওম্‌রার ছেলেরা দলে দলে হিন্দু-স্থানে এসে মোগল দরবারে ভিড় করছেন। হায়রে আভিজাত্য! নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই তার আবার আমীর! কবি! শিল্পী!

আমাদের এই মুসায়ের সাহেবও খুব ভাল ব্যবহার পাননি নাদিরের কাছ থেকে। আফগানদের কাছ থেকে খাদিজা স্থলতানকে ছিনিয়ে এনে নিজের হারেমে ঢুকিয়ে দিলেন নাদির। শেষ আঘাতটা আর সইল না মুসায়ের সাহেবের। তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিজের দেশ ছেড়ে চিরদিনের মত হিন্দুস্থানে পাড়ি দিয়েছেন।

আমাদের বাদশার যেমন স্বভাব তেমন লোকই পেয়েছেন। যোদ্ধার তো তার প্রয়োজন নেই। তওফাওয়ালী আর বাঈজীদের কাজে লাগে যে মানুষ, সেই মানুষের প্রয়োজন। দরবারের বাঈজীর জন্যে মনের মত লোক পেয়েছেন বাদশা। মেজাজ তো খুশ্‌ হবেই। তাই জব্বর সম্বর্ধনার আয়োজন করেছেন। তোবা!

॥ ২ ॥

দিনে দিনে বেশ জমে উঠেছে। মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া কথা নেই। দরবার এখন তওফাওয়ালীর নাটশালায় পরিণত হয়েছে। শুনছি মাঝে মাঝে দেওয়ানী আমেও নাকি এখন বাঈজীর নাচ হয়। তোবা! বাদশা শাজাহান যদি কবরের নিচ থেকেও এ-কথা শুনতে পান তো লজ্জায় মরে যাবেন। এর জন্যেই কি তিনি নয় বছর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে লাল কেল্লা তৈরী করেছিলেন নাকি? লাল কেল্লার ইজ্জত গেল। যে নহবৎখানা দিয়ে বাদশা আর শাহজাদারা ছাড়া কেউ চলতে পারত না শুনতে পাই সেখান দিয়ে এখন অনায়াসে তওফাওয়ালীরা যাতায়াত করে। ছত্তচৌকে আমীরদের পাশাপাশি তাদের পেয়ারের হুরীরা জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য ভীড় জমায়। তা দেখে বাদশা নাকি খুব মজা পান। শুনতে পাই স্বয়ং বাদশাই নাকি মিনা বাজারে বাঈজীদের গলা ধরাধরি করে সওদা করছেন। খুব উন্নতি হয়েছে মোগল বাদশার।

জাহান্নামে যাক্ ওয়াজীর কামরুদ্দিন। এমন একটা ক্লীব্ বাদশাকেও তোয়াজ করে চলবার প্রয়োজন আছে নাকি! সে কি ভেবেছে সঈদ ভাইদের বাদশা মহম্মদ শা নিজেই হটিয়েছেন? ঘটনাচক্রে নিজেদের সামাল দিতে পারেনি বলেই ওরা গেছে। তোবা! তোবা! যে বাদশাকে ধমকে দাবিয়ে রাখা যায় তার মেজাজ খুশ্ রাখবার জন্য নাকি নিত্য একটা করে খবসুরৎ তওফাওয়ালী উপহার দিচ্ছে কামরুদ্দিন! তাই নিয়ে ইরাণী দলের সঙ্গে কামরুদ্দিনের দলের অর্থাৎ তুরাণী দলের বিরোধ। সরম! সরম! মানুষ বলতে মোগল সাম্রাজ্যে এখন কেউ নেই। যে অপদার্থরা একটা পশুচারকের ভয়ে ইরাণ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে তারাও হিন্দুস্থানে উচ্চ রাজপদ আশা করে দলাদলি করছে। তাদের নেতা আমির খাঁ বাদশাকে কাত করবার জন্য হেন কর্ম নেই যা বাদ রাখছেন। ইরাণের সিরাজী থেকে আরম্ভ করে আফগানিস্থানের নর্ত্তকী, সবই ঢালাও সরবরাহ করে চলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! এ প্রতিযোগিতায় কামরুদ্দিনের সঙ্গে এখনো আমির খাঁ এঁটে উঠতে পারছে না। এক জব্বর তওফাওয়ালী নাকি উপহার দিয়েছে কামরুদ্দিন বাদশাকে। তার নাম কোকিজী। বাদশা এখন কোকিজীর মুঠোর মধ্যে। বাদশা দিনরাত ইমতিয়াজ মহলে এখন তাকে নিয়ে পড়ে আছেন। হায়াত্ বক্স বাগিচায় এই তওফাওয়ালীটাকে নিয়েই তিনি সান্ধ্য বিহার করেন। শা বুরুজে কোকিজীকে পাশে নিয়েই তিনি নাকি 'বাদশা সালামত গ্রহণ করেন। আমীর খাঁর গাত্রদাহ। একটা মনের মত বাঈজীও তিনি উপহার পাঠাতে পারছেন না। নিত্যদিন একটা বাঈজী, তওফাওয়ালী বা বাঁদী তিনি বাদশাকে ভেট পাঠাচ্ছেন। কিন্তু কোকিজীর মত তাদের কেউ বাদশার চোখে এমন মোহ ছড়াতে পারেনি।

দিল্লীতে এখন ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের কোন ভিড় নেই। সারা হিন্দুস্থানের, ইরাণের, আর তুরাণের জেনানাদের ভিড় জমেছে

দিল্লীতে। একদিন দাস ব্যবসায়ীরা ভাগ্যান্বেষী সৈনিকদের এনে দিল্লীতে বিক্রী করত। সেই দাসদের মধ্য থেকেই এসেছিলেন সুলতান ইলতুৎমিস আর বলবন। আজ দিল্লীতে যারা মানুষ বিক্রী করতে আসে তারা নিয়ে আসে বাঁদী বাঈজী বা তত্তফাওয়ালী। অনেকক্ষেত্রে এইসব জেনানারা নিজেরাই এসে দিল্লীতে আস্তানা গাড়ছে। ধন্য মোগল আমীরদের রুচি—দলে দলে এইসব কিনছে। শুধুমাত্র দেশী ব্যবসায়ী নয়, সাগরপারের সেই বিদেশী ব্যবসায়ী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ আর ইংরেজরাও জুটেছে। এতে যেমন খবসুরৎ জেনানা আদমী বিক্রী করে অর্থ পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় দিল্লীর আমীর-দের খুস মেজাজ। বেনিয়ার জাতদের এর চেয়ে আর বেশী কি কাম্য হতে পারে। হজরত বাদশা নাকি এর জন্যে খুশী হয়ে বিদেশী বেনিয়াদের উপাধী দিয়েছেন—ফকর-অল্-তোজার অর্থাৎ বণিক শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, তাতো হবেই। তোবা! তোবা! সরমে মরে যাই। আল্লা বান্দাদের গুণাহ্ ক্ষমা করবেন না। এর ফল একদিন সকলকে ভোগ করতে হবেই।

—হিজরী ১১০৪ সাল। রমজান মাস। ঈদ আসবে সামনে। তুনিয়ার সব মুসলমানরাই রোজা পালন করছেন। শুধু সিয়া মুসলমানদের মধ্যে এ সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ নেই। বাদশা সুন্নি হয়েও রোজা রাখার ধার ধারছেন না। পবিত্রভাবে থেকে আল্লাতালার তুয়া মাগবার সময় তাঁর কোথায়? হিন্দুস্থানের অধিকর্তা খোদ বাদশা হারেমের অভ্যন্তরে এ-সবের কোন ধার ধারছেন না। লোকে যদি এ-সব জানে তবে বাদশার শেষ ইজ্জতটুকু ধূলায় মিলিয়ে যাবে।

খাসমহলের খোয়াব ঘরে আমি আর মালেকা-ই-জামানী রোজা রেখে ঈদের চাঁদের অপেক্ষা করছি। সন্ধ্যাবেলায় নামাজ পড়া শেষ হলে রোজা ভাঙব। মতি মসজিদে মোয়াজ্জিনের আজানের

অপেক্ষা করছি। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে রহিমা বাঁদী ছুটে এল আমাদের ঘরে। যেন খুব একটা সাংঘাতিক সংবাদ আছে তার কাছে এমনভাবে সে এসে মালেকা-ই-জামানী আর আমাকে সালামত জানিয়ে বলল : বেগম সাহেবা খবর শুনেছেন ?

কৌতূহলভরে আমি রহিমার মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। কিন্তু ঠিক এমন সময়ই মতি মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মালেকা-ই-জামানী নামাজের ভঙ্গিতে পশ্চিম দিকে হাঁটু গেড়ে বসে হাতের ইশারাতে রহিমাকে চুপ করতে বলল। আমার প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহল চেপে রেখে আমিও নামাজের ভঙ্গিতে বসে পড়লুম।

ধীর স্থির ভাবে মালেকা-ই-জামানী নামাজ শেষ করে উঠে রহিমার মুখের দিকে তাকালেন : বল কি বলছিলি ?

মালেকা-ই-জামানীর গম্ভীর ভাব দেখে রহিমা বোধ হয় একটু-খানি ঘাব্ড়ে গিয়েছিল। তাই তৎক্ষণাৎ সংবাদ পরিবেশনের ইচ্ছাটা চেপে গিয়ে বলল : বেগম সাহেবা সরবৎ এনে দেই। আগে রোজা ভাঙ্গুন।

গভীর ভাবে মালেকা-ই-জামানী বললেন : কি বলছিলি তাই বল আগে।

রহিমা বলল : কসুর নেবেন না হজরত সাহেবা। হারেমে বোধ হয় কিছু একটা গোলমাল হতে যাচ্ছে।

—যেমন ?

—আমির খাঁর মেয়ে খাদিজা খানাম হারেমে এসেছেন।

—ওরকম তো বহুজনই হারেমে আসছে।

—না, না, বাদশার জন্য তিনি বিশেষ ভেট নিয়ে এসেছেন আজ।

—ওরকম ভেট তো বহুজনই রোজ নিয়ে আসছে।

মালেকা-ই-জামানীর গম্ভীর ভাব দেখে রহিমা কেমন যেন হক্‌চকিয়ে গেল। আর সহসা কোন কথাই বলতে পারল না।

সত্যি বলতে কি মালেকা-ই-জামানীকে এমন গম্ভীর হতে আমিও আগে কখনো দেখিনি। আমরা দুজনেই তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

মালেকা-ই-জামানী বললেন : কি ভেট এনেছে বললি না তো? সিরাজী?

—না বেগম সাহেবা।

—তবে?

—বাঈজী।

—এ আর নতুন কি? এতো রোজই আসছে।

—না বেগম সাহেবা এ নাকি তেমন বাঈজী নয়। একেবারে ডানাকাটা হুরী। খুব নাকি খুবসুরত। বাদশার পছন্দ হয়ে গেছে।

—তাতে হয়েছে কি? কোকিজীকেও তো তাঁর পছন্দ হয়েছে।

—শুনছি এ পছন্দ নাকি তেমন নয়! নতুন বাঈজীকে দেখেই বাদশা এত খুস মেজাজ হয়েছেন যে, সঙ্গে সঙ্গে কোকিজীকে রংমহল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

—তাতে কি হল? একজনের জায়গায় আর একজন এল!

—না হজরত সাহেবা। বাদশা নাকি নতুন বাঈজীকে সাদী করবেন।

—সাদী!

—হ্যাঁ হজরত সাহেবা।

মালেকা-ই-জামানীর চোখে একটা বিদ্রূপ ফুটে উঠল যেন।

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন : বাদশার আর এক ধাপ উন্নতি হল। কি বল?

আমি কোন উত্তর করলুম না।

রহিমা বলল : বাদশা নাকি নতুন বাঈজীকে দেখাশুনা করবার

জন্য খোজা জাবিদ খাঁকে হারেমের প্রধান নাজির নিযুক্ত করেছেন।

আবার বিদ্রূপের কণ্ঠ শোনা গেল মালেকা-ই-জামানীর: আচ্ছা! তবে খুবই খবসুরত আর এলেমদার বাঈজী বলতে হবে।

রহিমা বলল: হজরত সাহেবা আমার কসুর নেবেন না। আরো ভয়ানক দুঃসংবাদ শুনেছি।

—কি?

—শা' নাকি বলেছেন— খাস মহলের খোয়াব ঘরে থাকবেন সেই বাঈজী।

গম্ভীর হয়ে গেলেন মালেকা-ই-জামানী: হুম!

—আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা হবে নাকি মমতাজ মহলে।

আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলুম: অসম্ভব! তা হতেই পারে না।

একটু হেসে আমার দিকে তাকালেন মালেকা-ই-জামানী: কেন?

—আমার কথা বাদ দিন। আপনার মত এমন অভিজাত ঘরের মেয়েকে খাস মহল থেকে হটিয়ে দিলে সমস্ত দিল্লী ক্ষেপে উঠবে। এর মানে কি জানেন? এর মানে এই বাঈজীকেই তবে হারেমের প্রধান বেগম করা হচ্ছে।

মালেকা-ই-জামানী তেমন ভাবেই হাসতে হাসতে বললেন: এরকমটা এতদিন যে ঘটেনি সে জন্যই আশ্চর্য বোধ করছি।

—দিল্লীর লোক এটা সহ্য করবে?

—দিল্লীতে লোক আছে বলে এখনো তোমার বিশ্বাস নাকি সাহিবা মহল? দিল্লীতে লোক নেই। থাকলে মোগল সাম্রাজ্যের আজ এ হাল হোত? দেখে যাও। আরো অনেকদূর যাবে। দেখে যাও।

এ যে কত বড় অপমান মালেকা-ই-জামানী কি সেটা বুঝছেন না? কিন্তু আমার চোখ ফেটে যেন জল আসছে। আমি বুকের

মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলুম। কিন্তু মালেকা-ই-জামানীর অদ্ভুত মনের গঠন। সহ্যের তাঁর সীমা নেই। নির্বিকার ভাবে তিনি বাঁদীর দিকে ফিরে তাকালেন: যা, এবার সরবৎ নিয়ে আয়।

একটু কুঁজো হয়ে কুর্ণিশের ভঙ্গী করে রহিমা বলল: হুকুম তামিল হচ্ছে বেগম সাহেবা।

সে চলে গেল।

কিন্তু আমায় যেন সারাদিনের রোজার চেয়েও বড় এক ক্লান্তি তখন জড়িয়ে ধরেছে।

দু-একদিনের মধ্যেই নতুন বাঈজীর পরিচয় পেলুম। বাজারের এক তওফাওয়ালী। হিন্দুস্থানী নাচনেওয়ালী। নাম উধনবাঈ। জাতে কাফের। অবশ্য চরিত্রহীন জেনানার আর জাত কি। কত প্রদেশের কত আমীর ওম্‌রা যে তাকে উপভোগ করছে কে জানে? চরিত্র বলতে বাঈজীর কিছু নেই। দিল্লীতে তওফাওয়ালীর খুব কদর শুনে অনেক ঘাটের পানি খেয়ে এখানে এসে ভিড়েছে। চকবাজারে বাঈজীকে দেখেই আমির খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন যে বাদশা একে দেখলেই ঘায়েল হবেন। বাদশাকে হাত করবার জন্য বাঈজীর সঙ্গে সাট করে তাকে হারেমে ভেট পাঠিয়েছেন আমির খাঁ।

একদল লোকের কাছে শুনি আমির খাঁ নাকি এলেমদার মানুষ। লেখাপড়া জানেন। হাফিজ, সাদি, রুমি, জামী, সবই তাঁর কণ্ঠস্থ। সেইজন্য তাঁকে ঘিরে বহু মুসায়ের আর শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে। সংস্কৃতি আর রুচির পরিচয় এই নাকি? হায় ! হিন্দুস্থানে মানুষ বলতে এখন আর কেউ নেই।

আমিরের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বাদশা কাত। খবসুরত বাঈজী দেখে বাদশা এত ঘায়েল যে দিনকয়েক রংমহলে নয়া

বাঈজীর কণ্ঠ ছেড়ে উঠতে পারছেন না। এখন কবে আমাদের খাসমহল ছেড়ে যাবার জন্য হুকুম আসে তাই ভাবছি।

খুব বেশীদিন সে হুকুমের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হোল না। ঈদের আগেই একদিন হারেমের নয়া নাজির জাবিদ খাঁ এসে উপস্থিত। লোকটা খোজা বটে তবে দেখতে একটা সুপুরুষের মত। গালে ইয়া চাপ বাঁধা আমিরদের মত দাড়ি। দেখলে খোজা বলে একেবারেই মনে হয় না। দুই চোখে শয়তানের মত দৃষ্টি। খোয়াব ঘরের সামনে এসে একটা অনুরক্ত কুকুরের মত মাটি ছুঁয়ে আমাদের সে কুর্নিশ জানালো।

হারেমের মধ্যে একটা অপরিচিত পুরুষ দেখে আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু রহিমা বাঁদী ওর পরিচয় দিয়ে আমাদের বলল: উনি হারেমের নয়া নাজির জাবিদ খাঁ।' মালেকা-ই-জামানীর দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল: হজরত সাহেবা আমি আপনাদের হুকুমের বান্দা। ফরমাস তামিল করবার জন্য আছি।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: তা আপনাকে তো তলব করা হয়নি? জাবিদ খাঁ বলল: তা জানি বেগম সাহেবা। তবে বাদশা আমাকে খোয়াব ঘরে আসবার জন্য হুকুম করলেন কিনা।

মালেকা-ই-জামানীর কণ্ঠে বিদ্রূপ ফুটে উঠল: শাহেন শা যে তক্‌লিফ করে আমাদের কথা মনে করেছেন—সে জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানাবেন। আমাদের তদারক করতে হবে না। আমরা ভালই আছি।

কেমন একটু বিব্রত বোধ করে জাবিদ খাঁ তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো।

মালেকা-ই-জামানী তার আপাদ মস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন: কিছু বলবেন?

—জী হজরত সাহেবা।

—কি ?

—শাহেন শার একটা হুকুম ছিল।

—বলুন।

—খোয়াব ঘরে আপনাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে শুনে বাদশা আপনাদের জন্য মমতাজ মহলে আলাদা ব্যবস্থা করেছেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মালেকা-ই-জামানী অনেকক্ষণ জাবিদ খাঁকে দেখে নিয়ে শুধু ছোট্ট একটু শব্দ করলেন—হুম !

জাবিদ খাঁ লোকটি সত্যি চতুর। মালেকা-ই-জামানীর এ-দৃষ্টির কাছে অনেকে হলে আগেই সেঁধিয়ে যেতো। কিন্তু সে একটুও ঘাবড়ালো না। দু'চোখে শয়তানী দৃষ্টি নিয়ে সে আবার মাথা তুলে তাকাল : আপনাদের কোন তক্‌লিফ হবে না বেগম সাহেবা। নির্ঝঞ্ঝাটে যাতে আপনারা সেখানে যেতে পারেন আমি সে ব্যবস্থা করে দেব।

মালেকা-ই-জামানী বললেন : দয়া করে আপনাকে কোন ঝঞ্ঝাট করতে হবে না। আমরা নিজেরাই যেতে পারব। তা বাদশা কবে যেতে হুকুম করেছেন ?

—সে আপনাদের যে দিন মর্জি হবে বেগম সাহেবা। আপনাদের সুবিধার জন্যেই তো...... ।

প্রায় যেন ধমকে উঠলেন মালেকা-ই-জামানী : থাক্। বাদশার গুন কীর্তন অতটা আর না করলেও চলবে। শাহেন শাকে বলবেন আজই আমরা খোয়াব ঘর ছেড়ে মমতাজ মহলে চলে যাব।

জাবিদ খাঁ সন্তুষ্ট। মাটিতে নুইয়ে পড়ে আরো কয়েকটা কুর্ণিশ জানিয়ে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

আমি সবকিছু এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলুম। বাদশার উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে আমার আর বাকী থাকল না। বুঝলুম মুখ্য বেগমের পদ থেকে মালেকা-ই-জামানীকে তিনি হটিয়ে দিচ্ছেন। সেখানে হয়তো বাজারের সেই তওফাওয়ালীটা বসবে। আমার মাথায় যেন

আগুন ধরে গেল। বাদশার অনেক অবহেলা সহ্য করেছি, আর নয়। চিৎকার করে জাবিদ খাঁকে ডেকে উঠলাম—দাঁড়ান।

—'হুকুম করুন বেগম সাহেবা।' জাবিদ খাঁ ফিরে তাকাল। বললুম: শাহেন শাকে গিয়ে বলবেন—তাঁর এ হুকুম তামিল হবে না।

এতটা বোধহয় ভাবতে পারে নি জাবিদ খাঁ। কথা হারিয়ে আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে-থাকল সে।

বললুম: আমাদের বে-ইজ্জত করে যদি সেই তওফাওয়ালীটাকে তিনি খাস মহলে বসাতে চান, সেটা আমরা মেনে নেব না।

—'তওফাওয়ালী!' যেন কিছুই বুঝতে পারেনি এমন ভাব করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে।

—হ্যাঁ তওফাওয়ালী। সেই উধম বাঈ না কি, যাকে বাদশা কয়েকদিন হল সাদী করেছেন?

—ও! হজরত বৈজুসাহিবার কথা বলছেন?

যেন একটা বিছে কামড়ে ধরেছে এমন ভাবে আমার সমস্ত শরীরটা জ্বালা করে উঠল। বললুম: তওফাওয়ালী আবার বৈজুসাহেবা উপাধি পেয়েছেন নাকি? তা ভাল। যেমন বাদশা, তেমন তার বেগম হবে তো। বাদশাকে বলবেন—খাস মহল আমরা ছেড়ে যাচ্ছিনা। আমাদের খাস মহল থেকে সরাবার চেষ্টা হলে সরাসরি দিল্লীর সুন্নী আমীরদের কাছে আমরা আর্জি রাখব।

বোধহয় অনেকটা বেশী এগিয়ে গিয়েছিলাম। মালেকা-ই-জামানী আমাকে ধমকে ফেরালেন: থাম। কি 'আবোল তাবোল বকছ।' ফিরে তাকিয়ে জাবিদ খাঁকে তিনি বললেন: যান খাঁ সাহেব, বাদশাকে আমাদের সালামত জানিয়ে বলবেন আজই আমরা খোয়াব ঘর ছেড়ে মমতাজ মহলে চলে যাচ্ছি।

—'আপনাদের যেমন মর্জি বেগম সাহেবা।' আবার নত হয়ে আমাদের দুজনকেই কুর্ণিশ জানিয়ে জাবিদ খাঁ চলে গেল।

আমি মালেকা-ই-জামানীকে বললুম: বাদশার এ অন্যায় হুকুম মেনে নেওয়া ঠিক হল না।

মালেকা-ই-জামানী একটু হাসলেন। বললেন: না নিয়ে আর কি করবার আছে? আমরা না গেলে জোর করে তাড়াবেন বাদশা। —সে ক্ষেত্রে আমরা দিল্লীর আমীরদের কাছে আর্জি রাখব।

আবার একটু ম্লান হাসি হাসলেন মালেকা-ই-জামানী: দিল্লীর আমীরদের কি আর সে ইজ্জত বোধ আছে। থাকলে তওফাওয়ালী ভেট পাঠিয়ে বাদশাকে হাত করবার চেষ্টা করে কেউ? কাফেররা দিকে দিকে স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে মারাঠাগুলো দাক্ষিণাত্য তচনচ্ করে দিচ্ছে, সেদিকে হুঁশ নেই কারো। অথচ দিল্লীতে খবসুরত জেনানা নিয়ে পাগলামী চলছে। মানুষ আছে নাকি কেউ যে কারো কাছে আর্জি রাখবে?

বললুম: তাই বলে এ অন্যায়ও সহ্য করে যাবো?

—সময় যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বৈ কি।

কি জানি, মালেকা-ই-জামানী কি বোঝেন। আমার মনে হয়— বাদশার এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। একটু ঘা না খেলে বাদশার হুঁশ হবে না। তাঁকে বাড়তে দিলে বাদশার স্বেচ্ছাচারিতা দিনে দিনে বেড়েই যাবে। কিন্তু, তবু মালেকা-ই-জামানীকে অস্বীকার করবার তো আমার উপায় নেই!

॥ ৩ ॥

যে দেশের শাসক জেনানার ইজ্জত রাখতে পারেনা— সে দেশের শাসক নিজের সাম্রাজ্যের ইজ্জত রাখবে কি করে? মোগল সাম্রাজ্যের ইজ্জত হারাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এই যে এত মেয়েছেলের সর্বনাশ করছেন আমাদের বাদশা এর একটা ফল তাঁকে ভোগ করতে হবে না? তওফাওয়ালী আর বাঈজীতে কুলাচ্ছে

না, মাঝে মাঝে বাঁদীদের ধরে নিয়েও বে-ইজ্জত করা হচ্ছে। তোবা! মেয়েছেলের লোভ কি এতই বেশী যে অন্য সব বোধগম্যি ভেস্তে যায়?

বেগম জয়পুরিয়া বাঈ মারোয়ারের হিন্দু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নতুন এক বাঁদী কিনেছেন। বাঁদী জাতে রাজপুত রমণী! প্রাসাদ চত্বরে দু-একদিন তাকে দেখেছি। সত্যি অপূর্ব জেনানা। বয়স অত্যন্ত কম। ষোল বৎসর অতিক্রম করে নি। নাম সিতারা বাঈ। হেন অপূর্ব সুন্দরী জেনানাকে হারেম চত্বরে উন্মুক্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। ভেবেছিলুম বাদশার চোখে পড়লে না জানি কি ঘটে। বেগম হয়ে খাস মহলেও ঢুকতে পারে। আবার উচ্ছিষ্ট উদ্‌বৃত্ত ভোজ্য দ্রব্যের মত নোংরা জায়গায়ও নিক্ষিপ্ত হতে পারে। শেষের সম্ভাবনাই বেশী। কারণ যত সুন্দরী জেনানাই হোক না কেন পুরুষের চোখের সামনে তার গোপন রহস্য অনাবিস্কৃত থাকা পর্যন্তই তার আকর্ষণ। সে রহস্য ভেদ হয়ে গেলে আর কোন আকর্ষণ থাকে না। তখন আকর্ষণ রাখবার জন্য নানা প্রকার ছলাকলার প্রয়োজন। রাজপুত জেনানা সিতারা বাঈয়ের যে সে ছলাকলা জানা নেই তার মুখ দেখেই তা বোঝা গিয়েছিল। সুতরাং সিতারার ভাগ্য কল্পনা করে আমি ব্যথাই পেয়েছিলুম।

আমার সন্দেহ মিথ্যে হয়নি। সরলমতি রাজপুতানীর ইজ্জত হরণ করে বাদশা মহম্মদ শা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। বাজারের তওফাওয়ালী উধম বাঈই মুখ্য বেগম হয়ে খাস মহলের খোয়াব ঘরে আছে এখন। কিন্তু সিতারা বাঈয়ের ইজ্জতহানীর কথা শুনে বেগম জয়পুরিয়া বাঈ ক্ষেপে গেছে যেন। তার পক্ষপুট আশ্রিতা সিতারা বাঈয়ের ইজ্জত নিয়েছেন বাদশা, এটা সে সহ্য করবে না। রাজপুতের আক্রোশ ভয়ানক ব্যাপার। জানিনা জয়পুরিয়া বাঈ বাদশা মহম্মদ শাকে কখনো ক্ষমা করবে কিনা।

এটাতে তাঁর আত্মসম্মানেও বেশ ঘা লেগেছে। বেগম ছেড়ে তার বাঁদীত আকৃষ্ট হলেন বাদশা! এটা কি কম অপমানের কথা!

সিতারা বাঈকে এ ঘটনার পর আরো ছুদিন আমি দেখেছি। তার সেই নিষ্পাপ সৌন্দর্যের উপর একটা ম্লান বেদনার ছায়া পড়েছে যেন। বঞ্চনার একটা তীব্র যন্ত্রনা তার বুকের মধ্যে গুমরে মরছে। কাফের জেনানা হোক, আর যাই হোক, তার বুকের এ দীর্ঘশ্বাস বাদশাকে লাগবেই লাগবে। শুধু কি সিতারা? নীরবে এমন আরো কত জেনানা যে ইজ্জত দিয়েছে তার খবর কে রাখে। জয়পুরিয়া বেগমের চিৎকারে এ-কথা জানা গেল। অন্যত্র হয়তো তা জানা যায় না। এ ভয়েই মালেকা-ই-জামানী কোন খবসুরত বাঁদী ঘরে রাখেন না। এর ফলে তারো যেমন বিপদের সম্ভাবনা আমাদেরও তেমনি সম্মান হারাবার ভয় হয়। আমাদের নসিব রহিমা বাঁদী দেখতে মোটেও দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত নয়।

বহুদিন যাবৎ আমি যে শঙ্কা পোষণ করছিলুম, যে মোগল সাম্রাজ্যের ইজ্জত হারাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে হিজরী ১১৬৬ সালের রজব মাসে আমার সে শঙ্কার স্বপক্ষে কতকগুলি স্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা গেল। সব চাইতে বড় ইঙ্গিত এল ইরাণ থেকে। ইরাণের নয়া শাসক হয়েছেন এখন তুর্কোমান নাদির কুলি খাঁ। নাদির কুলির কথা আগেই বলেছি। শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, রুচি নেই, সংস্কৃতি নেই। আছে শক্তি আর অফুরন্ত ক্রোধ। কয়েক বছর যাবৎ সেই ক্রোধের কাছে ইরাণের বহু লোকই বলি হয়েছেন। আমাদের অপদার্থ, লম্পট, চরিত্রহীন বাদশা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইরাণের নয়া শাহের সেই ক্রোধটা হিন্দুস্থানের দিকে টেনে আনলেন। বাদশার দুষ্কর্মের ফল হিসাবে হিন্দুস্থানের লোকের নসিবে এটাই বুঝি পাওনা ছিল। দিল্লীর দরবার নাদির কুলিকে ক্ষেপিয়ে দিল।

ইরাণের আফগান দস্যুদের তাড়িয়ে নিয়ে নাদির কুলি গত

বছর কান্দাহারের আফগান দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। সেখান থেকে বহু আফগান পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের বাদশার সীমান্ত প্রদেশ কাবুলে। নাদির কুলি বিদ্রোহী আফগানদের মোগল বাদশা প্রশ্রয় দিচ্ছেন এই অভিযোগ করে এক প্রতিবাদ পত্র দিয়ে দিল্লীর দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন। অপদার্থ সব আমিরেরা মোগল বাদশাকে ঘিরে রয়েছে। এ বিষয়ে একটা সুপরামর্শ পর্যন্ত তারা শাহেন শাকে দিতে পারেননি। এতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে নাকি তাদের ভাববার অবসর হয়নি। অপদার্থের দল! অথচ নিত্য দেওয়ানী খাসে বাঈজীর নাচ হচ্ছে দিনের পর দিন। মোগল দরবার থেকে ইরাণের শাহকে কোন জবাব তো দেওয়া হয়ইনি উল্টে শাহের দূতকে এক বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে। যত বেকুবের দল! যদি তাগদ থাকতো ইরাণের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার তবু একটা কথা ছিল। ক্রুদ্ধ শা নাদির কুলি মোগল বাদশাকে শিক্ষা দেবার জন্য হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

অপদার্থ! অপদার্থ দিল্লীর শাহেন শা আর তাঁর দরবার। তওফাওয়ালী আর বাঈজীদের নিয়ে এত মেতে আছেন তাঁরা যে এ বিষয়ে কোন খোঁজ খবর পর্যন্ত রাখেননি। ইতিমধ্যে আফগানিস্থান জয় করে নাদির কুলি পাঞ্জাবের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন। এত দিনে হুঁশ হয়েছে দিল্লীর কর্তাদের। কিন্তু তবু যদি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেন তাঁরা।

বহুদিন পরে সরাব, সিরাজী, তওফাওয়ালী আর বাঈজীর নেশা বাদ দিয়ে দেওয়ানী আমে সমবেত হয়েছেন আমীর ওম্‌রারা। এদিকে হারেমে একটা শঙ্কার ছায়া নেমেছে। নাদির কুলি সম্পর্কে নানা গুজব ইতিমধ্যেই হিন্দুস্থানে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। এত বদ্‌মেজাজী শা নাকি ইরাণের সিংহাসনে ইতিপূর্বে কেউ কখনো বসেননি। শা যার উপর অসন্তুষ্ট তার কোন মতেই রেহাই নেই। বিদ্রোহীর

রক্তে ইরাণের মাটি রাঙিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর এই মেজাজ নিয়ে তিনি যদি হিন্দুস্থানে আসেন তবে মোগল বাদশা থেকে আমীর ওম্‌রারা কেউ রেহাই পাবেন না। আমাদের শাহেন শার যা চরিত্র, জন্মে কোনদিন একটা ছোটখাটো যুদ্ধও করেন নি। মোগল আমীরেরাও লম্পট মেয়েছেলে আর চরস, ভাঙ, গাঁজা নিয়ে পড়ে আছেন। তাঁদের দ্বারা আর যুদ্ধ পরিচালনা করা কোন রকমে সম্ভব নয়। একটা সংঘর্ষ বাধলে আমাদের পতন অনিবার্য। তখন লালকেল্লার মোগল হারেমের যে কি অবস্থা হবে কে জানে। মোগল হারেমে এখনো যাদের সামান্যমাত্র বুদ্ধি আছে, তারা তাই চিন্তান্বিত। আমরা কয়েক জনে মুহুর্মুহু দরবারের খবর নিচ্ছি। কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, না জেনে আমাদের কোন স্বস্তি নেই।

কিন্তু দেওয়ানী আম থেকে ঘন ঘন যে সংবাদ পাচ্ছি তাতে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। দেশের এই চরম দুর্দিনেও দরবারে ইরাণী আর তুরাণীদের সেই পুরানো বিবাদ চলছে। ওয়াজীর কামরুদ্দিন চরম অপদার্থ। নেশা করে বুঁদ হয়ে সারা দিন পড়ে থাকেন তওফাওয়ালী নিয়ে। একটা পরিচয় দেবার মত সেনাবাহিনীও তাঁর হাতে নেই। অথচ এ হেন ব্যক্তিই মোগল সাম্রাজ্যের ওয়াজীর এবং হিন্দুস্থানে তুরাণী দলের নেতা। তিনি ওয়াজীর দাক্ষিণাত্যে তাঁর ভাই আসফ ঝার কল্যাণে। মোগল সাম্রাজ্যে এখন সব চাইতে শক্তিশালী আমীর হলেন দাক্ষিণাত্যের নিজাম আসফ ঝা। তাঁর ভয়ে শাহেন শা এখনো কামরুদ্দিনকে ওয়াজীরের পদ থেকে হটাতে পারছেন না, নইলে বিরুদ্ধ দলের চক্রান্তে এতদিন কবে তাঁকে মোগল দরবার থেকে বিদেয় নিতে হোত। বাদশাকে এতদিন খবসুরত জেনানা আদমি ভেট পাঠিয়ে খুসমেজাজ রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু সে কৌশল তার ব্যর্থ হয়েছে। উধম বাঈকে হারেমে পাঠিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইরাণী দলের নেতা আমির খাঁ এখন বাদশার পেয়ারের আমীর হয়েছেন। ইরাণী নেতারা কামরুদ্দিনের দুর্বলতার কথা জানেন।

তাই তাঁরা চেপে ধরেছেন ওয়াজীর কামরুদ্দিনকে : ইরাণের শাহ নাদির কুলিকে বাধা দিতে হবে।

লম্পট ওয়াজীরের যুদ্ধ করবার মত সাহস বা ক্ষমতা কোনটাই নেই। তার যত হম্বিতম্বি সব নিজাম আসফ ঝার দৌলতে। কিন্তু তিনি এখন দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যস্ত। নাদিরকে বাধা দেবার জন্যে উত্তর ভারতে আসবার তাঁর ক্ষমতা নেই। সুতরাং কামরুদ্দিন পরামর্শ দিচ্ছেন নাদির কুলিকে বাধা না দিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেবার জন্যে। কারণ তিনি জানেন যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে তাঁর পতন অনিবার্য।

কিন্তু তাঁর দুর্বলতার কথা টের পেয়ে ইরাণী দল চেপে ধরেছে যে বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ করতেই হবে। এ-সব ব্যাপারে শাহেন শা কাপুরুষ। তিনি কোন স্থির সিদ্ধান্তই নিতে পারছেন না। ওদিকে খবর এসে পৌঁছে গেছে যে নাদির পাঞ্জাব পর্যন্ত এসে গেছেন। কি লজ্জা! কি লজ্জা! এত বড় নপুংশক বাদশা আলমগীরের হিন্দুস্থানে তক্তে বসলেন কি করে?

সমস্ত দিল্লী শহরে একটা সন্ত্রাসের ছায়া পড়ে গেছে। নাগরিকেরা দরবারের এমন কাপুরুষোচিত ব্যবহারে দিশেহারা হয়ে ভাবছেন নাদির আর অগ্রসর হলে কি করবেন? তল্পিতল্পা গুটিয়ে অনেকেই দিল্লী ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তোবা! তোবা!

হারেমে আমরা সকলেই বড় অস্থির বোধ করছিলাম। এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হলে এর পরিণতি কি হবে? অবশেষে দুদিন পর একটা সিদ্ধান্তের খবর পাওয়া গেল। পাঞ্জাবের পতন হয়েছে। সিপাহশালার জাকারিয়া খাঁ নাদির কুলির কাছে প্রায় বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেছেন। অবশেষে দাক্ষিণাত্য থেকে নিজাম-উল-মুলক আসফ ঝা পর্যন্ত নাদির কুলিকে বাধা দেবার জন্য বাদশাকে পরামর্শ দিয়েছেন। খবর পাঠিয়েছেন তিনিও স্বয়ং এ উদ্দেশ্যে তাঁর বাহিনী নিয়ে দিল্লী এসে পৌঁছুচ্ছেন। কাপুরুষ

কামরুদ্দিনের আর উপায় কি। অগত্যা তিনিও রাজি হয়েছেন। কারনালের প্রান্তরে নাদির কুলির বাহিনীর গতিরোধ করার জন্য বাদশার শিবির ফেলবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাদশা ফরমান জারি করে তার সিপাহশালারদের তড়িঘড়ি সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে নিতে বলেছেন। যে কারচুপি চলেছে প্রশাসনের মধ্যে তাতে মনসবদারেরা আদপে কোন সেনাবাহিনী রাখেন কি না তাই বা কে জানে। যা হোক তবু বাধা দেবার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তো!

॥ ৪ ॥

হিজরী ১১১৭ সাল। জেলহজ্জ। হারেমে খবর এসেছে বাদশা স্বয়ং যাবেন যুদ্ধক্ষেত্রে। মোগল বাদশাদের রীতি অনুযায়ী সেই সঙ্গে হারেমও যাবে। অর্থাৎ যুদ্ধ বলেই জেনানাদের সঙ্গ ছাড়া হয়ে থাকতে হবে নাকি? জেনানাদের সঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্ত থাকা যায়? তোবা! তোবা!

সন্ধ্যাবেলায় হারেমে খবর এল বাদশা ভোররাত্রির আজানের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী থেকে পাঞ্জাবের দিকে বেরুবেন। মোগল বাহিনীর উদ্দেশ্য দিল্লীর পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে কারনাল নামক স্থানে গিয়ে শিবির ফেলবে। ও পথেই নাকি নাদির কুলি দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন। বাদশার শিবিরে বেগমদেরও যেতে হবে। সে জন্য সব বেগমদের ঘরে খবর এসে গেছে। আমার যাবার ইচ্ছে নেই। হারেম সঙ্গে নিয়ে যাবেন যে অপদার্থ বাদশা তিনি কি তার মর্যাদা রাখতে পারবেন? কিন্তু মালেকা-ই-জামানী বললেন: এটা মোগল বাদশাদের চিরকালের নীতি। যুদ্ধক্ষেত্রে বেগম মহলকেও নিয়ে যেতে হয়। এ আদব-কায়দা আমরা তো জানি। সুতরাং যেতে হবেই।

এর যে প্রয়োজনীয়তা কি জানিনে। বিলাস ছাড়া একে আর

কি বলা যায়। কিন্তু যেতে হবেই। আর যাই হোক মালেকা-ই-জামানীর কথাতো আমি ঠেলতে পারিনে!

শুনলাম বাজারের তওফাওয়ালী সেই বাঈজীটা—উধম বাঈ, আমাদের বাদশার পেয়ারের বেগম নাকি যাবে না। মুখের উপর বাদশাকে না করে দিয়েছে সে। দেবেই। মোগল দরবারের রীতিনীতির সে কি বোঝে। জয়পুরিয়া বেগম যেতে রাজি হয়েছেন। আরো দু-একজন প্রাক্তন বেগম। সঙ্গে যাবে অসংখ্য বাঁদী। জানিনা আল্লাতালা কি করবেন। অবশ্য আমাদের এখন যা অবস্থা তাতে হারজিতের আর মূল্য কি।

কোন জিনিষের গুরুত্ব বুঝবার ক্ষমতা কি এখন আমাদের বাদশার আছে? পঞ্চাশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে বাদশা চারদিন কাটিয়ে দিলেন। অথচ আকবর বাদশা কয়েক শ' ক্রোশ দূরে চল্লিশ দিনে গুজরাট জয় করে ফিরে এসেছিলেন।

কারনালে গিয়ে পৌঁছুলাম সন্ধ্যাবেলায়। আমাদের শিবির পড়ল আলিমর্দন খাঁ খালের ধারে। নাদিরকুলি তখনো এসে পৌঁছাননি। কিন্তু বাদশার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। জীবনে তো কোনদিন তিনি যুদ্ধ করেননি। যুদ্ধের নাম শুনে হৃৎপিণ্ডে তাঁর এখন স্পন্দন নেই যেন। তার উপর আওধার সিপাহশালার সাদাত খাঁ বুরহান-উল্-মুলক্ এখনো এসে পৌঁছাননি। বাদশার প্রধান ভরসা তিনিই। তবে বাদশার যে নৈতিক শক্তি নেই, তার সঙ্গে স্বয়ং গ্যাব্রিয়েল থাকলেও তিনি কি কোন ভরসা পাবেন?

বাদশা নাকি খুবই ভয় পাচ্ছেন। তাকে ইরাণী তুরাণী দুই দলই বোঝাচ্ছেন। কিন্তু তবু তিনি সাহস পাচ্ছেন না। দাক্ষি-ণাত্যের সিপাহশালার যে চিন্‌কুলিচ খাঁ নিজাম-উল্-মুল্‌ককে তিনি হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় বীর বলে মনে করেন, তার উপস্থিতিতেও তিনি সবরকম সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। শুধু বলেছেন, সাদাত খাঁ বুরহান-উল্-মুল্‌ক কোথায়?

প্রায় সপ্তাহখানেক আমরা কারনালের ধারে শিবির ফেলে বসে রইলাম। বাদশার বাঈজীর নেশা ছুটে গেছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই নাদির কুলির ভয়ে তিনি শুকিয়ে উঠছেন। আর যত বেশী ভয় পাচ্ছেন তত বেশী সিরাজী গিলছেন। লজ্জা! লজ্জা!

দিন ছয়েক পরে নাদির কুলি এসে কারনাল শহরের কিছু দূরে শিবির ফেললেন। নাদির কুলির সংবাদ পেয়েই বাদশা পালিয়ে যান আর কি। নাদির কুলির সঙ্গে ছিল পঞ্চান্ন হাজার সৈন্য। বুরহান-উল্-মুলক এসে না পৌঁছালেও বাদশার সৈন্য সংখ্যা নাদির কুলির চাইতে হাজার দশেক বেশী। তবু শাহেন শা সকল সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। নিজাম-উল্-মুলক অনেক করে বুঝিয়ে তবে তাঁকে করনালে আটকে রেখেছেন।

উভয় বাহিনী মুখোমুখি বসে আছে, কেউ কাউকে আক্রমণ করছে না। গভীর উৎকণ্ঠায় আমরা শিবিরে অপেক্ষা করছি। বাদশার তো কাণ্ডজ্ঞানই হারিয়ে গেছে। আমীরদেরও হৈ হুল্লোড় বন্ধ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ ১৭ই জেলহজ্জ ভোরবেলা ভাল করে আলো না ফুটে উঠতেই কামানের আওয়াজ শোনা গেল। লোকজনের ছুটোছুটি ও চিৎকারের আওয়াজ এল। তবে কি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল নাকি? কিন্তু কৌতূহল থাকলেও তখন কিছু বুঝবার উপায় নেই। একবার শিবিরের বাইরে এসে দূরে তাকালাম। কিছুই দেখা গেল না। আমাদের শিবির সিপাহীদের শিবির থেকে বেশ কিছুটা পেছনে। বেগম বাঁদী সকলেই আল্লার নাম স্মরণ করতে লাগলো। কি জানি কি হয়!

সকালবেলা আলো ফুটে উঠতে আসল খবরটা পাওয়া গেল। আওধার সিপাহশালার সাদাত খাঁ বুরহান-উল্-মুলক হাজার দশেক সিপাহী নিয়ে কারনালে বাদশার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আসছিলেন। নাদিরকুলি খবর পেয়ে পেছনে তার রসদ আক্রমণ করেছেন। বুরহান-উল্-মুলকও রসদ উদ্ধার করবার জন্য নাদির কুলির

বাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করেছেন। যুদ্ধ বেধে গেছে। বুরহান-উল্-মুল্ককে সাহায্য করছেন খান দুরান। কিন্তু কি আশ্চর্য! বাদশা এবং নিজাম-উল্-মুল্ক চুপ করে বসে আছেন।

বেলা এক প্রহরে গোলাগুলি, হৈ হুল্লোড় চিৎকার থামলো। যে খবর পেলাম তাতে উল্লাস করবার আমাদের কিছু থাকলো না। বুরহান-উল্-মুল্ক আহত হয়ে নাদির কুলির হাতে বন্দী হয়েছেন। অপরপক্ষে আহত খান দুরান নিজের শিবিরে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নাদির নিজের শিবিরে ফিরে গেছেন। কি তাজ্জবের কথা! বাদশা আর নিজাম-উল্-মুল্ক সেই মুহূর্তে যুদ্ধে যোগদান করলে আমাদের জয় অনিবার্য ছিল। অথচ তিনি কি করলেন? কি অপদার্থ বাদশা! যদি যুদ্ধই না করবেন তবে কারনালে এলেন কেন তিনি?

আমাদের সকলের মনই যেন কেমন ভেঙে গেল। যদিও অন্তরের অন্তস্থলেও আমরা কেউ আশা করিনি যে এ যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হবে। তবু সামনাসামনি এমন পরাজয়ের সংবাদে কেমন যেন মুষ্ড়ে পড়লাম। বাদশা এবং নিজাম-উল্-মুল্ক যে যুদ্ধ করবেন না এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তাহলে অবস্থাটা হবে কি? এখনো যে দুই দিকে দুই দেশের সেনাবাহিনী শিবির ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, এমনি ভাবেই কি তারা দাঁড়িয়ে থাকবে? নিশ্চয়ই নয়। মোগল শিবিরের অবস্থা একটু লক্ষ্য করে তারপর নিশ্চয়ই নাদির কুলির বাহিনী এগিয়ে আসবে। তখন?

আমরা কেউ যেন কিছুই ভাবতে পারছি না। সবাই একেবারে চুপ করে আছে। সবাই সন্ত্রস্তভাবে অপেক্ষা করছে—কখন নাদির কুলির বাহিনী এসে আমাদের শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু ইরাণী বাহিনী দুপুর নাগাদও ঝাঁপিয়ে পড়ল না। আমরা খবর পেলাম যে আহত সাদাত খাঁ বুরহান-উল্-মুল্ক আমাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ইরাণের শাহের সঙ্গে

আলোচনা করে একটা রফায় আসবার ব্যবস্থা করেছেন। সম্ভবত বুরহান-উল্‌-মুল্‌কের সাহস দেখে নাদির কুলিও একটু চিন্তায় পড়েছেন। ভেবেছেন, সব মোগল সিপাহশালা বুঝি এমনি দুর্ধর্ষ, নির্ভীক ও সংগ্রামী। সুতরাং আলোচনার পথে বিবাদের একটা ফয়সালা করতে পারলে তিনি অরাজি নন। বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক নাদির কুলিকে বুঝিয়েছেন যে, মোগল শক্তি সহজে হেলাফেলার জিনিষ নয়। মূল মোগলবাহিনী এখনো অটুট রয়েছে। সংঘর্ষ বাধলে ফলাফল সম্পর্কে নাদিরকুলি মিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। জয়লাভের অনিশ্চয়তা থেকে আলোচনার মাধ্যমে যদি বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে কিছু লাভ হয় সেটাই ভাল। সুতরাং নাদির কুলি মোগল শিবির আক্রমণ করেন নি।

আলোচনার প্রস্তাব হিসাবে নাদির কুলিকে বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক যে শর্ত দিয়েছেন সেটা ইরাণের শাহের পক্ষে একেবারে অলোভনীয় কিছু নয়। বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক বলেছেন হিন্দুস্থান ত্যাগ করে গেলে নাদির কুলি দুইকোটী টাকা পাবেন।

হিন্দুস্থানের মত এত ঐশ্বর্য দুনিয়ায় আর কোথায় আছে? দুই কোটী টাকা ইরাণের শাহের কাছে বিরাট একটা কিছু। তিনি রাজি হয়েছেন।

সংবাদটা পেয়ে আমরা সকলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। আল্লা বুরহান-উল্‌-মুল্‌ককে দোয়া করুন। তাঁর আঘাত সেরে গিয়ে তিনি সুস্থ হয়ে উঠুন।

কাপুরুষ দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শা চোখে বোধহয় আমাদের চাইতেও বেশী স্বস্তির লক্ষণ ফুটে উঠেছে। যুদ্ধকে তিনি যে কোন জিনিষের চাইতে বেশী ভয় করেন। লিখতেও লজ্জা করছে। নাদির কুলির আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই আমাদের শা ইরাণের শাহের দরবারে দুই দুইবার এ ব্যাপারে সঠিক সংবাদ পাবার জন্য নিজাম-উল্‌-মুল্‌ককে পাঠিয়েছেন।

নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক জেনে এসেছেন যে সংবাদ সত্য। এ-কথা

জানবার পর বাদশা হারেম-শিবিরে বাঁদীদের সরবৎ নিয়ে যাবার জন্য হুকুম করেছেন। গত দুইদিন তিনি এত ভয় পেয়েছিলেন যে, সরবৎ তো দূরস্থান, সরাব পর্যন্ত পান করতে ভুলে গিয়েছিলেন। যে বাদশা গাঁজা, চরস, সিরাজী, সরাব আর জেনানা নিয়ে সারা দিন রাত কাটান, তিনিও এ কয়দিন ওসব ছেড়ে দিয়ে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়েছেন।

কিন্তু নসিবে যদি লাঞ্ছনা থাকে, তাকে খণ্ডাবে কে? পাপ করলে তার গুনাগার দিতে হবেনা? শেষ পর্যন্ত সবই ভেস্তে গেল। শয়তান নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক বাদশাকে বুঝিয়েছেন যে, বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক আসলে কিছুই করেন নি। তিনিই নাদির কুলির সঙ্গে আলোচনা করে একটা ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং আহত মির বক্‌শি খান দুরানের মৃত্যুতে যে পদটা শূন্য হয়েছে, সেটা তারই প্রাপ্য হওয়া উচিত।

কাপুরুষ যে বুদ্ধিহীন হবে এটা তো সহজ কথা। বুর্বক বাদশা নিজামের কথায় ভুলে মির বক্‌শির পদটা তাকেই দিয়েছেন। শুনতে পাচ্ছি এ সংবাদ নাদির কুলির শিবিরে গিয়ে পৌঁছানো মাত্র ইরাণী শিবিরে বন্দী বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক ভয়ানক ক্ষেপে গেছেন। মির বক্‌শির পদটা তাঁরই পাওয়া উচিত ছিল। বাদশার অকৃতজ্ঞতায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক নাকি নাদির কুলিকে জানিয়েছেন যে, মোগল শিবির বাইরের একটা আকৃতিই মাত্র। আসলে সব ফাঁকা। যুদ্ধ করবার মত এলেম বাদশার শিবিরে কারো নেই। চাপ দিলে মোগল বাদশা মহম্মদ শা দুইকোটী কেন, বিশকোটী টাকা দিতেও বাধ্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর লালকেল্লায় ঐশ্বর্যের অভাব নেই।

জানিনা এ সংবাদ পেয়ে নাদিরকুলি কি ভাবছেন। তবে দেখছি আমাদের বাদশা কিছুক্ষণ যাবৎ ঘনঘন সরবৎ আর সিরাজীর যে হুকুম চালাচ্ছিলেন তা বন্ধ হয়ে গেছে। মালেকা-ই-জমানীকে এ ব্যাপারে

কিছু জিজ্ঞাসা করতে তিনি ভ্রূকুটি করে এমন ভাব দেখালেন যে, কি বলব! বাদশার কাপুরুষতা দেখে তিনি খুব চটে গেছেন। হাজার হোক দিল্লীর সব চাইতে সম্ভ্রান্ত বংশের রক্ততো তার দেহে আছে! এমন নিবীর্য কাপুরুষতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি বললেন: "ভালমন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে কি হবে? আমরা যে লোকের হাতে আছি তার চেয়ে আর কোন অপদার্থ লোকের হাতে গিয়ে পড়ব না এটা নিশ্চয়। খুদাতালাকে ডেকে নসিবের উপর নির্ভর করে বসে থাক! অপদার্থ সম্পর্কে এ কৌতূহল আমার ভাল লাগে না।" এটা ক্ষুব্ধ অভিমানের কথা। কিন্তু এ জবাব শুনে তো নির্বিকার হয়ে বসে থাকা যায় না। সুতরাং আমি চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে বারবার বাঁদীদের মাধ্যমে খবর নেবার চেষ্টা করলাম।

সন্ধ্যা নাগাদ খবর পেলাম। শুনলাম নাদিরকুলি নিজাম-উল্-মুল্‌ককে ইরাণী শিবিরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করেছেন। আমাদের শাহের শিবিরের চারদিকেই নাকি ইরাণী ফৌজের পাহারা বসেছে। তার মানে? তার মানে আমরা পরাজিত? বন্দী? হায় আল্লা!

শিবিরে কয় রাত ধরেই সুনিদ্রা হচ্ছিলনা। সে রাতে একেবারেই চোখ বুজতে পারলাম না। মালেকা-ই-জামানী একেবারেই চুপচাপ। কিন্তু অনেক বেগম এবং বাঁদীদের চাপা কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। নসিবে কি আছে একমাত্র খুদাতালাই জানেন।

নসিবে এক অদ্ভুত পরিহাস অপেক্ষা করেছিল আমাদের জন্য। পরদিন দিনের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই আশ্চর্য এক সংবাদ পেলুম। হারেমের খোজা এসে আমাদের জানিয়ে গেল যে আমাদের সেজে গুজে প্রস্তুত থাকতে হবে। শা নাদিরকুলি বাদশার হারেম পরিদর্শন করবেন।

এ হেন অভূতপূর্ব্ব প্রস্তাব শুনে আমাদের মুখে যেন আর কথা থাকলো না। মোগল বাদশা জীবিত থাকতে পরপুরুষে কিনা তার হারেমের জেনানাদের মুখ দেখবে! হেন প্রস্তাব আমাদের শাহেন শাও

মেনে নিলেন। এর পরও মোগল বাদশার বেঁচে থাকবার সার্থকতা কি?

বেগম বাঁদীদের মধ্যে কেউ কেউ এ প্রস্তাবে শুনে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু খোজা জানালো যে, আমাদের শাহই নাকি নাদির কুলির এ প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। বদমেজাজী নাদির কুলির ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে! মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে আমরা যেন ইরাণের শাহের হুকুমের অন্যথা না করি। তোবা! তোবা! জেনানার ইজ্জত রাখতে পারেন না যে বাদশা, আমরা তাঁরই হারেমের বেগম!

অগত্যা সকলকেই তৈরী থাকতে হল। কাপুরুষের বেগম হলে তাদের আবার ইজ্জত, বে-ইজ্জতের কি আছে? কাফের বাঈজী উধম বাঈটা যথেষ্টই চতুর। এরকম একটা কিছুর সম্ভাবনা দেখে কিছুতেই সে যুদ্ধযাত্রায় হারেম শিবিরের অন্যান্য বেগমদের সামিল হয়নি।

ইরাণের শা এলেন বেলা একপ্রহরে মোগল হারেম দেখতে। ওড়নার ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখলুম। সুগঠিত দেহ। আয়ত দুটি চোখ। চোখ দুটি কিছুটা রক্তবর্ণ। আমাদের শাহেনশার মত চোখের কোণে তার কালি পড়ে যায়নি। ঘন কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু। মাথায় বৃহদাকার দীর্ঘ তাজ। সেই তাজে রত্ন মাণিক্য খচিত নানারকম কাজ। অকস্মাৎ প্রথম তাকে দেখলে ভয় লাগে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, নাদিরকুলি অসুন্দর নন। আমাদের শাহ অপেক্ষা ইরাণের শাহের বয়স হয়তো বেশী। কিন্তু তাঁর দিকে তাকালে বয়সের কথা মনে না পড়ে, শৌর্য বীর্য এবং পুরুষত্বের কথাই বেশী মনে পড়ে।

শাহের সঙ্গে ছিল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক খোজা। তার কুঞ্চিত কেশ এবং পুরু ওষ্ঠ। দেখতে আমাদের হাবসী খোজাদের মত নয়। তার নাম অদ্ভুত। আগাবাসী। আমরা সবাই হারেমের মধ্যে ইরাণের

শাহের আগমনের কথা শুনে বোরখাবৃত ছিলাম। শা তার খোজাকে লক্ষ্য করে বললেন : আগাবাসী, মোগল বেগমদের বোরখা উন্মোচন করতে বল।

ভয়ে আমাদের বুক কেঁপে উঠলো। কি আছে ইরাণের শাহের মনে কে জানে।

আগাবাসী শাহের নির্দেশ জোরে জোরে আমাদের শুনিয়ে বলল : শুনুন বেগম সাহেবারা, আমাদের শাহের হুকুম হয়েছে, আপনারা বোরখা পরিত্যাগ করুন।

এ নির্দেশ পেয়েও আমরা কেউ কেউ ইতস্তত করছিলুম। কিন্তু আগাবাসী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল : বেগম সাহেবারা মনে রাখবেন, আমাদের শাহ তাঁর হুকুম অনুযায়ী কাজ হতে বিলম্ব হলে ভয়ানক ক্ষেপে যান। তাঁর মেজাজ যদি একবার বেসামাল হয়ে ওঠে তখন তাকে সামলানো ভয়ানক মুস্কিল। শাহের হুকুমের যেন আপনারা অন্যথা করবেন না।

মোগল হারেমের বেগমদেরও যে অন্য কারো হুকুম তামিল করতে হবে আগে একথা কে ভেবেছিল। চোখ ফেটে যেন জল আসতেঁ চাইল। আমরা বোরখা পরিত্যাগ করলুম। বুঝলুম, শাহ হারেমের সুন্দরী জেনানাদের দেখতে চান। যদি কোন খবসুরত বেগম শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ? তাহলে ? তাহলে কি শাহ তাকে মোগল বাদশার হারেম থেকে নিজের হারেমে নিয়ে যাবেন ? কি লজ্জা ! এর পরেও বাদশা মহম্মদ শা বেঁচে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন ?

শাহের হুকুমে আমরা সবাই বোরখা খুলে দাঁড়ালুম। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তার খোজাকে নিয়ে নাদিরকুলি একে একে আমাদের সকলের মুখাবয়ব বিচার করে দেখতে লাগলেন।

প্রথম দিকে ছিলেন কয়েকজন পুরানো বেগম এবং তাঁদের বাঁদীর দল। নাদির কুলি তাদের খুব বেশীক্ষণ তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাদের পরেই ছিলেন মালেকা-ই-জামানী।

তারপর আমি। মালেকা-ই-জামানী দেখতে খবসুরত আমার বুকটা দুরু দুরু করে উঠলো। নাদির কুলির যদি মালেকা-ই-জামানীকে পছন্দ হয়ে যায়? তাহলে কি মালেকা-ই-জামানী বেইজ্জত হবেন? আবার তৎক্ষণাৎ ভাবলুম, বেইজ্জত কিসের? একটা পুরুষের অভাবে মালেকা-ই-জামানীর যৌবন ব্যর্থ হতে চলেছে। তা যদি সার্থক হয় তো মন্দ কি?

কিন্তু, না। শা বেশ কিছুক্ষণ মালেকা-ই-জামানীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেও কিছু বললেন না। মালেকা-ই-জামানীকে ছেড়ে আমার দিকে এগুলেন। আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম এই কারণে যে, মালেকা-ই-জামানীকে যদি নাদির কুলির মনে না ধরে থাকে তবে আমাকে ধরবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মালেকা-ই-জামানী আমার চাইতে অনেক বেশী খবসুরত।

হলও তাই। আমার পাশে নাদিরকুলি বেশীক্ষণ দাঁড়ালেন না। আমার দক্ষিণ পাশে বেশ কয়েকজন সুন্দরী বাঁদী ছিল। শাহ তাদের মধ্য থেকেও নয়ন তৃপ্তিকর কিছু পেলেন না বোধহয়। তাঁর মুখে একটা হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখলুম যেন। বাইরে থেকে মোগল হারেমের জেনানাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে যা শুনেছিলেন সে রকম কিছু দেখতে পেলেন না বলে মর্মাহত হলেন। সেই হতাশাচ্ছন্ন ভাবেই তিনি এগিয়ে গেলেন জয়পুরিয়া বেগমের কাছে। কিন্তু না, তিনিও নাদির কুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেন না।

জয়পুরিয়ার পাশে তার বাঁদী সিতারাবাঈ দাঁড়িয়েছিল। জেনানা-দের এমন বে-ইজ্জত করবার প্রয়াস দেখে সে বোধহয় ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দেখলাম, ক্রোধে তার ওষ্ঠ দুটি থরথর করে কাঁপছে। আয়ত চোখ দুটি আরো বড় হয়েছে। এভাবে সিতারাবাঈকে দেখতে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। শাহ সিতারা বাঈয়ের কাছে গিয়ে একেবারে থেমে গেলেন। নিস্পলক নেত্রে তার মুখের দিকে বেশ

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তার চোখেমুখে একটা প্রলোভন—সিতারার দিকে দুই পা এগিয়ে গেলেন।

রাজপুত রমণীর অদ্ভুত সাহস বটে! নাদিরকুলি তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে কোমর বন্ধে লুকানো ক্ষুদ্র ছুরিকাটি বের করে রুখে দাঁড়াল। ভাবখানা এই যে, আর এক পদ অগ্রসর হলে সে শাহকে আঘাত করতে কুণ্ঠিত হবে না।

তার এই অবস্থা দেখে শাহ নাদির কুলি প্রচণ্ড শব্দে হা হা করে হেসে উঠলেন। সে অট্টহাসি শুনে আমাদের বুক কেঁপে উঠলো। কিন্তু সিতারাবাঈ আহত ভুজঙ্গিনীর মত ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করতে লাগল। গম্ভীর কণ্ঠে নাদিরকুলি সিতারাকে হুকুম করলেন: 'হাত নামাও।' সিতারার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে একটা অসহায় আলস্য নেমে এল যেন। আপনিই তার উদ্যত হাতটি নেমে এল। শা তাঁর খোজা আগাবাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আগাবাসী, একে আমার শিবিরে নিয়ে এস।

আগাবাসীকে এই হুকুম করে শা তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর ভাবখানা এই যে, যে জিনিষ তিনি খুঁজতে এসেছিলেন তা পেয়েছেন। তাঁর আর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

ধীর পদক্ষেপে শা হারেম-শিবির ত্যাগ করে চলে গেলেন। আমরা সকলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বাঁচলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা বৃশ্চিক দংশন আমাদের মধ্যে রয়ে গেল—একটা বাঁদী কিনা মোগল বাদশার বেগমদের চাইতেও সুন্দরী! ইরাণের শাহ তাকেই পছন্দ করলেন!

জেলহজ্জ উনিশ। হিজরী ১১১৯ সাল। আমরা আবার দিল্লীর লাল কেল্লার দিকে ফিরে চলেছি। নাদির কুলি বিশকোটী টাকা পেলেও দিল্লী না দেখে আর ফিরে যেতে রাজি নন। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে দিল্লী হারেমে আরো অনেক বেশীটাকা মূল্যের জিনিষ রয়েছে। দেশের শাসক যখন এমন কাপুরুষ সমস্ত দেশে কোথাও যখন প্রতিরোধের এতটুকু সম্ভাবনা নেই, তখন কেনই বা তিনি রাজধানীর দিকে অগ্রসর হবেন না।

ওয়াজীর কামরুদ্দিনটা অপদার্থ। যুদ্ধক্ষেত্রে তো তিনি আসেনই নি বরং শোনা যায় নাদির কারনালে এসে পৌঁছেছেন শুনেই তিনি দিল্লী ত্যাগ করে পালিয়ে গেছেন। ইরাণের শাহের বুঝতে বাকী নেই যে, দিল্লীর বাদশা কতকগুলি অপদার্থ আমীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন।

কারনালে বাদশার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য আমীরদের মধ্যে ছিলেন নিজাম-উল্-মুল্‌ক, চিনকুলিচ খাঁ, খান তুরান, আমির খাঁ, মহম্মদ ইশাক এবং আসাদ ইয়ার খাঁ। পরে এসে যোগ দিয়েছিলেন সাদাত খাঁ বুরহান-উল্-মুল্‌ক। কিন্তু এদের অধিকাংশের সঙ্গেই আলাপ করে ইরাণের শা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি মুগ্ধ হয়েছেন শুধুমাত্র মহম্মদ ইশাক খাঁর সঙ্গে আলোচনা করে। ইশাক ফার্সীতে বড় মুসায়ের। চালচলন, কথাবার্ত্তা, সবকিছুতেই তার মধ্যে একটা রুচি আছে। দিল্লীতেও তার কথা বহু শুনেছি। তবে স্বচক্ষে তাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। নাদিরকুলি নাকি আমাদের শাহকে বলেছেন যে, ইশাকের মত এমন লোক থাকতে কামরুদ্দিনকে তিনি ওয়াজীর নিযুক্ত করেছেন কেন? ইরাণের শাহের এ প্রশ্নের আমাদের

বাদশা কি কোন জবাব দিতে পারবেন ? সত্যি কথা বলতে পারবেন কি, যে কামরুদ্দিনের মত তওফাওয়ালী, বাঈজী আর খবসুরত জেনানা আদমী ভেট দিতে পারেনি মহম্মদ ইশাক ? তোবা ! তোবা !

বাদশার ইরাণী আমীরদের মধ্যে সব চাইতে চতুর এবং বদ্‌মাস হল আমির খাঁ। তিনি আশা করেছিলেন যে, ইরাণের শাহ তাকে বেশী পেয়ার দেখাবেন। কিন্তু শাহ নাদিরকুলি তাকে পাত্তাই দেন নি। এ সংবাদ পেয়ে বেশ আনন্দ হচ্ছে আমাদের। কারণ হারেমে একজন বাজারের বাঈজী পাঠিয়ে তিনি মোগল হারেমের শেষ ইজ্জতটুকু নষ্ট করে দিয়েছেন। দারুণ ক্ষমতালোভী আমির খাঁ। শাহ যে তার প্রশংসা করে তাকে মাথায় উঠিয়ে যান নি এটা একটা বড় আনন্দের কথা।

খুব ধীরে ধীরে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন শাহ নাদির কুলি। কারনাল থেকে দিল্লীর দূরত্ব খুবই কম। কিন্তু সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে নাদির কুলির বেশ কয়েকদিন সময় নিলেন। ১লা মহরম আমরা দিল্লীর কাছে এসে উপস্থিত হলুম। নাদির কুলি তৎক্ষণাৎ দিল্লীতে প্রবেশ করলেন না। শহর থেকে ছয় মাইল দূরে শালিমার বাগিচায় শিবির ফেললেন। শালিমার বাগিচা থেকে আমাদের শাহকে তিনি দিল্লী যাবার অনুমতি দিলেন। উদ্দেশ্য, ইরাণের শাহকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তিনি যেন যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন।

বাদশার সঙ্গে আমরা প্রায় সকলেই লালকেল্লায় ফিরে এলুম। শাহ শুধু আসতে দিলেন না তিনজনকে—বুরহান-উল্-মুল্‌ক, নিজাম্-উল্ -মুল্‌ক এবং সিতারা বাঈকে। সিতারা বাঈয়ের নসিব এখন তুঙ্গে। কারনাল থেকে দিল্লী আসবার পথে শাহ নাদিরকুলি মোল্লা ডেকে তাকে সাদী করেছেন। আমাদের পাদিশা পর্যন্ত তাকে ভেট পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। মোগল বাদশার মুখে চুনকালি পড়তে আর কিছু বাকি নেই। তাঁর বাঁদী এখন তাঁর মালেকান। তাকেই তিনি সালামত্‌ জানাতে বাধ্য হয়েছেন।

কোন্ লজ্জায় যে বাদশা আবার লালকেল্লায় ঢুকলেন আল্লাতালাই জানেন। কে না জানে যে, কাপুরুষের মত পরাজিত হয়েছেন বাদশা। যুদ্ধ না করেই নাদির কুলির পায় গিয়ে গড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর হারেমের জেনানারা বে-ইজ্জত হয়েছেন পরপুরুষের কাছে বোরখা খুলে। তবু নহবৎখানায় বাদশার জন্য শানাই বাজল। ঝরোকার ধারে দাঁড়িয়ে প্রজাবর্গ তবু বলল—'বাদশা সালামত্'! তাজ্জব ব্যাপার! যে-কোন মানুষের মনুষ্যত্ব থাকলে এর চাইতে সে বরং আত্মহত্যা করতো।

হারেমে ঢুকে উধম বাঈটাকে দেখা গেল না। মাটীর নিচের কোন্ কোঠায় সে লুকিয়ে আছে কে জানে। নাদির এ-দেশ ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে বেটী নিশ্চয়ই দিনের আলোতে আর বের হবে না। ইরাণের শাহ যদি বাজারের ঐ তওফাওয়ালীটাকে ধরে প্রকাশ্যে দেওয়ানী-আমে চাবুক কষ্‌ত? এই ভাবেই হিন্দুস্থানের কাপুরুষ বাদশাটাকে শায়েস্তা করা দরকার।

১লা মহরমই রাত্রিবেলা বাদশা এসে লালকেল্লায় পৌঁছেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। পরদিন সকালবেলা থেকে সপ্তাহ খানিক ভরে লালকেল্লা ঝাড়পোঁছ চলল। লালকেল্লার তবু ভাগ্যি, এতদিনে তার দেহে একটু পরিচর্যার হাত পড়ল। ইরাণের শাহ আসবেন কেল্লার ভেতর। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। ঝেড়েপুঁছে সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে উপায় আছে?

শা নাদির কুলি ১১ই মহরম তারিখে দিল্লী ঢুকলেন। ইতি-মধ্যেই দিল্লীর বহু সম্ভ্রান্ত নাগরিক ভয়ে ভয়ে দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অধিকাংশই আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন যমুনা অতিক্রম করে ওপারে মথুরার দিকে। জাঠরা এখন বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। সকলে ভেবেছিল, জাঠদের আশ্রয়ে নিরাপদ হওয়া যাবে। কিন্তু কাপুরুষের নসিবে চিরকাল লাঞ্ছনা লেখা থাকে। জাঠরা কাউকে আশ্রয় দেয়নি। পলাতক দিল্লীর নাগরিকদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে

তাদের হাটিয়ে দিয়েছে। দিল্লী ত্যাগী কিছু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মারাঠা দস্যুরাও লুণ্ঠন করেছে। অবশেষে নাদির কুলি দিল্লীতে ঢুকবার দিন তারাও সকলে দিল্লী ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য শূন্য হাতে। এবং সে জন্যে শেষ পর্যন্ত তাদের যে খেসারৎ দিতে হয়েছে মানুষ বোধহয় তা কোনদিন ভুলবে না।

১১ই মহরম নাদিরকুলি দিল্লী ঢুকলেন। পরদিন ইতুজ্জোহা। ইরাণীদের এটা আবার নৌরোজ উৎসবের দিন। ইরাণের শাহ হুকুম করেছেন, দিল্লীর প্রত্যেকটা মসজিদে এ দিন শাহের নামে খুত্‌বা পাঠ করতে হবে। হিন্দুস্থানের বাদশা জীবিত থাকতেই কিনা দিল্লীতে বিদেশী একজন শাসকের নামে খুত্‌বা পাঠ হবে? এর চাইতে বেশী অপমান আর কি থাকতে পারে? এখন একথা বিশ্বাস করতেও হাসি পায় যে, একদিন এদেশের হিন্দু প্রজারা কোন এক মোগল বাদশাকে লক্ষ্য করেই বলেছিল—দিল্লীশ্বরোবা! জগদীশ্বরোবা!

পবিত্র ইতুজ্জোহার দিন সকালবেলা দিল্লীর সর্বত্র মসজিদে মসজিদে মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজানের ধ্বনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইরাণের শাহের নামে খুত্‌বা পাঠ হয়ে গেল। দিল্লীর দেওয়ানী আমে, নসমন-জিল্‌ -ইলাহীতে বসলেন হিন্দুস্থানের বাদশা নয়, ইরাণের নাদিরকুলি। বাদশা গুলাল বারিতে আর দশজন আমীরের সঙ্গে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নাদির কুলির নামে খুত্‌বা পাঠকে সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। তোবা! তোবা! এ মোগল হারেমে আর ফিরে না এলেই হোত।

তবু আমাদের বাদশার অসীম ভাগ্য বলতে হবে যে, নাদির কুলি তাকে চূড়ান্ত অপমান করেননি। খুত্‌বা পাঠ হয়ে গেলে ঝরোকায় উঠিয়ে তাঁকে নিজের বামপার্শ্বে বসবার সম্মান দিয়েছেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি এত সম্মান কে আর কবে দেখিয়েছেন? চিঙ্গিস খাঁ যেখানেই গিয়েছেন সে দেশকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তৈমুর লঙ্‌ সুলতান মামুদশাকে একেবারেই পাত্তা দেননি। নাদির

কুলি যদি বাদশাকে গুলাল বারিতে দাঁড় করিয়ে রাখতেন তাতেই বা কি বলবার থাকতো।

তবে বাদশাকে ঝরোকায় বসালেও নাদিরকুলি তাঁকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা শুনে বাদশার চক্ষু বোধহয় স্থির হয়ে গেছে। শুনছি নাদিরকুলি নাকি বলেছেন যে, দিল্লী হারেমের সকল মণি-মাণিক্য তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। এর উপর নগদ দিতে হবে বিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা। এতেও হবে না। শাহের বাহিনী ইচ্ছামত দিল্লীর অভিজাত আমীরদের গৃহ তল্লাসী করে ঐশ্বর্য সংগ্রহ করবে।

বাদশা এ প্রস্তাবের কি উত্তর দিয়েছেন জানিনা। কিন্তু সমস্ত দিল্লী শহরের উপর একটা সন্ত্রাসের ছায়া নেমে এসেছে। হারেমে বেগমরা ভয়ানক চঞ্চল বোধ করছেন। যে যেখানে পারছেন গোপন কুঠুরিতে তার মণিমুক্তা, হীরা জহরৎ, অলংকার, সব লুকিয়ে ফেলছেন। আমি আর মালেকা-ই-জামানীও আমাদের সম্পদ লুকিয়ে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। দিল্লীর মানুষের অবস্থা এতক্ষণ কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। বাদশা কি নাদির কুলির এ প্রস্তাবে রাজি হবেন?

নাদির কুলি রাত্রিবেলায় লালকেল্লায় থাকতে রাজি হননি। বাদশাকে প্রস্তাব দিয়ে তিনি চলে গেছেন শালিমার বাগিচায়। প্রত্যহ দিনের বেলায় এসে তিনি দেওয়ানী আমে দরবার করবেন।

রাত্রিবেলায় কি এক শঙ্কায় যেন মোগল হারেমেও ভালো করে আলো জ্বলেনি। খাসমহল, রংমহল, মমতাজ মহল, সবই অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। এমন কি, দেওয়ানী খাসে পর্যন্ত ঝাড় লণ্ঠনে আলো পড়েনি। ক্ষীণ কয়েকটি মোমের আলোতে বাদশা নাকি সেখানে তার অন্যান্য আমীরদের নিয়ে নাদির কুলির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছেন। সকলেই উৎকণ্ঠ আবেগে অপেক্ষা করছে বাদশা কি সিদ্ধান্ত নেন তাই জানবার জন্য। কিন্তু তিনি আর কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? তাঁর সিদ্ধান্তের এখন আর মূল্যই বা আছে কি? হায় আল্লা! জানিনা নসিবে আর কত লাঞ্ছনা লিখে রেখেছে।

১৩ই মহরম। ভোরবেলাতেই দিল্লীতে খুব একটা অস্থির চাঞ্চল্য অনুভব করলুম। বেলা না ফুটে উঠতেই খবর পেলুম, নাদির কুলি আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। এ হেন সংবাদ আমরা কেউ আশাও করিনি। সংবাদ শুনে সমস্ত হারেম যেন একসঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। কে যেন মতি মসজিদে আমাদের বাদশার নামে খুত্‌বা পাঠ করে উঠলো। আল্লা মেহেরবান!

কিন্তু কে একথা জানতো যে এটাও নসিবের একটা প্রহসন মাত্র। এ-সংবাদ পেয়ে গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা ভোরবেলাতেই নানাস্থানে ইরাণী বাহিনীর উপর হানা দিয়েছিল। দিল্লীতে হঠাৎ এরকম একটা ঘটনা শাহের সেনাপতিরা কেউ বুঝি কল্পনাই করতে পারেনি। হক-চকিয়ে গিয়ে প্রথমটা ইরাণী বাহিনী বেশ কিছু মার খেয়েছে। শাহের বেশ কিছু ফৌজ নাকি গুণ্ডাদের হাতে প্রাণও হারিয়েছে। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। দিল্লীর চোখের আলো নিভে যাবার উপক্রম হয়েছে। বেলা একপ্রহর না পেরুতেই লালকেল্লায় খবর এসেছে যে, শাহ নাদির কুলি বহাল তবিয়তে আছেন। তিনি মরেন নি।

তাহলে? তাহলে আর কি। কাণ্ডজ্ঞানহীন কাপুরুষদের ভাগ্যে যা ঘটে, তাই ঘটবে। যারা বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না, তাঁর মৃত্যু হলে তবে তারা প্রতিশোধ নেবে? তবেই হয়েছে।

শাহের হুকুম এসে পৌঁছুতে বিলম্ব হল না। দিল্লীর নাগরিকদের এই কাপুরুষোচিত ব্যবহারে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে শা হুকুম করেছেন যে, যারা শাহী ফৌজের রক্তপাত ঘটিয়েছে, সেই দুষ্কৃতকারীদের একজনও যেন নিষ্কৃতি না পায়। হুকুম পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইরাণী ফৌজ দিল্লীর নাগরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করবার কোন চেষ্টাই করেনি ইরাণী ফৌজ। একের পর এক দিল্লীর নাগরিকদের ঘরবাড়ি আক্রমণ করে চলেছে তারা। বেলা একপ্রহর অতিক্রম করতে না করতেই দিল্লীর আকাশ

ধুঁয়ার কুণ্ডলিতে ভরে গেছে দেখতে পাচ্ছি। চতুর্দিক থেকে আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে। কোথাও বা অগ্নির লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে। সন্ত্রস্ত কৌতূহলে হারেমের সমস্ত খোজা আর বাঁদীরা কেল্লার ধারে ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে সমস্ত হারেম যেন থমথম করছে।

বাদশার মুখে কথা নেই। বাছাই বাছাই আমীরেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে লালকেল্লায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের নিয়ে দেওয়ানী খাসে বসে ম্লান মুখে বাদশা বসে আছেন।

আমাদের রহিমা বাঁদী একবার শাবুরুজের ধারে, আর একবার আমাদের কাছে মমতাজ মহলে ছুটাছুটি করছিল। দ্বিপ্রহরের দিকে সে এসে মালেকা-ই-জামানীকে বলল: হজরত সাহেবা একবার দেখবেন বাইরে আসুন।

বাইরে যে কি ঘটনা ঘটছে স্বচক্ষে না দেখলেও হারেমের ভিতর বসেই আমরা বুঝতে পারছিলাম। আর্তচিৎকারে দিল্লীর আকাশ বাতাস ছেয়ে গেছে। অগ্নিশিখার প্রকোপে দিল্লীর আবহাওয়া গ্রীষ্মকালের আবহাওয়ার মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যেন দোজখের অগ্নি সমস্ত দিল্লী শহরটাকে ঘিরে ধরেছে।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: দেখবার কি আছে। সবই তো বুঝতে পারছি।

রহিমা বলল: তবু একবার দেখে যান হজরত সাহেবা। চোখে না দেখলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। লাহোর দরওয়াজা আর দিল্লী দরজায় মৃতের স্তূপ জমে উঠেছে। অনেকেই কেল্লার ভিতর আশ্রয় নেবার জন্য এদিকে ছুটে আসছিল। ইরাণী ফৌজেরা দরওয়াজার কাছেই তাদের হত্যা করেছে। অনেকে যমুনা সাঁতরে ওপার যাবার চেষ্টা করেছিল। তাদেরও কেউ রেহাই পায়নি। যমুনার তটে কয়েক হাজার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এমন নৃশংস কাণ্ড ইতিপূর্বে বোধহয় কখনো ঘটেনি বেগম সাহেবা।

মালেকা-ই-জামানী গম্ভীরভাবে বললেন : কাপুরুষদের এমন শাস্তিই হয়। তোমাদের শাহেন শা কি করছেন ?

রহিমা বলল : শাহেন শা তাঁর আমীরদের নিয়ে চুপ করে দেওয়ানী খাসে বসে আছেন।

এমন ভয়ানক বিপর্যয়ের যুগেও মালেকা-ই-জামানী যেন একটু বিদ্রূপ করে উঠলেন : দেওয়ানী খাসে এখন তওফাওয়ালীরা নাচবে না ? রহিমা বলল : কি যে বলেন হজরত সাহেবা! এখন কি আহ্লাদ করবার সময় ? সত্যি বেগম সাহেবা এ দৃশ্য আর সহ্য করা যাচ্ছে না। মালেকা-ই-জামানী বললেন : তা আমার কাছে কি ? দিল্লীর লোকেরা শাহেন শাকে ধরুক না কেন। তিনিই তো হিন্দুস্থানের শাসক ?

রহিমা বলল : না বেগম সাহেবা এমনই বলছিলাম।

ধমকে উঠলেন মালেকা-ই-জামানী রহিমাকে : যা করছিলি তাই করগে। আমাকে এখন বিরক্ত করবি না। যা।

বেচারী রহিমা ম্লান মুখে বোধহয় সেই নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখবার জন্যেই আবার বেরিয়ে গেল।

আমি যেন সমস্ত চিন্তাশক্তিই হারিয়ে ফেলেছিলাম। একটা স্থবির পুতুলের মত নির্বাক বসে রইলাম।

বেলা দ্বিপ্রহরের শেষের দিকে ভয়ানক দুঃসংবাদ পেলাম। এই দুই প্রহরের মধ্যেই প্রায় ত্রিশ হাজার নাগরিক ইরাণী ফৌজের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। লালকেল্লার চতুর্দিকেই নাকি মৃতদেহের স্তূপ জমে গেছে। এ সংবাদ শুনে অপরাহ্নের মধ্যেই হারেমে কান্নার রোল উঠল। রহিমা বাঁদী আমাদের মমতাজ মহলের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে হতাশ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল : বেগম সাহেবা দিল্লীতে আর কোন মানুষ বাঁচবে না। লোকেরা বলাবলি করছে যে আমীর তৈমুরের আক্রমণের সময়ও দিল্লীতে নাকি জাহানপন্নার কাছে কয়েকজন মোল্লা বেঁচে ছিল। এবার আর তাও বাঁচবে না।

এ সংবাদ শুনে অসহায় ভাবে আমি মালেকা-ই-জামানীর মুখের দিকে তাকালাম। মালেকা-ই-জামানী মুখে যে ভাবই করুন না কেন, অন্তরে যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিলেন। তিনি বললেনঃ বাদশা কি করছেন?

কান্নায় ভেঙে পড়ে রহিমা বললঃ কি জানি বেগম সাহেবা। বাদশার দিকে কেউ আর ফিরে তাকাচ্ছে না।

—বাদশা বোধহয় দেওয়ানী খাসেই আছেন। যা, তাকে আমার সালাম জানা। বল্ যে, তিনি যদি দয়া করে মমতাজ মহলে বেগম মালেকা-ই-জামানীর সঙ্গে মোলাকাৎ করেন তো ভাল হয়।

উঠে দাঁড়িয়ে রহিমা বললঃ হ্যাঁ বেগম সাহেবা! এ রক্তপাত বন্ধ করতেই হবে।

—হ্যাঁ, হবে। তুই দেওয়ানী খাসে বাদশাকে আমার সালামত্ জানা। একটা জিনপরী তাড়া করলে লোকে যেরকম চলে, ঠিক তেমনি ভাবে দ্রুত রহিমা বাঁদী মমতাজ মহল ত্যাগ করে বাইরে চলে গেল।

খবর পেয়েই বাদশা এলেন। তিনি তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বহু দিন পরে বাদশাকে দেখলাম। সেই সুগঠিত সুন্দর দেহ বাদশার আর নেই। স্বাস্থ্য বিশীর্ণ হয়েছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। কেমন যেন বিভ্রান্ত ভাব।

মালেকা-ই-জামানী অনেকক্ষণ বাদশার দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেনঃ শাহেন শা, নাদির কুলির অত্যাচার কি বন্ধ হয়েছে?

সরমে আনত বাদশা বললেনঃ না মালেকা-ই-জামানী।

—আপনারা কি করছেন?

—কি করব ভেবে পাচ্ছিনা।

—কিন্তু দিল্লীর লোকদেরও তো এভাবে ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না।

—কিন্তু উপায় কি?

—শাহ নাদির কুলিকে শান্ত করুন।

—কি ভাবে করব ? তিনি ভয়ানক বদ্‌মেজাজী।

—আপনারা কি ভেবে কোন কিছুই স্থির করতে পারেন নি ?

—না।

—তাহলে শুনুন……

অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রেখা দেখতে পেলেন যেন বাদশা। জ্বল জ্বল চোখে মালেকা-ই-জামানীর দিকে তাকালেন তিনি।

মালেকা-ই-জামানী বললেন : এই মুহূর্তে শাহের ক্রোধ থেকে একমাত্র একজনই দিল্লীকে বাঁচাতে পারে।

—কে সে ?

—শাহ নাদির কুলি যাকে সর্বাপেক্ষা বেশী পেয়ার করেন।

—কে সে ? শাহের খোজা আগাবাসী। শুনেছি এই খোজা নাদির কুলির খুবই প্রিয় পাত্র।

—না, জাঁহাপনা।

—তবে ? তবে কি আহমদ আবদালী ? শুনেছি, আহমদ আবদালী এখন শাহের দক্ষিণ হস্ত।

—না শাহেন শা।

—তবে।

মালেকা-ই-জামানী ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন : শাহেন শা, এতবড় একটা রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েও আপনারা কিছুই বিচার করেন না দেখে খুবই দুঃখিত হলাম। মোগল হারেমেরই এক বাঁদী—সিতারা বাঈ এখন ইরাণের শাহের সর্বাপেক্ষা পেয়ায়ের ব্যক্তি।

সিতারা বাঈয়ের কথা শুনে বাদশা লজ্জায় মাথা নিচু করে নিলেন। দুদিন আগে এই নির্দোষ বালিকাটিকে কি ভাবে তিনি প্রতারিত করেছেন সে কথা বোধহয় তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি কোন জবাব দিতে পারলেন না।

মালেকা-ই-জামানী বললেন : যে বাঁদীর প্রতি আপনি একদিন দুর্ব্যবহার করেছেন সেই বাঁদীই আজ এই বিপর্যয়ের হাত থেকে আমাদের

রক্ষা করতে পারে। দ্রুত সিতারা বাঈয়ের কাছে আবেদন প্রেরণ করুন। সম্ভবত দিল্লীর নাগরিকদের এ নির্যাতনে সে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবেনা।

বাদশা চুপ করে থাকলেন, কোন কথা বললেন না। মালেকা-ই-জামানী বললেন: শাহেন শা নিশ্চয়ই এখনো বিচার বুদ্ধির সবটুকুই হারান নি। আমার পরামর্শের যথার্থতা বিচার করে দেখবেন। দেওয়ানী খাসে অপেক্ষমান আমীরদের সঙ্গেও এ নিয়ে পরামর্শ করতে পারেন। কিন্তু অপেক্ষা করবার মত আর সময় নেই এটা জানবেন।

বাদশা মাথা নিচু করে মমতাজ মহল থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যার কিছু আগে লালকেল্লাতে আমরা স্বস্তির সংবাদ পেলাম। শাহ নাদির কুলি ইরাণী ফৌজদের হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন। মোগল বাদশা মহম্মদ শার কাতর অনুরোধেই তিনি এ হুকুম করেছেন বলে জানা গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে যে, এ হত্যাকাণ্ড বন্ধ হল তা জানলুম আমি আর মালেকা-ই-জামানী। গোপনে সংবাদ নিয়ে মালেকা-ই-জামানী জানতে পারলেন যে, মমতাজ মহল থেকে বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ মহম্মদ শা সিতারা বাঈকে কাতর অনুরোধ জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন। পত্র প্রেরণ করবার দুই ঘণ্টার মধ্যেই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবার জন্য হুকুম এসেছে। আল্লা মেহেরবান! দিল্লীর অবশিষ্ট লোক বাঁচলো। এ জন্য শাহের ক্রোধ যিনি প্রশমিত করেছেন তিনিও নিশ্চয়ই খুদাতালার আশীর্বাদ লাভ করবেন। সিতারা বাঈয়ের জীবন সুখের হোক।

দিল্লীর নাগরিকেরা প্রাণে বাঁচলেন, কিন্তু একেবারে ফকির হয়ে গেলেন। লালকেল্লা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। মোগল বাদশাদের গৌরব করবার আর কিছু থাকলো না। দুর্বল পুরুষত্বহীন যে মানুষ, তার প্রাণ বাঁচলেও ইজ্জত বাঁচে না।

নাদিরকুলি হুকুম করলেন যে, প্রাণের বিনিময়ে দিল্লীবাসীকে

তাদের সর্বস্ব দিতে হবে। আগে তিনি শুধুমাত্র অভিজাত আমীরদের ধন-সম্পদ দাবি করেছিলেন। এখন নির্বিশেষে দিল্লীর সকল নাগরিক-দেরই লুণ্ঠনের হুকুম দিলেন। ইরাণের শাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে স্বয়ং তিনি নিজের তদারকিতে লালকেল্লা থেকে ঐশ্বর্য সংগ্রহ করবেন। তাঁর হুকুম, কেউ যেন কোথাও ধন-সম্পদ লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা না করেন।

আমাদের শাহেনশার খোজারা হারেমের প্রতি প্রকোষ্ঠ ঘুরে ঘুরে ইরাণের শাহের এই সিদ্ধান্তের কথা আমাদের জানিয়ে গেল। কিন্তু মোগল বাদশার হারেমে এই যে এত বেগম বাঁদীর ভিড় সে কি শাহেন-শার রূপ দেখে নাকি? সকলেই এখানে এসেছে মোগল হারেমের ঐশ্বর্য লুটে নেবার জন্যে। সে ঐশ্বর্য কেউ সহজে ছেড়ে দেবে নাকি? খোজাদের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যে যার ধন-সম্পদ মহলের গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে ফেলল। লালকেল্লার হারেমে এত সব গোপন রন্ধ্র আছে যে, সেখানে কিছু লুকিয়ে রাখলে স্বয়ং শয়তানেরও খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। মালেকা-ই-জামানী আর আমি মূল্যবান অলংকার—মণিমুক্তা হীরা জহরৎগুলি গোপন স্থানে লুকিয়ে ফেলে সামান্য কিছু বাইরে রেখে দিলাম। নাদির কুলি যদি হারেমে ঢুকে একেবারেই কিছু না পান তাহলে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন।

বিশে মহরম। নাদির কুলি লালকেল্লায় ঢুকে দেওয়ানী আমের বলদাচিনোতে বসে হারেমের সকল বান্দা, বাঁদী, খোজা এবং নাজিরকে হুকুম করলেন যে, প্রতি মহলে মহলে যেন ধন-রত্ন সব সংগ্রহ করে রাখা হয়। শা স্বয়ং বা তাঁর বান্দারা এ ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে নেবেন।

ইরাণী বাহিনী লালকেল্লায় ঢুকতেই আমাদের কারো মুখে আর কথা থাকলো না। মনে হতে লাগলো যেন মাথার উপর আসমানটা এখনি ভেঙে পড়বে কিংবা রোজ কেয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মহলের কোথাও কোথাও অস্ফুট ক্রন্দনের ধ্বনি পর্যন্ত শোনা গেল।

দেওয়ানী আমের ঝরোকাতে বেশীক্ষণ দরবার বসালেন না নাদির

কুলি। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের বাদশাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ঢুকলেন হারেমের অভ্যন্তরে। পাত্রমিত্র সবাইকে নিয়ে এসে তিনি দেওয়ানী খাসে দরবার বসালেন। দরবার বসালেন মানে—বসে বসে নিজের চোখের উপর মোগল হারেম-লুণ্ঠন তদারক করতে লাগলেন।

হারেমের জেনানা মহলে ধন-রত্ন সংগ্রহের জন্য এল শাহের খোজা আফ্রিকান ক্রীতদাস আগাবাসী। বেগমেরা ঐশ্বর্য লুকিয়ে ফেললেও কিছু কিছু সকলেই রেখে দিয়েছিল। সেই সব ধনরত্ন নির্দ্বিধায় সকলে আগাবাসীর হাতে তুলে দিতে লাগলো। বিনা প্রতিবাদে এই ভাবে এসব তার হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া যে গত্যন্তর নেই এটা সকলেই জানে।

তবে ইরাণের শাহের এ খোজাটিকে যথেষ্ট ভদ্র এবং রুচিবান বলে আমার মনে হল। কোথাও কাউকে বে-ইজ্জত করবার এতটুকু ইচ্ছা সে প্রকাশ করলো না। যদি তা করতো তাহলে আমাদের কারই বা কি করবার ছিল! কোন বান্দা বা বাঁদীকে একটা চাবুক পর্যন্ত কষালো না আগাবাসী। ইমতিয়াজ মহল, খোয়াব ঘর, মমতাজ-মহল, প্রভৃতি স্থান থেকে বেগমদের ধনরত্ন সংগ্রহ করে আগাবাসী দ্বিপ্রহরের দিকে দেওয়ানী খাসে শাহ্ নাদির কুলির কাছে ফিরে গেল।

আমরা ভয় করছিলাম যে, এত সামান্য ধনরত্ন দেখে নাদির সন্তুষ্ট হবেন না। তিনি হারেমের মেঝে খুঁড়ে গোপনে সঞ্চিত ধনরত্ন বের করবার হুকুম দেবেন। কিন্তু, না, তিনি তা করলেন না। তা না করবার কারণ হল এই যে, শাহের দৃষ্টি ছিল তখন অন্যত্র। তিনি লক্ষ্য করে দেখেছিলেন যে, দিল্লীর প্রতিটি হারেমের প্রতিটি গৃহে মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। বাদশা শাজাহান দেওয়ানী আম থেকে আরম্ভ করে দিল্লী হারেমের প্রতিটি স্থাপত্যকে মণি-মুক্তা দিয়ে গেঁথে দিয়ে-ছিলেন। স্থাপত্যের সঙ্গে জড়িত সেই সব মণি-মুক্তার যা মূল্য হবে হিন্দুস্থানের বাদশা ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে তা কল্পনা করাই অসম্ভব। তিনি স্থির করেছিলেন যে, হারেমের হর্ম্যরাজী থেকে এই সব মণি-

মুক্তা খুলে নেবেন। আগাবাসী ফিরে যেতেই তিনি তার পার্শ্বচর আহমদ খাঁ আবদালী এবং আগাবাসীকে এই সব হর্ম্যরাজী থেকে মণি-মুক্তাগুলি নেবার জন্য হুকুম করলেন।

সত্যি এর চাইতে আমাদের গোপনে সঞ্চিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করাও বুঝি সহস্রগুণে শ্রেয় ছিল। বিশে মহরম থেকে ২৬শে শফর পর্যন্ত শা নাদির কুলি নিজে দেওয়ানী খাসে বসে থেকে হারেমের হর্ম্যরাজী থেকে মণিমুক্তা খুলে নেওয়া তদারক করলেন। শাহের এই সিদ্ধান্তের কথা শোনা থেকেই আমাদের আর কোন স্বস্তি থাকলো না। হারেমের ইমারতগুলির গায় হাত পড়তেই আমাদের যেন মনে হল হাতুড়ি বাটালি দিয়ে আমাদের দেহেই কে আঘাত করছে। কয়েকদিন যাবৎ অবিশ্রান্ত দিল্লী হারেমের মধ্যে শুধু ঠুক্‌ঠাক্‌ শব্দ শোনা যেতে লাগলো। এক একটা শব্দ যেন এক একটা আঘাত হয়ে আমাদেরই বুকে এসে পড়তে লাগলো। মনে হল, চিৎকার করে মমতাজ মহল থেকে আমিই বলি—আস্তে, ও ভাই সাহেবরা আস্তে।

তেরই শফরের মধ্যে হারেমের বিভিন্ন মহলের মণিমুক্তা খুলে নিয়ে নাদিরকুলি হাত দিলেন দেওয়ানী খাসে। সমস্ত হারেমের হর্ম্যরাজীতে যে মণিমুক্তা আছে এক দেওয়ানী খাসেই আছে তার প্রায় দ্বিগুণ। বাদশা শাজাহান তাঁর মনের সমস্ত খুশী উজাড় করে দিয়ে দেওয়ানী খাসকে সাজিয়ে ছিলেন। দেওয়ানী খাস নিয়ে তার অহংকারের শেষ ছিল না। তাইতো তিনি এর দেওয়ালে লিখে দিয়েছিলেন :

অগর ফির দৌস্‌ বর রু-ঈ জমীন অস্ত্‌
হমিন অস্ত্‌, উ হমিন অস্ত্‌, উ হমিন অস্ত্‌।

অর্থাৎ দুনিয়াতে যদি কোথাও বেহেস্ত থেকে থাকে, তবে তা এইখানে। লালকেল্লার গৌরব তো দেওয়ানী খাস। সেই দেওয়ানী খাসে হাত পড়লে আর আমাদের রইল কি? শা নাদিরকুলি যেদিন দেওয়ানী খাসে হাত দিলেন সেদিন বোধহয় আমাদের কারো চোখ

শুল্ক ছিল না। প্রায় তের দিন ধরে নাদির কুলি দেওয়ানী খাসের মনিমুক্তা খুলে নিলেন। এই তের দিনই যেন একএকটা হাতুড়ির ঘায় আমাদের বুক ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। অবশেষে শেষ দিন দেওয়ানী খাস থেকে ময়ূর সিংহাসনটা পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেলেন তিনি। সে দিন বান্দা, বাঁদী, বেগম, কেউ আর না কেঁদে পারেনি বোধহয়।

এত কিছু নিয়েও নাদিরকুলি তৃপ্ত হন নি। দিল্লী ছেড়ে যাবার দিন তিনি হুকুম করলেন, কোহিনূর মণি কোথায় সে মণি তাঁর চাই। সে মণি না পেলে আর একবার দিল্লী লুণ্ঠন করবেন তিনি। কোহিনূরের খবর বাদশা মহম্মদ শা ছাড়া আর কেউ জানেন না। যে কোহিনূর তিনি ইরাণের শাহকে দেননি শুনে তাজ্জব বনে গেলাম আমরা। যে বাদশা হারেমের মর্যাদা পর-পুরুষের দৃষ্টির কাছে ছেড়ে দিতে পারেন, তিনি নাদির কুলির ক্রোধের কাছ থেকে মহামূল্যবান হলেও একটা মণি বা মুক্তা লুকিয়ে রাখতে সাহস করবেন ?

তাহলে কি সে মণি আগেই তিনি খুইয়ে বসেছেন না পেয়ারের বাঈজী সেই উধম বাঈটাকে দিয়ে দিয়েছেন ? সে বাঈজীটার তো হারেমের মধ্যে কোন খোঁজই নেই। নাদির দিল্লী আসছে শুনেই সে কোথায় পালিয়েছে। আমাদের বাদশা নাকি ইরাণের শাকে খুদাতালার নামে শপথ করে বলেছেন যে, কোহিনূর এখন আর তাঁর কাছে নেই। কিন্তু বাদশার সে কথায় বিশ্বাস না করে নাদিরকুলি নাকি ঝরোকায় বসে আছেন। সে কোহিনূর না নিয়ে তিনি হিন্দুস্থান ত্যাগ করবেন না।

আমরা গভীর উৎকণ্ঠায় হারেমে অপেক্ষা করছি কি হয় তাই জানবার জন্য। কোহিনূর না পাওয়া গেলে নাদির কুলি যদি আবার দিল্লীর অধিবাসীদের হত্যা করবার হুকুম করেন ? একটা উৎকণ্ঠ অপেক্ষায় আমাদের সকলেরই বুক টিপ্ টিপ্

করছে। এমন সময় অকস্মাৎ লাহোর দরওয়াজাতে বোধহয় প্রচণ্ড কয়েকটি তোপ দাগবার শব্দ হল। তাহলে? তাহলে কি হারেমকে গুঁড়িয়ে ফেলবার জন্য হুকুম করেছেন নাদিরকুলি? হারেমের মধ্যে একটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। কি হল তাই জানবার জন্য আমরা ছটফট করতে লাগলাম।

ঘটনার গতি লক্ষ্য করবার জন্য রহিমা বাঁদীকে ঝরোকার ধারে পাঠিয়েছিলাম। শব্দ হবার কিছু পরেই রহিমা বাঁদী এসে আমাদের মমতাজ মহলে ঢুকলো। সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কোহিনূর কি পাওয়া গেছে রহিমা?

রহিমা বলল: না বেগম সাহেবা।

—তাহলে? তাহলে কি শাহ নাদিরকুলি লালকেল্লা গুঁড়িয়ে ফেলবেন?

—না বেগম সাহেবা: তিনি চলে যাচ্ছেন।

—চলে যাচ্ছেন!

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা।

—তাহলে এ শব্দ কিসের?

—শাহ হিন্দুস্থান ছেড়ে যাচ্ছেন বলে তার উদ্দেশ্যে তোপধ্বনি করা হোল। লাহোর দরওয়াজা দিয়ে তিনি লালকেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। বললুম: কোহিনূর ছাড়াই তিনি চলে গেলেন?

রহিমা বলল: তাইতো দেখলুম বেগম সাহেবা।

আমাদের বাদশা মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখে নসমন-জিল্-ইলাহীর উপর গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদছেন।

—কাঁদছেন?

—জী বেগম সাহেবা।

—কেন?

—শাহ নাদির কুলি লালকেল্লা ছেড়ে যাবার আগে বাদশার উষ্ণীষের সঙ্গে নিজের উষ্ণীষ বিনিময় করেছেন। সেই উষ্ণীষ বিনিময় করবার সঙ্গে সঙ্গেই বাদশার মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। নাদির কুলি চলে গেলে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

এতক্ষণে সব বুঝলুম। হায়রে কাপুরুষ! শাসক হয়ে যা শক্তি দ্বারা রক্ষা করা যায় না—তা কি বুদ্ধি দ্বারা রক্ষা করা যায়? কোহিনূর লুকিয়ে রেখেছিলে তুমি-উষ্ণীষের ভিতর! ইরাণের শা উষ্ণীষ বিনিময় করে সেই কোহিনূরই নিয়ে গেছেন। হায় আল্লা! মোগল বাদশার আর কিছুই রইলো না।

॥ ৬ ॥

মাস রবিয়ল আউয়ল। হিজরী ১১১৭ সাল। নাদির কুলি হিন্দুস্থান ছেড়ে চলে গেছেন। এত যে ধকল গেল, ইজ্জত গেল, তবু যদি মোগল আমীরদের শিক্ষা হয়। বাদশার কথা বলে আর লাভ কি। যেদিন তিনি চরিত্র হারিয়েছেন সেদিনই তাঁর সব গেছে। ইজ্জত বেইজ্জতের আর ধার ধারেন না তিনি। নইলে এমন বেইজ্জতির পর দেওয়ানী আমের ঝরোকা ছেড়ে কবে তিনি ফকিরের বেশ নিয়ে পথে নেমে যেতেন। বাদশার কথা বাদ। আমীরেরা করছেন কি? এত দিনে দেখা যাচ্ছে মোগল আমীরদের ভাগদ ফুটে বেরিয়েছে। লালকেল্লার দেওয়ানী আমে ঢুকলেই যত তাদের হম্বিতম্বি ফুটে।

আমীরেরা আবার বিবাদ আরম্ভ করেছেন নিজেদের মধ্যে। ইরাণীরা বলছেন—ইরাণের শাকে তারাই তাড়িয়েছেন—তুরাণীরা বলছে তারা। হায় খুদাতালা! মানুষের যদি সরম বলতে এতটুকু কিছু থাকে! ইরাণের শা নিজের ইচ্ছায় এদেশ ছেড়ে না গেলে তাকে তাড়াবার হিম্মত ছিল কারো?

ইরাণীদের নেতা আমির খাঁ উঠে পড়ে ধরেছেন বাদশাকে, তাকে

ওয়াজীর করতেই হবে। কামরুদ্দিন যে জঘন্য কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছেন তারপর তাকে আর ওয়াজীর রেখে ফয়দা কি? শা নাদির কুলি নাকি যাবার আগে আমাদের বাদশাকে বলে গেছেন—তুরাণীদের হটাও। বড় বড় পদে ইরাণীদের এনে বসাও। তুরাণী আমীরেরা কোন কম্মের নয়। কম্মের যে কে তা খুদাতালাই জানেন। শুনিনি তো একমাত্র বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক ছাড়া আর কেউ কারনালের প্রান্তরে অস্ত্র তুলে ধরেছিলেন। অথচ তাঁর নামই এখন শোনা যাচ্ছে না। তোবা! তোবা!

বাদশা মদত দিচ্ছেন ইরাণীদের। তুরাণীদের এখন আর তাঁর পছন্দ নয়। হবেই তো। নাচনেওয়ালী সেই বাঈজী উধম বাঈটা আবার ফিরে এসেছে না হারেমে? আমির খাঁ-ইতো পাঠিয়েছিলেন ওকে। সেই বজ্জাত জেনানা আর নতুন নাজির জাবিদ খাঁ দিনরাত বাদশার কানের পাশে ইরাণীদের নাম জপ করছে। হায়রে বাদশা! মানুষ এত বড় বেসরম হয়ে যেতে পারে ভাবা যায় না কখনো। নাদির কুলি তাঁর গালে এত বড় একটা চড় কষিয়ে গেল—সে কথাটি তার মনে আছে? এখন দেখি দিনরাত খোয়াব ঘরে পড়ে থেকে ভারে ভারে সরাব গিলছেন। আর ইরাণীরা দিনরাত কানের কাছে এসে ফুস্‌ফুস্‌ করছেন।

যাই হোক্, বাঈজীটা সেয়ানা আছে একথা বলতেই হবে। একটা গণিকা হয়ে পড়ে থাকেনি। একেবারে খাসমহলের বেগম হয়েছে। একটা নামও বাগিয়ে নিয়েছে—বৈজু বেগম। শুধু কি তাই? একটা বাচ্চাও পয়দা করেছে বেশ কয় বছর আগে। একটা মরদ বাচ্চা। হ্যাঁ, তগ্‌দির বইকি আমাদের বাদশার। একটা লেড়কা বাচ্চা তো! মোগল বাদশার উত্তরাধিকারী। তোবা। তোবা।

বাদশা কি আঁখের দৃষ্টি খুইয়েছেন নাকি? সারা হারেমে তো টি-টি পড়ে গেছে। তওফাওয়ালী জেনানাটা নাকি ফুরসত পেলেই খোজা জাবিদ খাঁ-টাকে নিয়ে খুব দিল্লাগী করে। অনেকে নাকি

খোজাটার কোলে বসে থাকতে দেখেছে তাকে। হায়রে নসিব! সেই বে-সরম জেনানাটারই একা মরদ বাচ্চা হল? বাদশার বাচ্চা? এ-সব দেখে শুনে মালেকা-ই-জামানী দিনে দিনে কেমন যেন শুকিয়ে উঠেছেন। সত্যি, আমি যদি মালেকা-ই-জামানীর মত এমন খবসুরত হতুম, আর এমন অভিজাত ঘরে আমার জন্ম হোত, তবে বাদশার এ বেলেল্লাপনা আমি কখনো মানতুম না। দিল্লীতে একটা হৈ-হুল্লোড় ঘটিয়ে দিতুম। কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য মালেকা-ই-জামানীর! সব মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছেন। ঐ তওফাওয়ালী মেয়েটার যদি ঘটে এত বুদ্ধি থাকতে পারে, ইরাণীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করতে পারে, তক্‌তে তাউসটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্য সাদীর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাচ্চা পয়দা করতে পারে, তবে মালেকা-ই-জামানী কিছু করতে পারেন না? তুরাণীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাদশাকে তিনি হাত করতে পারেন না? জোর করে বাদশাকে মহলে ধরে এনে, সারারাত আটক রেখে, একটা লেড়কা বাচ্চা পয়দা করতে পারেন না? আমি তো জানি কামরুদ্দিন কতবার ভেট করবার চেষ্টা করেছেন মালেকা-ই-জামানীর সঙ্গে। কিন্তু তিনি যে পরদানসীন। বোরখা খুলে কথা বলবেন পরপুরুষের সঙ্গে! সত্যি মালেকা-ই-জামানীর উপরই মাঝে মাঝে আমার গোঁসা হয়ে যায়।

তওফাওয়ালীর কথা শুনে বাদশা নাকি ইরাণী বদমাস্ সেই আমির খাঁ-টাকেই ওয়াজীর করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হিজ্‌ড়ে ঐ ওয়াজীরটার কোন হিম্মত নেই যে, একটুখানি তর্জন গর্জন করে উঠবে। তাঁর যতকিছু লাফালাফি সবই তার ভাই নিজাম-উল্-মুলক চিনকিলিস খাঁর জন্য। নাদির কুলির কাছে বে-ইজ্জত হয়ে সে নাকি ইতিমধ্যেই দাক্ষিণাত্যের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। ইরাণীরা বোধহয় সেই সুযোগই নিয়েছে। তারা বুঝেছে যে, এখন চাপ দিলে ঐ হিজ্‌ড়ে কামরুদ্দিনটার কোন উপায়ই নেই। এখনই

গদি ছেড়ে চলে যাবে। তবে এখনো বাদশা খোলাখুলি কামরুদ্দিনকে কিছুই বলছেন না। নিজাম-উল্-মুলকটা দিল্লী থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেলে তবেই তিনি কামরুদ্দিনকে যা বলবার তা বলবেন। তা যাক। কামরুদ্দিনের মত কাপুরুষের ওয়াজীর থেকেই বা লাভ কি? তবে কিনা ইরাণীদের আমি দু-চোখে দেখতে পারিনে।

বাদশার খুব তাগদ বেড়ে গেছে। তা এ তাগদটা অনেকদিন আগে বাড়লেও না হয় একটা কথা ছিল। সন্ধ্যাবেলা হাঁপাতে হাঁপাতে রহিমা বাঁদী মমতাজ মহলে এসে বলল: শুনেছেন বেগম সাহেবা?

আমি বললুম: কত আর শুনব। নতুন খবর আবার কি?
—হারেমের নিচে অন্ধকূপে একটা খুন হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, খবরটা একটু নতুনই বটে। বহু দিনতো হারেমের মধ্যে খুন খারাবির কথা কিছু শোনা যায়নি। বললুম: তা খুন হল কে?

—কোকিজী।

—কোকিজী! সে আবার হারেমে এল কোত্থেকে?

রহিমা বলল: আমরাও জানতুম না বেগম সাহেবা। এখন শুনছি নতুন নাজির জাবিদ খাঁ আর বেগম বৈজু সাহিবা…।

রহিমার কথা শেষ না হতেই ধমকে উঠলুম আমি: বৈজু সাহিবা কিরে? বল তওফাওয়ালী মেয়েটা…। হ্যাঁ, বল্।

একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল রহিমা। একটা ঢোক নিয়ে বলল: জাবিদ খাঁ আর ঐ তওফাওয়ালী বেগমটা ওকে হারেমের নিচে আটকে রেখেছিল। আজই খুন করিয়েছে।

—তাই নাকি?

—জী বেগম সাহেবা।

—তুই শুনলি কোত্থেকে?

—আমি কি? হারেমশুদ্ধ সবাই জানে। ওয়াজীর কামরুদ্দিন ভয়ে ভয়ে দিল্লী ছেড়ে পালিয়েছেন।

—হ্যাঁ হজরত সাহেবা।

কেমন যেন মুষ্ড়ে গেলাম। কামরুদ্দিনকে যে খুব পছন্দ করি তা নয়। বাদশাকে এমন সর্বনাশা মেয়েছেলের নেশায় মাতিয়েছে ঐ কামরুদ্দিনটাই। কিন্তু তবু আজ তারই প্রয়োজন আমাদের। ইরাণী দলকে রুখতে গেলে সে ছাড়া এখন আর কে আছে? এইসব ছোটলোকদের নিয়ে ইরাণী দল যদি বাদশাকে ঘিরে ধরে, তবে মোগল হারেমের যা কিছু বাকি আছে তাও যাবে। কবে হয়তো আমাকে আর মালেকা-ই-জামানীকেও কেল্লা থেকে বের করে দিয়ে ছাড়বে বাঈজীটা।

মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। আর কোন কথাই বলতে পারলুম না। আমাদের বাঁদীগুলোও হয়েছে তেমনি। কোন একটা সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারেনা কোনদিনই। আমাদের পক্ষে যত দুঃসংবাদ, তাই এনে হাজির করে। এ জন্যে কখনো কখনো মনে হয় রহিমাকে গলা টিপে শেষ করে দেই।

রাতে যেন চিন্তায় চিন্তায় ঘুমই হল না আমার। মালেকা-ই-জামানী কিন্তু অকাতরে ঘুমোলেন। দিনে দিনে যত বেশী ব্যথা পাচ্ছেন তিনি ততই তার ঘুমটাও বেশী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। হয়তো কোন কোন মানুষ ব্যথাতে এমন কাহিল হয়ে পড়েন যে, তখন তার দুর্বল স্নায়ুগুলি তাকে এমনিতেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আল্লাতালা যা-হোক তবু একটা আশীর্বাদ রেখেছেন মালেকা-ই-জামানীর জন্য। কিন্তু আমার যন্ত্রণার শেষ নেই। বার বার খুদাতালাকে ডেকে বলতে লাগলুম: আর যাই হোক, ঐ বাঈজীটার পয়জার মাথায় তুলতে হয় এমন কোরোনা যেন তুমি।

আল্লাতালা আছেন কিনা জানিনা। কিন্তু আমি মনেপ্রাণে তাকে বিশ্বাস করি। ভেবেছিলাম, সকাল বেলা ঘুম ভেঙে উঠেই শুনব আমীর খাঁ উজীর হয়েছে। আর উধম হুকুম করেছে মমতাজ

মহল থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য। কিন্তু, না। সে রকম কিছুই শুনলাম না। বরং লক্ষ্য করে দেখলাম, সমস্ত হারেমটাই কেমন যেন নিস্তব্ধ। মমতাজ মহল থেকে দেওয়ানী খাসের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভোরবেলাই বাদশা ইরাণী আমীরদের নিয়ে খুব গম্ভীর ভাবে সলাপরামর্শ করছেন। যেন কতকগুলো নির্বাক ছায়ার মত দেখাচ্ছে সবাইকে।

কামরুদ্দিন দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। তবু বাদশা আমির খাঁকে ওয়াজীর না করে গুজ্‌গুজ্ ফুস্‌ফুস্ করে সলাপরামর্শ করছেন কেন? তাহলে কি বাদশা ভয় পেয়ে গেছেন? নিজাম-উল্-মুল্‌ক দিল্লী ছেড়ে এখনো খুব বেশী দূরে যান নি। কামরুদ্দিন কি তাহলে তার কাছেই পালিয়ে গেছেন নাকি? সেই ভয়ে বুঝি বাদশা কিছু করতে পারছেন না? একথা তো ঠিক যে, এখনো যদি নিজাম্-উল্-মুল্‌ক তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে লালকেল্লার লাহোর দরওয়াজাতে দাঁড়ান—তাহলে ইরাণী আমীরেরা লুকিয়ে পালাতে পথ পাবেন না। কামরুদ্দিন যে ওয়াজিরী পাবার জন্য এত লাফাচ্ছে, একটা জাঠ লুঠেরাকে দমন করবার মত তাগদ আছে তার?

সকালটা এমন করেই কাটলো। দুপুরও। শুনলাম উধম বাঈ আর জাবিদ খাঁ খুব চাপ দিচ্ছে বাদশার উপর—আমির খাঁকে ওয়াজীর করবার জন্য। কিন্তু বাদশা কিছুতেই কান পাতছেন না। আমার সন্দেহই ঠিক। বাদশা নিশ্চয়ই খুব ভয় করছেন নিজাম্-উল্-মুল্‌ককে।

সারাদিনটা নানা টানাহিঁচ্ড়ানোর মধ্যে চলে গেল। ঘনঘন বৈঠক বসলো খাস দরবারে। বারবার খাস মহলের খোয়াব ঘর থেকে জাবিদ খাঁকে দেওয়ানী খাসে যাতায়াত করতে দেখলুম। কিন্তু কোন কিছুই জানা গেল না। দিল্লী শহরে খুব একটা উত্তেজনা হয়েছে শুনলুম। ইরাণী তুরাণী দুই দলই খুব সন্ত্রস্ত। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাতেও বাদশার কোন সিদ্ধান্তের কথা শোনা গেল না। আল্লাতালার নাম

করে রাত্রিবেলা শুতে গেলাম। আর যা-ই হোক, ঘুম ভেঙে উঠে যেন না শুনি যে, আমির খাঁ মোগল বাদশার ওয়াজীর হয়েছেন।

পরদিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে এক তাজ্জব কথা শুনলুম। আমির খাঁ ওয়াজীর হবেন তো দূরস্থান—তাকে নাকি পিছমোড়া দিয়ে হাত বেঁধে নিজাম-উল্-মুল্‌কের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জয়সিংপুরাতে। সে কি কথা! এরকম হবার মানে? তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালুম রহিমা বাঁদীকে সে যদি কিছু খবর জানে। মোগল হারেমের বাঁদীরা এখন যে খবর রাখে, দেওয়ানী খাসের ওয়াকিয়ানবিশও সে খবর রাখেন না।

আসল খবরটা রহিমা বাঁদীর কাছ থেকেই জানলুম। গতকাল যে দেওয়ানী খাসে সারাদিন ধরে জটলা হয়েছে, তা সাধে হয়নি। কামরুদ্দিন পালিয়ে যাবার আগে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন বাদশাকে। লিখেছেন—'হজরত পাদিশার কাছে কোনদিন দুবির্নীত হইনি। হবও না। শাহেনশা যখন আমার উপর অখুশ হয়েছেন তখন ওয়াজীরের পদ ধরে থাকার কোন মানেই হয় না। হজরত পাদিশা তাঁর যে কোন পেয়ারের বান্দাকে এ পদটা অনায়াসে দিতে পারেন।' পত্রের বয়ান শুনে আমির খাঁ নাকি খুবই চাপ দিয়েছিলেন বাদশার উপর। কিন্তু বাদশার তখন কলজেয় পানি থাকলে তো! তিনি শুনছেন যে, নিজাম-উল্-মুল্‌ক বেশী দূরে যান নি। তিনি ছাউনী গেড়ে বসে আছেন জয়সিংপুরাতে। উজীর কামরুদ্দিন গিয়ে উঠেছেন তাঁর কাছেই। শুনেই বাদশার হয়ে গেছে। উধম বাঈ, জাবিদ খাঁ আর আমির খাঁ তাঁকে যতই বোঝান না কেন, তিনি কিছুই বোঝেন নি। সন্ধ্যাবেলায় দিশেহারা হয়ে শা বুরুজে গোপনে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ইশাক খাঁকে। নাদির কুলি নাকি হিন্দুস্থান ছেড়ে যাবার আগে বাদশাকে বলে গেছেন যে, ইশাকের চেয়ে বুদ্ধিমান আমীর মোগল দরবারে আর নেই। বিপদে পড়লে বাদশা যেন তাঁরই পরামর্শ নেন।

ইশাক খাঁ বদ পরামর্শ দেননি। বলেছেন: আমির খাঁ নিজে

আমীর এবং আমীরের ছেলে হলেও, তার সাহস এবং বুদ্ধি থাকলেও, হিন্দুস্থানের ওমরা এবং নাগরিকেরা তাকে তেমন গুরুত্ব দেন না। কিন্তু তামাম হিন্দুস্থানে হাজারো লোক নিজাম-উল্-মুলক আর কামরুদ্দিনকে সালামত্ করে। তাদের ছেড়ে দেওয়াটা বাদশার উচিত হবেনা।

হজরত পাদিশা এমনিই নিজামের ভয়ে কাঁপেন। ইশাকের এ-পরামর্শ শুনবার পর আর তিনি সবুর করেন ? সকালবেলাই আমির খাঁকে পিছমোড়া দিয়ে হাত বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছেন জয়সিংপুরাতে নিজামের কাছে ক্ষমা চাইতে। আ! খুদাতালাকে আর কি বলে ধন্যবাদ জানাব। এখন যদি খোয়াব ঘরে একবার বে-ইজ্জত তওফাওয়ালী সেই বাজারের মেয়েটাকে দেখতে পেতাম! সে বেটীর নিশ্চয়ই মুখ শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছে। আমির খাঁ-টার হবে কি ? নিজাম তার গর্দান নেবেন না ? ও বেটার গর্দান নিয়ে ওয়াজীর কামরুদ্দিন যদি লালকেল্লায় ঢুকে শয়তানের পয়দা এই কাফের তওফাওয়ালীটারও গর্দান নেয় তো দুনিয়ার মালিক সব দিক থেকেই ভাল করেন।

সারাদিন এ সংবাদটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম। নিজাম আমির খাঁর গর্দান নেননি। কিন্তু তাকে মিষ্টি কথায় হুকুম করেছেন দিল্লী ছেড়ে তার নিজের সুবা এলাহাবাদে চলে যেতে। খুদা মেহেরবান। তওফাওয়ালীটার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন তিনি। আমির খাঁ উজীর হলে নিশ্চিত ঐ কাফের মেয়েমানুষটা মোগল হারেম থেকে আমাদের তাড়িয়ে ছাড়তো। খুশীর সংবাদ পেয়ে বাঁদীকে বললুম: যমুনার পানি নিয়ে আয়। ভাল করে ওজু করে আজ দিল্ খুলে নামাজ পড়ব। নিমক-হারামের দল খুদার বিচারে দোজখে গেছে।'

হিজরী ১১১৮ সাল। জমায়ল ১১। আমির খাঁ এলাহাবাদ অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। অনেক টালবাহানা করেছিলেন তিনি। সহজে কি দিল্লী ছেড়ে যেতে চান। লোকে বলে দিল্লীতে আছে বেহেস্তের সাত দরওয়াজা। সে দিল্লী কি সহজে ছাড়তে ইচ্ছা করে ?

কিন্তু নিজাম-উল্-মুলকের এক গোঁ, আমির খাঁ এলাহাবাদ না গেলে তিনি দাক্ষিণাত্যে যাবেন না। অগত্যা সে শয়তানের বাচ্চাটা দিল্লী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এখন ঐ তওফাওয়ালী হারামী জেনানা-টার একটা বে-ইজ্জত হলে যেন হাড় জুড়ায়। সইবেন না, খুদাতালা নিশ্চয়ই এত অবিচার সইবেন না।

॥ ৭ ॥

শয়তান আমির খাঁ-টা দিল্লী থেকে বিদায় নিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু কামরুদ্দিনটা সত্যই অপদার্থ। ক্ষমতায় ফিরে এসেও কই বাদশাকে তো তিনি হাত করতে পারছেন না? হারেমে সেই তওফা-ওয়ালী জেনানাটার প্রভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বাদশা যেন আরব মরুভূমির বেদুইনদের পোষা একটা উট বনে গেছেন। এত বড় একটা জানোয়ারকেও নাকে দড়ি দিয়ে যেমন ঘুরায় লোকে, তেমনি করে বাদশাকে ঘুরাচ্ছে ঐ হারামী মেয়েছেলেটা। দিনরাত খোয়াব ঘরে ঐ তওফাওয়ালীটাকেই নিয়ে আছেন বাদশা। কামরুদ্দিনের এদিকে লক্ষ্য যায় না? উধম বাঈটার বিষদাঁত না ভাঙলে বাদশাকে তিনি হাতের মুঠোর মধ্যে আনবেন কি করে? ঐ তওফাওয়ালীটার দৌলতে বড় বড় রাজপদ এখনো ইরাণীদের ভাগ্যেই উঠছে। কোথাকার গাঁয়ের চাষা সব আত্মীয়স্বজন, তাদের লাল-কেল্লায় এনে রাতারাতি আমীর বানিয়ে দিচ্ছে নচ্ছার মেয়েছেলেটা। ওয়াজীর হয়ে কামরুদ্দিন এসব দেখছেন না? তাহলে ওয়াজীর থেকে তাঁর লাভ হল কি? যদি তাঁর কোন ক্ষমতাই না থাকলো তবে পদের আর মূল্য কি? তুরাণীরা যদি ক্ষমতা পেতে চায় তাহলে হারেম থেকে এই বিষকাঁটাটাকে তুলতে হবে আগে। নাদির কুলি চলে যাবার পরে কতদিন কেটে গিয়ে আবার রমজান এল, কিন্তু তুরাণীরা তবু যদি কিছু করতে পারলো। ঐ তওফা-

ওয়ালীটাই এখন যেন রাজ্য চালাচ্ছে। কেমন নৃশংসভাবে কামরু-দ্দিনের ভেট পাঠানো বাঈজী কোকিজীকে খুন করেছে ঐ তওফা-ওয়ালী আর নতুন নাজির জাবিদ খাঁ, উজীর সাহেব কি তা জানেন না? তেমনি করে আমির খাঁর ভেট পাঠানো এই নষ্টচরিত্র মেয়েমানুষটাকে চোখ উপড়ে অন্ধকূপে ঠেলে দিতে পারেন না কামরুদ্দিন? বেশ কিছুদিন হল শয়তান আমির খাঁ-টা বিদেয় হয়েছে, তবু যদি কাফের জেনানাটার দাপট কমলো!

বাদশাও তাঁর আঁখ খুইয়ে বসে আছেন। নইলে দেখতে পান না যে, নাজির জাবিদ খাঁ-টাকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারীটাই না করেছে ঐ তওফাওয়ালীটা। হারেমে তো ঢি-ঢি পড়ে গেছে। বান্দা বাঁদীরা নাকি অনেকদিন বিশ্রীভাবে ঐ খোজা নাজির আর বাঈজীটাকে পড়ে থাকতে দেখেছে। তা হবেই তো। বার পুরুষ নিয়ে যে মজা লুটেছে, এক মরদে তার মন উঠে? হারেমের মধ্যে পরপুরুষ পাবে কোথায়, তাই খোজা নিয়েই ঢলাঢলি করছে। খোজাটার হিম্মত থাক না থাক, একটা জাঁদরেল পুরুষের মত চেহারা আছে তো বটে! তোবা! তোবা! এমন যে হারামী মেয়েমানুষ, তাকে কিনা সোহাগ করে বাদশা নাম দিয়েছেন বৈজু সাহিবা! আফিং আর চরস খাইয়ে বাদশাকে একটা পোষাপাখির মত বশ করে রেখেছে সে।

সত্যি মনটা খারাপ লাগছিল। চারমাস হয়ে গেল, তবু যদি এর কোন একটা হিল্লে হোল। এদিকে চারমাসের আর একটা বাচ্চা তওফাওয়ালীটার পেটে। সেও যদি লেড়কা হয়ে জন্মায় তো হিন্দুস্থানের তক্‌তে তাউসটাই হবে তার বাচ্চাদের জন্যে। খুদাতালা কি এতবড় একটা অবিচার সইবেন?

হিজরী ১১১৮ সাল। ৪ঠা রমজাম। রহিমা বাঁদীর জন্য বসে ছিলাম। উল্লুকীটা যমুনার পানি এনে দিলে ওজু করে নামাজ পড়ব। এক একবার নামাজ পড়তেও বিরক্তি এসে যায়। সুন্নি মুসলমান হয়ে

খুদাতালাকে ডাকবার পরও বাদশার ঘরে একটা কাফের জেনানা এসে যদি খবরদারি করে, তাহলে আল্লাতালার উপর রাগ হয় না? আল্লা-তালার উপর অভিমান করতে করতে রহিমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় প্রায় লাফাতে লাফাতে রহিমা বাঁদী এসে মমতাজ মহলে ঢুকলো: হজরত সাহেবা শুনেছেন?

মালেকা-ই-জামানীর এ বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ উৎকর্ণ হয়ে ফিরে তাকালাম: কি-রে?

—বাদশা খুব গোঁসা করে নিজের হাতে চাবুক কষছেন।

— চাবুক কষছেন! কাকে?

—কাকে আবার! খোয়াব ঘরের বিবিকে!

—খোয়াব ঘরের বিবি? তার মানে? তওফায়ালীটাকে?

—জী বেগম সাহেবা।

—'কেনরে? কেনরে?' গভীর কৌতূহল নিয়ে রহিমা বাঁদীর গা ঘেঁষে জেঁকে বসলাম যেন।

রহিমা বলল: শাহেন শা হঠাৎ খোয়াব ঘরে গিয়ে তাজ্জব বনে গেছেন। গিয়ে দেখেন খোজা জাবিদ খাঁ-টার গায় পড়ে ঢলাঢলি করছে তওফায়ালীটা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা।

—খোজাটার গর্দান নিয়েছেন বাদশা?

—না হজরত সাহেবা। খোজাটাকে কিছু বলেন নি শাহেন শা। রেগে গিয়ে বাঈজী-বেগমটাকে খুব চাবুক কষ্‌ছেন।

হঠাৎ মালেকা-ই-জামানীর কণ্ঠ শুনলাম: বাঈজীটার দোষ কি? বাজারের মেয়েছেলে। এক পুরুষে মন উঠে না। বেগম করে একটা তওফাওয়ালীকে যে বাদশা কি করে খাসমহলে উঠালেন তাই ভাবি।

আমি বললুম: ঐ নাজির জাবিদ খাঁ-টার গর্দান নেওয়া উচিত এখনি। হজরত পাদিশা নিশ্চয়ই আজ তার গর্দান নেবেন।

আমার কথা শুনে মালেকা-ই-জামানী মুখ টিপে কেন যেন হাসলেন।

বললুম : হাসছেন কেন বেগম সাহেবা ? খোজাটার গর্দান নেওয়া উচিত নয় ?

মালেকা-ই-জামানী বললেন : নেওয়া তো উচিত। কিন্তু সে তাগদ বাদশার আছে কি ?

—কেন নেই ! নিশ্চয়ই আছে।

—তুমি কিছুই বোঝনা সাহিবা মহল। ঐ খোজাটার পেছনে বড় বড় আমীরেরা আছেন। ওর গায় হাত পড়লে বাদশার গদি থাকবে ? এখন বাদশাহী তো নামকোওয়াস্তে। হারেমে থেকে কিছুই টের পাচ্ছ না ?

হয়তো মালেকা-ই-জামানীর কথাই সত্য। কিন্তু সে কথা ভাবতে কিছুতেই যেন ইচ্ছা করেনা। বাদশার বেগম হয়ে একথা ভাবার অর্থ যে নিজের কাছেই নিজেকে অপমান করা। আমি চুপ করে গেলুম।

কয়েক মুহূর্ত কারো মুখেই আর কোন কথা ফুটলো না। মালেকা-ই-জামানী কথা বললে রহিমা বাঁদী নিশ্চুপ হয়ে যায়। একটা অদ্ভুত আভিজাত্য আছে তার মধ্যে। বাদশা তার মূল্য না দিলে কি হবে, হারেমের বেগম বাঁদীরা আজো মালেকা-ই-জামানীকেই ভয় করে। রহিমা বাঁদীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আমারও ইচ্ছা হল না। সত্যি তো ! বাদশা যদি এতবড় অসহায় হয়ে থাকেন যে একটা বেয়াদব খোজার জান্ নেবার ক্ষমতা তার নেই, তাহলে আর ঐ তওফাওয়ালীটাকে চাবুক কষ্‌লেই আমাদের আর খুশমেজাজ হবার কি আছে ?

বেশ কিছুক্ষণ আমরা দুজন চুপ করে থাকলুম। রহিমা বাঁদী যেন উশ্‌খুশ্‌ করছে। মজা করে কথাটা বলতে না পারার জন্যই বোধহয় তার এই অস্বস্তি। ভাবলুম, সামনা থেকে ওকে যেতেই বলি। হঠাৎ

এমন সময় নিজে থেকেই শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কি হল, কিছু বুঝবার আগেই সে বলল ঃ বেগম সাহেবা শাহেন শা আসছেন মমতাজ মহলের দিকে।

শাহেন শা!

চমকে উঠে হারেমের মাঠের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, সত্যি শাহেন শা আসছেন এদিকে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমার নিজের প্রকোষ্ঠে চলে গেলাম। বহুদিন শাহেন শার মোকাবিলা হইনি। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম। আর তা ছাড়া মমতাজ মহলে শাহেন শা নিশ্চয়ই আমার কাছে আসছেন না। আসছেন মালেকা-ই-জামানীর কাছে।

নিজের প্রকোষ্ঠে ঢুকে পর্দার ফাঁকে মালেকা-ই-জামানীর ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অনেক কাছাকাছি এসে গেছেন বাদশা। আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখলাম। প্রায় দশ বছর পরে এত কাছাকাছি বাদশাকে দেখলাম। সে বাদশা আর নেই—যার মুখে ছিল এক অপূর্ব লাবণ্য। সে বাদশা আর নেই যার সুস্থ সবল দেহে ছিল কাঞ্চনের মত একটা দীপ্তি। যা দেখে সাদীর রাতে আমার মনে হয়েছিল—সার্থক! সার্থক! জীবন আমার সার্থক। বেহেস্তের ইস্রাফিলকে পেলেও এমন পরিতৃপ্ত আমি কোনদিন হতাম না।

মুখের সে লাবণ্য আর নেই। কপালে ভাঁজ পড়েছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। ঘনকৃষ্ণ সেই শ্মশ্রুরাজির মধ্যে পাক ধরেছে। অবিন্যস্ত পিরাণ গায়। খালি গায় থাকলে বোধহয় দেখা যেত যে পাঁজরের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে। দুইপায়ে সেই দৃঢ়ক্ষেপ নেই। মনে হয় না বাহুতে কোন জোর আছে। একি! একি চেহারা হয়েছে বাদশার! এ অবস্থায় তিনি যেন মালেকা-ই-জামানীর কাছে না এলেই ভাল হোত।

রহিমা দেখলাম আভূমি নত হয়ে শাহেনশাকে কুর্ণিশ জানাচ্ছে ঃ 'বাদশা সালামত্।' কিন্তু বাঁদীর দিকে ফিরে তাকাবার অবসর

নেই হুজরত মালিকের। তিনি বরাবর এসে মালেকা-ই-জামানীর পালঙ্কে বসলেন।

মালেকা-ই-জামানী যেন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন। কি করবেন ভেবেই পাচ্ছেন না। ওদিকে বাদশার চিত্ত যে বিক্ষিপ্ত তা বেশ বোঝা যায়। অপ্রস্তুত মালেকা-ই-জামানী বললেন: —মেহেরবান খোদাবন্দ, সরাব দেব কি?

গম্ভীর ভাবে বাদশা বললেন: না।

—সরবৎ দেব?

—না।

—রহিমা কি হাওয়া করবে জাঁহাপনাকে?

—না।

—তাহলে হুকুম করুন দুনিয়ার মালিক, কি করব?

বাদশা বললেন: কিছু করতে হবেনা। বাঁদীটাকে যেতে বল। নিভৃতে তোমার মহলে আমি বিশ্রাম করব।

মালেকা-ই-জামানী চোখের ইঙ্গিতে রহিমাকে চলে যেতে বললেন। কুর্ণিশ জানিয়ে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে রহিমা মমতাজ মহলের উঠানে নেমে গেল। বাদশা মালেকা-ই-জামানীর শয়নকক্ষে ঢুকে গেলেন।

আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম। অথচ আজ সত্যি আমার আনন্দের দিন। একটা তওফাওয়ালীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাদশা মালেকা-ই-জামানীর মহলে দিন কাটান, মোগল বাদশার ইজ্জত রক্ষা করুন তিনি। কিন্তু......! কিন্তু বাদশা কি কখনো মনে করতে পারবেন যে, এই মমতাজ মহলেই সাহিবা মহল নামে তাঁর এক সাদী করা বেগম আছে? সেও বাজারের বাঈজী নয়—অভিজাত কোন এক মোগল আমীরের ঘরেরই মেয়ে?

কিন্তু না, নিজের কথা আমি ভাবি না। আজ পনের বছর বিবাহিত যৌবনকে মোগল হারেমে বুভুক্ষু রাখবার পর নিজের সম্পর্কে আর ভেবে লাভ কি? যা একদিন স্বপ্ন ছিল, তা আজ অতীত।

এখন কঠিন নির্মম জীবন সামনে। মোগল হারেমের বেগমের মর্যাদা নিয়ে বাকি জীবনটা যদি কেটে যায়, মেহেরবান খুদাতালার কাছে সে জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লা তুনিয়ার মালিক বোধহয় এতদিনে মোগল হারেমের অভিজাত বেগমদের উপর খুশ হয়েছেন। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল তবু দেখি বাদশা খাস মহলের খোয়াব ঘরে ঐ তওফাওয়ালীটার কাছে আর যাচ্ছেন না। হারেমে এখন মালেকা-ই-জামানীর কাছেই তিনি রাত্রি যাপন করছেন।

কিন্তু তওফাওয়ালী সেই হারামী মেয়েছেলেটার তাতে কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না আমার। বাজারের মেয়েমানুষ একটা চাবুক খেলে তার ইজ্জতের কি এসে যায়? সে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। শুনছি, বাদশা খোয়াব ঘরে না যাওয়াতে তার মজাই হয়েছে। দিনরাত ঐ খোজাটার সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ঢলাঢলি করছে। বাদশা কি এতই অসহায় যে, বে-আদব ঐ মেয়েছেলেটাকে কিছুই করতে পারেন না? উঃ! আল্লাতালা একি করলেন! ঐ বদমাস বাঈজীটাকেই একটা লেড়কা বাচ্চা দিলেন! তওফাওয়ালীর বাচ্চাটা যখন খাস মহলের মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, মনে হয় ছুটে গিয়ে গলাটা চেপে ধরি। বেশ ডাগরডোগর হয়ে উঠেছে। আর সহজে কবর-টবরে যাবে বলে মনে হয় না। ইস্! মালেকা-ই-জামানী বা আর কোন অভিজাত ঘরের বেগমের যদি বাঈজীটার আগে একটা পুরুষ বাচ্চা হোত!

সব কিছু হারিয়ে, সুযোগ হারিয়ে, এতদিনে বাদশা অনেকটা ধাতস্থ হয়েছেন। দেখছি সরাব সিরাজীর প্রতি এখন আর তেমন আকর্ষণ নেই। সরাব সিরাজী একেবারে না ছেড়ে দিলেও সরবৎটাই বেশী খান। তওফাওয়ালী বা বাঈজীর নাচও কমে গেছে অনেক। পাঁচ ওক্ত এখন রোজই দেখি নামাজ পড়েন। শা বুরুজে আমীরদের নিয়ে

ভিড় না জমিয়ে সময় করে এখন কুরাণ-শরিফ পড়েন। মাঝে মাঝেই এখন দেখি ফকির দরবেশ আসছেন হারেমে। বাদশা খুব খাতির করেন শা মুবারক, শা বাদ্‌দা আর শা রম্‌জকে। শা মুবারককে বাদশা ডাকেন বুরহান-উল্‌-তরিকাৎ বলে, শা বাদ্‌দাকে বুরহান-উল্‌-হকিকাৎ আর শা রম্‌জকে ফসি-উল্‌-বয়ান। পুরুষ হলেও কেল্লার হারেমে এ দরবেশদের অবাধ প্রবেশাধিকার। দরবেশেরা হারেমে ঢুকলেই বেগম বাঁদীরা ভিড় জমায় এখন। তগ্‌দির-তগ্‌দির বলে সবাই পাগল। তগ্‌দিরে কি আছে জানতে চায়।

আঘাতটা মানুষের পক্ষে অনেক সময় ভালই হয়। নাদিরকুলি যে হেস্তনেস্ত করে গেছেন তার ফলেই বুঝি বাদশার হুঁশ হয়েছে। তবু যা কিছু বাকি ছিল—ঐ তওফাওয়ালীটার ব্যবহারেই বুঝি সব কিছু ভেঙে গেছে। বোধ করি খুব ভালই বেসে ফেলেছিলেন ঐ বাজারের বাঈজীটাকে। তা সত্বেও ও বেটী যখন খোজাকে নিয়ে ঢলাঢলি করছে তা দেখেই বুঝি বাদশার এসব ব্যাপারের উপর থেকে মন উঠে গেছে। জেনানা মানুষের নাম শুনলে আর উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ান না। হ্যাঁ, বোধহয় মোহই ছুটে গেছে, নইলে দরবারের বুল্‌বুল্‌ বাঈজীটাকে তিনি ইরাণ থেকে আসা সেই মুসায়ের আলিকুলির সঙ্গে সাদী দিয়েছেন! সকাল সন্ধ্যায়, বা দেওয়ানী খাসের আসরে সে বাঈজীটার কণ্ঠ আর শোনা যায় না। ভারি মিষ্টি কণ্ঠ ছিল। শুনতে পাই নিজে গজল লিখে বাদশাকে শোনাতো সে। যাক্‌, ভাল হয়েছে। একটা মুসায়েরের সঙ্গে সাদী হয়েছে। শুনছি একটা বাচ্চাও নাকি হয়েছে তাদের—একটা লেড়কি বাচ্চা। খুব ভাল জেনানাদের বোধহয় বাচ্চাই হয় না। মাঝারিদের হয় লেড়কি। লেড়কা বাচ্চা হয় বোধহয় দুশ্চরিত্র মেয়েদেরই। কিছুতেই ভুলতে পারিনা, তওফাওয়ালী ঐ জেনানাটাই মোগল বাদশার তক্‌তে-তাউসের জন্য একটা লেড়কা বাচ্চা পয়দা করল, আর কেউ পারল না। শাহেন-শার হারেমে তো বেগমের সংখ্যা কম নেই!

বাদশার মতিগতি যে ভাল হচ্ছে সেটা সুখের সংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু হারেমে আমি বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছি। হারেমের এই বঞ্চিত জীবনে একমাত্র মালেকা ই-জামানীই আমার সান্ত্বনা ছিলেন। হারেমের নিঃসঙ্গ জীবন তাঁর সঙ্গেই সুখ-দুঃখের আলাপ করে কাটিয়ে দিতাম। এখন তার দেখা কদাচিৎ মেলে। বাদশা অধিকাংশ সময় মমতাজ মহলে তাঁর কাছেই থাকেন এখন। আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করবার মালেকা-ই-জামানীর এখন খুব একটা ফুরসৎ হয় না।

২৫শে শাবান। হিজরী ১২২১ সাল। হঠাৎ আজ বেশ কিছুক্ষণ ফাঁকা পাওয়া গেল তাঁকে। বাদশা দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে সকালবেলাই দেওয়ানী আমে গেছেন। সারাদিনে তাঁর আর দেখা নেই। দীর্ঘ সময় বাদশাকে অনুপস্থিত দেখে মালেকা-ই-জামানীর কক্ষে ঢুকলুম আমি। তাঁকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললুম: সালামত্ বেগম সাহেবা। খবর কি? বাদশা আজ নামাজ বাদ দিয়ে, কুরাণ-শরিফ রেখে, বড় যে দেওয়ানী আমে গিয়ে পড়ে আছেন? মাথায় আবার শয়তান হারাম পয়দা করল নাকি?

মালেকা-ই-জামানী হেসে বললেন: না সাহিবা মহল। দেওয়ানী আমে আজ খুব গুরুতর দরবার আছে।

—গুরুতর দরবার? কি হয়েছে? শা নাদিরকুলি আবার হিন্দুস্থানে আসছেন নাকি?

—না।

—তবে?

—শোননি তুমি? আমির খাঁ এলাহাবাদ থেকে দিল্লী ফিরে এয়েছেন।

আমির খাঁর নাম শুনেই যেন চমকে উঠলুম আমি। শাহেনশার দুর্ভাগ্যের কারণ ঐ ইরাণী আমীরটা একজন। তওফাওয়ালীটাকে তো সে-ই ভেট পাঠিয়েছিল হারেমের মধ্যে। সে শয়তানটা ফিরে এলে তওফাওয়ালীটার তো খুব চোটপাট হবে আবার। বললুম: —তাহলে কি হবে?

—খুদার মর্জি। দুনিয়ার মালিক জানেন কি হবে।

—শয়তানের বাচ্চাটা কি এবার থেকে দিল্লীতেই থাকবে নাকি?

—খুদা জানেন।

—বাদশা কিছু বললেন না?

—কিছুই তো বললেন না। খুব ব্যস্ত দেখলাম তাঁকে।

—জাবিদ খাঁ-টাকে তাই দেখলুম খুব ছোটাছুটি করছে। শেয়ানে শেয়ানে গাঁটছড়া বেঁধেছে কিনা তাই বা কে বলবে। বেগম সাহেবার এখনই সাবধান হওয়া উচিত।

ক্লান্ত ভঙ্গীতে মালেকা-ই-জামানী বললেন: আমি কি করতে পারি বল?

—আমির খাঁ কেন এলেন হঠাৎ—বাদশা আপনাকে কিছুই বলেন নি?

—না সাহিবা মহল। আজই জানলুম আমি।

সত্যি, সংবাদটা শুনে আমিও বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। বহুদিন পরে মালেকা-ই-জামানীর সঙ্গে বেশ একটা মোলাকাতের অবসর পেলেও তা জমে উঠলো না।

মালেকা-ই-জামানীর ঘরে বাদশা থাকেন তাতে আমার ব্যক্তিগত লাভ কি? কিছুই না। নিজের কথা এতদিন পরে আমি আর চিন্তাও করি না। যৌবন যখন নিঃশেষিতপ্রায়, তখন আর পুরুষের কথা চিন্তা করে লাভ নেই আমার। আমি চিন্তা করছি আমার ধর্মের জন্য, আমার জাতের জন্য। ইরাণীরা যদি আবার দিল্লীতে কর্তৃত্ব পায় তাহলে সুন্নি মুসলমানদের দুর্গতির শেষ থাকবে না। তুরাণীদেরও সব সুযোগ সুবিধা হিন্দুস্থান থেকে ফুরিয়ে যাবে। খুদাতালা কি এতদিন পরে মুখ তুলে ফিরে তাকিয়েও আবার বিরূপ হবেন? খবরটা না নিলেই নয়। কিন্তু কার কাছে খবর পাওয়া যাবে? নাজির জাবিদ খাঁ-টা ঐ তওফাওয়ালীটার পা-চাটা কুত্তা। এসব খবর সে আমাদের কাছে ফাঁস করবে না। তবে?

হ্যাঁ, আর একজন আছে। হারেমের তদারকিতে এখনো তার কিছুটা হাত আছে বৈকি! সেও তো নাজির। নাজির রজ আফজুন। সুন্নিদের সে বন্ধু। হ্যাঁ, তার কাছ থেকেই খবরটা জানতে হবে।

অবশেষে খবরটা পাওয়া গেল। ইরাণী কুত্তাটা বদ্ মতলব নিয়েই দিল্লী এসেছে। হিজরী ১১১৮ সালে দরবার থেকে বিতাড়িত হয়ে সে এলাহাবাদে নিজের জায়গীরে গিয়েছিল। কিন্তু চুপ করে বসে থাকবার পাত্র সে নয়। সেখান থেকেই সে আটঘাট বেঁধেছে দিল্লীতে ফিরে ওয়াজীর হবার জন্য। গোপন যোগাযোগের লোকের তার অভাব কি? হারেমের মধ্যে তার চর রয়েছে ঐ তওফাওয়ালীটা। বর্তমানে সে বাদশার নেক নজরে নেই। তাতেই বা কি। নাজির জাবিদ খাঁ আছে। জাবিদ খাঁ না থাকলেই কি? আছে মহম্মদ ইশাক আর আসাদ ইয়ার খাঁ। এখনো বাদশা সব চাইতে বেশী মূল্য দেন এই দুইজন ইরাণী আমীরকেই। এদের মাধ্যমেই রীতিমত যোগাযোগ চলছিল আমির খাঁর।

ধূর্তও তো কম নয় ঐ ইরাণী জালিমটা। সে বেশ বুঝতে পেরেছিল যে, দিল্লীতে ফিরতে হলে নিজাম-উল্-মুল্কের মত একজন শক্তিশালী সুবেদারের সাহায্য প্রয়োজন। অযোধ্যার ইরাণী সুবেদার সফদর জঙ্গের সঙ্গে দোস্তী করে দিল্লী থেকে নির্বাসনের এই কয় বছরে সে বেশ একটা দল পাকিয়ে তুলেছে।

মুরশিদকুলি জাফর খাঁর আমল থেকেই বাংলা বিহার আর উড়িষ্যা প্রায় স্বাধীন হয়ে গেছে। বাংলার বর্তমান নবাব আলিবর্দী খাঁ দিল্লীর দেওয়ানীকে থোড়াই গ্রাহ্য করেন। বাংলার রাজস্ব এখন বন্ধ। নিজে থেকেই মারাঠা দুষমনদের মোকাবিলা করছেন তিনি। মারাঠাদের সঙ্গে তার এই বিবাদের ফুরসতে বিহার শরিফের পাটনায় একটা ঢু মেরে এসেছে আমির খাঁর নয়া দোস্ত অযোধ্যার সিপাহশালার সফদর জঙ্গ।

এ ঢু মারার ফল কিছুই হয়নি। বাংলার নবাব আবার পাটনা দখল করে নিয়েছেন। কিন্তু দিল্লীতে নিজের চরদের লাগিয়ে এ ঘটনাটাকে

ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন বর্ণনা দিয়েছেন আমির খাঁ যে, বাদশার ধারনা হয়েছে, সফদর জঙ্গের মত বড় সিপাহশালার ইদানিং কালে হিন্দুস্থানে আর কেউ নেই। মারাঠা দুষমনদের দমন করবার জন্য দিল্লীতে যে দরবার ডেকেছেন তিনি, তাতে সফদর জঙ্গেরও ডাক পড়েছে। দশ হাজার ফৌজ নিয়ে আমির খাঁর সঙ্গে সফদর জঙ্গও দিল্লীতে এসেছেন। এসে উঠেছেন দারা শুকোর প্রাসাদে। তুরাণীদের দুর্ভাগ্য, মারাঠাদের নিয়ে নিজাম-উল্-মুল্ক চিনকিলিচ খাঁ এত ব্যস্ত যে, তিনি দিল্লী-দরবারে আসতে পারেন নি। সফদর জঙ্গকে আটকাবার মত কেউ নেই। আমির খাঁ এই নতুন দোস্তের জোরে খুব হম্বিতম্বি আরম্ভ করে দিয়েছে। ঘটনা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে। তবে একটা গোলমাল হবে বলেই মনে হচ্ছে।

২৫শে শাবান। বাদশা খুব সকাল সকাল দরবারে গেলেন। কিন্তু দুপুরবেলা দানা পানি খাবার জন্যও হারেমে ফিরলেন না। তাহলে কি দুষ্ট আমীরগুলো আবার দরবারে ভিড় জমানোর জন্য বাদশার মতিগতি পাল্টে গেল? দেওয়ানী খাসেই বাঈজীর নাচ আরম্ভ হয়ে যায়নি তো? খবর নিয়ে জানলাম তা হয়নি। বরং খুব জোর দরবার চলছে।

দরবার চলুক। বাদশা যত পারুন কাজের মধ্যে ডুবে থাকুন—শুধু ইরানীদের বদ পরামর্শে পড়ে আবার তিনি বিগড়ে না যান—এই ভয়। দুপুরবেলাও বাদশা এলেন না। ভাবলুম সন্ধ্যাবেলা আসবেন। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাও মমতাজ মহলে তাঁর কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। তাহলে? তাহলে কি খাস মহলের খোয়াব ঘরে সেই তওফাওয়ালীটার কাছেই ফিরে গেলেন নাকি তিনি? খোঁজ নিতে বাইরে এসে দেখলুম নিশ্চুপ একা দাঁড়িয়ে আছেন মালেকা-ই-জামানী। বললুম: কি খবর বেগম সাহেবা? জাঁহাপনা কোথায়? মমতাজ মহলেতো তাঁকে আজ দেখছি না?

মালেকা-ই-জামানীর অভিজাত গাম্ভির্যের মধ্যে কেমন একটা বিষন্ন ম্লান প্রশান্তি নেমেছে যেন। অথচ দেখতে আরো সুন্দরী হয়েছেন

তিনি। আলস্যজড়িত একটা ভঙ্গিমায় তিনি বললেন : তাঁর কোন হদিশ পাচ্ছি না।

—তাহলে? বাদশা কি তবে খোয়াব ঘরে গিয়েছেন নাকি?

—না সাহিবা মহল।

—তাহলে?

—হয়তো তিনি গুরুতর কাজে ব্যস্ত আছেন।

—গুরুতর কাজ থাকলে দেওয়ানী আম বা দেওয়ানী খাসে থাকবেন তিনি। কিন্তু শুনছি সেখানেও তিনি নেই। তবে?

মালেকা-ই-জামানী আমার এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই রহিমা বাঁদী এসে ঢুকলো মমতাজ মহলে। সে বলল : শাহেন শা বিকেল থেকে দরবেশদের নিয়ে তস্‌বিখানায় পড়ে আছেন।

যা হোক তবু রক্ষা। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। কিন্তু মালেকা-ই-জামানীর মধ্যে একি আলস্য! একি বিষন্নতা! একি ব্যাখ্যাতীত একটা ভাব নেমেছে? তাহলে কি উনি অসুস্থ? বললুম : বেগম সাহেবা আপনার তবিয়ত কি ভাল নেই?

ম্লান হেসে মালেকা-ই-জামানী বললেন : ভালই আছি সাহিবা মহল।

—কিন্তু আপনাকে তাহলে এমন দেখাচ্ছে কেন?

আমার এ প্রশ্ন শুনে মুখ টিপে রহিমা বাঁদী হেসে উঠলো। বললুম : হাসছিস কেন?

রহিমা বলল : আপনি কিছু জানেন না বেগম সাহেবা?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলুম তার দিকে : কি?

—এখনো আপনি বোঝেন নি?

হেঁয়ালী বুঝতে না পেরে আবার আমি মালেকা-ই-জামানীর দিকে তাকালাম। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম তাঁকে। এতক্ষণে যেন সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। ছুটে গিয়ে দুই হাতে বেগম সাহেবাকে জড়িয়ে ধরলাম আমি : খুদা মেহেরবান বেগম সাহেবা।

খুদা মেহেরবান। এতদিনে মুখ তুলে তাকিয়েছেন মমতাজ মহলে যেন একটা টুক্‌টুকে লেড়কা বাচ্চা দেন তিনি।

যা ভেবেছিলাম তাই। আমির খাঁ বেশ বদ মতলব নিয়েই দিল্লীতে এসেছেন। এখনো মোগল বাদশার ওয়াজীর হবার খোয়াব দেখেন তিনি। তাই দিল্লী ফিরেই ওয়াজীর কামরুদ্দিনের দলের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হয়ে গেছে তাঁর। ৪ঠা রবিয়সসানি মির অতিস সাদুদ্দিন খাঁর মৃত্যু হলে ওয়াজীর কামরুদ্দিন সাদুদ্দিন খাঁর ছেলে হাফিজ উদ্দিনকে তার আব্বাজানের পদে বসিয়ে দিয়েছিলেন। আমির খাঁ সে ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে সেখানে নিজের লোক সফদর জঙ্গকে বসিয়ে দিয়েছেন। তাই নিয়ে দরবারে খুব কথা কাটাকাটি। কিন্তু তুরাণীদল নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক দিল্লীতে না থাকায় এখন বেশ দুর্বল। সুতরাং তারা কিছু করতে পারে নি। দু-এক দিনের মধ্যে মির অতিস হয়ে সফদর জঙ্গ কেল্লার মধ্যে ঢুকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। চাকা ঘুরে যাচ্ছে। বোধহয় তাই জাবিদ খাঁকেও দেখছি হারেমের মধ্যে বেশ উজিরী চালে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বোধহয় ইরাণীদের পরামর্শে বাদশা এখন মমতাজ মহলে আসছেন না। আল্লা মেহেরবান ঐ সিয়া শয়তান আমির খাঁ-টাকে জাহান্নামে পাঠাতে পারেন না? কিন্তু খুদাতালা শয়তানের মর্জি সইবেন না একথাও ঠিক।

বাদশা এখন আগের চাইতে অনেক ভাল হয়েছেন। বাঁদী, তওফাওয়ালী বা বাঈজী নিয়ে এখন আর তিনি কোন কেচ্ছা করছেন না হারেমে। রক্তের জোর কমে এসেছে। বদ লোকের পরামর্শে নিজের মধ্যে আর কিছু রেখেছেন নাকি তিনি? যা-হোক তবু এটা মন্দের ভালো। কিন্তু ব্যক্তিত্ব কি আর কোনদিন ফিরে পাবেন না? বুঝতে পারছেন না যে, আমির খাঁর পরামর্শ মত চললে আবার একটা বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে?

স্পষ্ট কথা বলার জন্য নিজের লোকের উপরও হাত দিতে ইতস্তত

করেন নি আমির খাঁ। কাশ্মীরের সিপাহশালারের পদ থেকে আসাদ ইয়ার খাঁকে হটিয়ে সেখানে সফদর জঙ্গকে বসিয়েছেন তিনি। নয়মাস যাবৎ মাইনে দেওয়া হয় নি সামসির সিনদাগ ফৌজকে। মাইনে না দিয়েই বাদশাকে দিয়ে তাদের বরখাস্ত করিয়েছেন আমির খাঁ। বাদশার বুদ্ধিসুদ্ধি নেই নাকি ? ফৌজেদের গায়ে হাত দিতে আছে ? কেল্লাটাকেই যদি একদিন ঘিরে ধরে তারা ?

বাদশার বহু ভাগ্য যে লালকেল্লাটাকেই ঘিরে ধরে নি তারা। ফৌজেরা রেগে গিয়ে রাস্তার মধ্যে আমির খাঁকে বে-ইজ্জত করে ছেড়েছে। আসাদ ইয়ার খাঁ নিজের ঘরবাড়ি বিক্রী করে তাদের টাকা পয়সা মিটিয়ে দেবার কথা না বললে আমির খাঁকে বোধ হয় খুনই করে ফেলতো।

কিন্তু তবু যদি আমির খাঁর শিক্ষা হয়। শুনছি, দেওয়ানী আমে যা না খুশী তাই বলে বেড়াচ্ছে সে। এমন কি সফদর জঙ্গের উপরও হুকুম করতে কসুর করছে না। নাদির কুলি যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন তখন ইরাণী মুসায়ের আলিকুলি অযোধ্যা গিয়ে পালিয়ে ছিলেন। সেই সময়ে খুব ভাব হয়ে যায় সিপাহশালারের সঙ্গে। দিল্লী এসে সফদর জঙ্গ সবচেয়ে বেশী পেয়ার করছিলেন মুসায়ের আলিকুলিকে। দরবারের বাঈজীকে সাদী করবার পর মুসায়েরের নাকি ফুটফুটে এক মেয়ে জন্মেছে। আলিকুলি সাহেব সখ করে কন্যার নাম রেখেছেন গন্না। সফদর জঙ্গের নাকি খুব পছন্দ গন্নাকে। ঠিক করেছিলেন নিজের ছেলে নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সাদী দেবেন তার। কিন্তু আমির খাঁ নিজের স্বার্থের জন্য হুকুম করেছেন যে, নবাবজাদার সাদী দিতে হবে আমির ইশাক খাঁর বোন বাহু বেগমের সঙ্গে। হুকুম শুনে নাকি খুব একটা খুশী হন নি সুবেদার সাহেব। তবে হুকুমের অন্যথাও করেন নি।

ইরাণী শয়তানটার ঔদ্ধত্য সৌজন্যের সীমাও অতিক্রম করে গেছে। দরবারে বাদশাকে পর্যন্ত কুর্ণিশ জানায় না সে। নাজির রজ আফজুন এতে আপত্তি করায় আমির খাঁ নাকি ক্ষেপে গিয়ে রজ আফজুনকে

বরখাস্ত করবার জন্য বাদশাকে চাপ দিচ্ছে। সত্যি এমন ব্যক্তিত্বহীন বাদশা দেখিনি। তাঁর নিজের কোন একটা মতামত নেই? লোকে তাঁকে দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করাবে? একবার একটু হুম্‌কি দিয়েও উঠতে পারেন না?

কয়েকদিন পরে বাদশাকে আবার মমতাজ মহলে দেখলাম। তেমনি বিষণ্ণ, তেমনি শীর্ণ, তেমনি বিশুষ্ক। কিন্তু এবার যেন তাকে কেমন রাগত রাগত দেখাচ্ছে। মমতাজ মহলে ঢুকেই তিনি রজ আফজুনকে ডেকে পাঠালেন। আমি উৎকর্ণ হয়ে আমার মহল থেকে মালেকা-ই-জামানীর মহলে কান পেতে রইলুম। রজ আফজুন হারেমেই ছিলেন। বাদশার হুকুম পেয়ে ছুটতে ছুটতে চলে এলেন। মাটি ছুঁয়ে শাহেন-শাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললেন: বান্দাকে তলব করছেন জঁাহাপনা?

ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল বাদশার। বললেন: হ্যাঁ, জনাব।

—হুকুম করুন খোদাবন্দ্।

—আমির খাঁকে নিয়ে কি করা যায় বলুন দেখি?

—সত্যি জঁাহাপনা, আমির খাঁ সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন।

—এমনি হলে আমি তক্‌তে তাউসই ছেড়ে দেব জনাব।

—সেকি বলছেন! দুনিয়ার মালিক শাহেনশা কেন তক্‌তে তাউস ছেড়ে দেবেন?

—তাহলে কি করব?

—একটা উপায় বের করতে হবে।

—কি উপায়?

একটু ইতস্তত করে রজ আফজুন বললেন: উপায় আছে জঁাহাপনা। তবে কিনা যদি গোস্তাকী না নেন তো বলব—সে উপায়ের কথাটা একান্ত গোপনে খোদাবন্দ্‌কে জানাতে হবে।

অর্থাৎ মালেকা-ই-জামানীর সামনেও রজ আফজুন সেকথাটা বলতে চান না।

বাদশা নাজিরের ইঙ্গিত পেয়ে একটা উদ্দেশ্যমুলক দৃষ্টি নিয়ে মালেকা-ই-জামানীর দিকে তাকালেন। মালেকা-ই-জামানীকে দেখলুম একটু অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জা পেয়েছেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। রজ আফজুন তাঁকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললেন : এ বান্দার গোস্তাকী নেবেন না বেগম সাহেবা। কথাটা খুবই গোপনে বলা প্রয়োজন।

মালেকা-ই-জামানী বাইরে চলে এলে ফিস্‌ফিস্ করে বাদশার কানে কানে নাজির যেন কি বললেন-। সে-কথাটা না শুনতে পেয়ে একটা অসহ্য কৌতূহলে নিজের মধ্যে অস্থির বোধ করতে লাগলাম আমি। রজ আফজুন কি পরামর্শ দিলেন বাদশাকে? আমির খাঁকে ধমকে দেবার পরামর্শ কি?

কিন্তু পরদিন সকালবেলাতেই যে সংবাদ পেলাম তাতে বাদশার উপর হাড়ে হাড়ে চটে উঠলাম। জানতুম নিজের ব্যক্তিত্ব বাদশা কোনদিনই জাহির করতে পারবেন না। আমির খাঁকে ধমকে দেওয়া তো দূরস্থান—তাকে একটু তিরস্কারও করেন নি। বরং ফতোয়া জারি করে ঘোষণা করছেন যে—নাজির রজ আফজুনকে হারেম থেকে বরখাস্ত করা হোল। তোবা! তোবা! আর কোন কিছু শুনবার জন্য অপেক্ষা না করে শিষ মহলে ছুটে গিয়ে ঠাণ্ডা পানির ফোয়ারা গায়ের উপর ঢেলে দিলাম। যমুনার স্নিগ্ধ জলে দেহের এ জ্বলুনিটা যদি কমে।

খুব মৌজ করে গোছল করছিলাম। হঠাৎ এমন সময় সমস্ত হারেম ভরে চাপা গুঞ্জরণ শুনতে পেলাম যেন। মনে হল দেওয়ানী আমেও একটা গোলমাল চলছে। তাড়াতাড়ি শিষমহল থেকে বেরিয়ে এসে মমতাজ মহলের দিকে ছুটলাম। দেখি কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে আসছে রহিমা বাঁদীও। আমায় দেখে বিস্ফারিত নেত্রে সে বলল : বেগম সাহেবা দেওয়ানী আমে এইমাত্র খুন হয়ে গেল।

খুন! চমকে উঠে থ'বনে গেলাম যেন। কে খুন হোল?

রহিমা বলল : আমির খাঁ। দরবারে ঢুকবার মুখে কে যেন খাঁ সাহেবের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েছে।

আল্লা মেহেরবান!

নাজির রজ আফজুনের বাদশাকে গোপনে পরামর্শ দেবার অর্থ এতক্ষণে বুঝলাম। অতি বাড় বাড়লে লোকের এমনিই পরিণতি হয়।

॥ ৮ ॥

খুদা মেহেরবান। হিন্দুস্থানের মালিক আমাদের বাদশাকে তিনি এতদিনে কিছুটা সুমতি দিয়েছেন। কয়েক বৎসর হয়ে গেল তওফা-ওয়ালীটার ঘরে আর যান না বাদশা। হারেমের মধ্যেও খবসুরত জেনানা নিয়ে সে হৈ হুল্লোড় আর নেই। বরং কুরাণ-শরিফ পাঠ করে ফকির দরবেশদের নিয়ে সময় কাটান তিনি। কিন্তু কর্মক্ষমতা আর ফিরে পাননি। কেমন যেন সব কাজেই গাফিলতি আর গাফিলতি।

খুদা মেহেরবান, কিন্তু খুব একটা খুশমেজাজ নয় এখনো আমাদের উপর। তা যদি হোত, তাহলে আমাদের ঘরেই আমরা জাঁহাপনার একজন উত্তরাধিকারী পেতাম! তুনিয়ার মালিকের তেমন ইচ্ছা নেই। আমাদের হজরত মালেকা-ই-জামানীর একটা বাচ্চা হয়েছে। কিন্তু সে লেড়কী। তা হোক, তবু আমাদের তুজনেরই তাকে নিয়ে সময় কেটে যায়। লেড়কীর নাম দিয়েছি হজরত বেগম। হজরত যে দেখতে খুবই খবসুরত হবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন এই মোগল হারেমে তাকে ঠিকঠাক করে গড়ে তুলতে পারলে হয়। আগে বাদশার ঘরের শাজাদীদের জীবন যৌবনের কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু এখন আছে। 'শাজাদীদেরও সাদী দেওয়া যায়। সেই জন্যেই যত্নের ক্রটি নেই আমার আর মালেকা-ই-জামানীর। শাজাদীর মত তাকে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু মানুষের মত জীবনটাকে সে যাতে বুঝতে পারে সে ব্যবস্থার ক্রটি করলেও চলবে না।

হজরতের জন্মের পর থেকেই শাহেন শা জেনানা মহল একেবারে ত্যাগ করেছেন দেখছি। অধিকাংশ সময়ই কাটাচ্ছেন ফকির দরবেশ-

দের নিয়ে। দেওয়ানী আমে বসেন বটে, কিন্তু কাজকর্ম কিছুই করেন না। ওয়াজীর কামরুদ্দিন যেমন ছিলেন তেমনি আছেন। কিছু করবার তার হিম্মত নেই, ইচ্ছাও নেই। আমির খাঁকে সরিয়ে দিয়েও কোন ফয়দা হয়নি। চারদিকেই বিশৃঙ্খলা।

রহিমার কাছে একটা মজার কাণ্ড শুনলাম। বাদশার কি তাহলে সত্যই তুনিয়ার ব্যাপারে একটা বিরাগ জন্মেছে নাকি? হারেমের রত্ন ভাণ্ডারের পাহারাদার বকসারি ফৌজ নিজেই ছাদ ফুটো করে ঢুকেছিল ঘরে। কোন এক বেগম সাহেবার রত্নকণ্ঠ নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে। ঘর খুলে আর এক পাহারাদার কাণ্ড দেখে অবাক। বকসারি ফৌজটাকে ধরে এনে সে সটান বাদশার কাছে হাজির। আগের দিনের বাদশা হলে সঙ্গে সঙ্গে গর্দান নিয়ে নিতেন। কিন্তু আমাদের শাহেন শা শুধুমাত্র ছোট্ট করে একটা ধমক দিয়েছেন তাকে: আরে নিমকহারাম বে-আদপ, পাহারাদার হয়ে চুরি করবার আর জায়গা পেলিনে?

বক্সারী ফৌজটা একটা ভারি মজার জবাব দিয়েছে। সে বলেছে: খোদাবন্দ্ এক বছরের মাইনে বাকি। আমার পাওনা টাকা রয়েছে এখানে। আমি তবে চুরি করতে যাব কোথায়? চুরি করলে শাহেন শার হারেমেই করা উচিত।

শাহেন শা নাকি বক্সারী ফৌজটার কথা শুনে আর রাগ করেননি। বেশ খানিকক্ষণ হেসেছেন। নোকরিতো তার খানই নি উল্টে বার মাসের মাইনে মিটিয়ে দিয়ে তাকেই রেখেছেন পাহারাদার করে। তোবা! তোবা! এ করে কি রাজ্য চলবে?

বাদশার পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্যায় হোল প্রশাসনের দিকে না তাকানো, তা জেনানা নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করেই তিনি তাকে অবজ্ঞা করুন, অথবা দরবেশ নিয়ে ব্যস্ত থেকেই করুন। বাদশা বাদশা। তাঁর কাজ শাসন করা। শাসন কাজে অবহেলা দেখালেই তার গুনাহ্।

আবার শুনি গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে।

বাদশা যদি এমন অপদার্থতার পরিচয় দিতে থাকেন, তাহলে তার ফল হবে কি ? হিন্দুস্থানে খবর এসেছে, শাহ নাদিরকুলি আর জীবিত নেই। হিজরী ১১২৫ সালের জেল্কদ মাসে কিজিবিলাস আততায়ীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। শাহের আফগান ফৌজেরা আহমদ্ আবদালীকে তাদের সর্দার করে কান্দাহারে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আবদালী হয়েছে—শা আহমদ শা।

লোকটার সম্পর্কে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। যা শুনছি, তাতে মনে হচ্ছে, সারা আফগানমুলুক জয় করে মামুদ শার মত একদিন হিন্দুস্থানের দিকেও সে হাত বাড়াতে পারে। স্বয়ং নাদির কুলিরই নাকি আহ্মদ সম্পর্কে বেশ উচ্চ ধারণা ছিল। সবার সামনেই তিনি নাকি বলতেন যে, ইরাণ, তুরাণ আর হিন্দুস্থানে আহমদ আবদালীর মত দক্ষ এবং চরিত্রবান পুরুষ অন্যত্র তিনি কোথাও দেখেন নি। তিনিই নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, আবদালী একদিন পাদিশা হবেন। লাহোরের দরবেশ শা মহম্মদ সবিরও নাকি অনেক আগেই আবদালীর কপালে পাদিশার চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তিনিই নাকি মাটির আসনে বসিয়ে, তাকে পাদিশা বলে ঘোষণা করে, নাম দিয়েছেন দুর্‌রাণী পাদিশা অর্থাৎ পাদিশাদের মুক্তা। কিন্তু দিল্লী দরবার এসব কোন খোঁজখবর রাখেন বলে মনে হয় না। নইলে বাদশা এমন উদাসীন হয়ে থাকতে পারেন ? বাদশার এ উদাসীনতায় অনেকেরই বেশ সুবিধে হয়েছে। হারেমে ঐ বাঈজীটাতো নাজির জাবিদ খাঁকে নিয়ে যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে। আমীর ওম্‌রাহদেরও পোয়া বার। যার যা খুশী তাই করছেন। মোগলদের হাতে হিন্দুস্থানের তক্‌তে তাউস আর কতদিন থাকবে, তা আল্লাতালাই জানেন।

বাদশা মমতাজ মহলে আসা আবার বহুদিন বাদ দিয়েছেন বলে মালেকা-ই-জামানীর কক্ষে আমার এখন যাতায়াতে কোন সঙ্কোচ নেই। এখন নতুন আকর্ষণ হয়েছে মালেকা-ই-জামানীর কন্যা হজরত বেগম। তাকে নিয়েই এখন সময় কাটাই। দেখতে সত্যই একটা

ডানাকাটা হুরী হবে যেন। মেজাজও হয়েছে তেমনি। যেমন চঞ্চল, তেমনই জেদী। তাকে সামলাতে আমরা হিমসিম। মালেকা-ই-জামানী মাঝে মাঝে রাগ করেন। আমি বলি : মোগল বাদশার কন্যা, মেজাজ মর্জিতো হবেই। হাজার-হোক শা'জাদীতো! মালেকা-ই-জামানী মুখ বাঁকিয়ে বলেন : তবু যদি একটা লেড়কা হোত! শাজাদা হল কিনা একটা তওফাওয়ালীর বেটা।' আমি বলি : তা হোক। তবু মালেকা-ই-জামানীর লেড়কী আর তওফাওয়ালীটার বাচ্চার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকবেই।' মালেকা-ই-জামানী বলেন : কী হবে তাতে। শেষ পর্যন্ত তো ঐ তওফাওয়ালীটার বাচ্চারই খিদমদ খাটতে হবে।' আমি বলি : ষাট্! ষাট্। বালাই। তা হতে যাবে কোন দুঃখে। আমার মন বলে এ মেয়ে সামান্য হয়ে থাকবে না। সাদী হবে কোন শাহেন শার ঘরে। আমাদের শাহেনশার মত এমন কাপুরুষ হবে না সে। সত্যই সে হবে জাহান মালিক শা জাহান।

১৩ই রমজান। হিজরী ১১২৫ সাল। হজরত বানুকে নিয়ে মালেকা-ই-জামানীর কক্ষে আদর করছিলাম। হঠাৎ রহিমা বাঁদী এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মমতাজ মহলে ঢুকলো। ঢুকেই আমাদের সালাম জানিয়ে বলল : জানেন বেগম সাহেবা, দেওয়ানী আমে খুব বড় দরবার বসেছে আজ।

লালকেল্লার কোন অংশে দেওয়ানী আম বলে কোন দরবার আছে, একথাটা যেন ইদানিং ভুলেই যাচ্ছিলাম। সেখানে আজকাল আর কোন দরবার বসে না। রাজকার্যই নেই তো তার আবার দরবার বসবে কি। দেওয়ানী খাসেরও সেই অবস্থা। এখন আর বাঈজীর আসরও বসে না সেখানে। দেয়ালে বোধহয় ধূলো জমে আছে।

আমি রহিমাকে বললুম : তা হঠাৎ এদ্দিন পরে দেওয়ানী আমে দরবার? ব্যাপার কি? বাদশা আছেন নাকি?

রহিমা বলল : বলেন কি বেগম সাহেবা! বাদশা ছাড়া দরবার হয়?

বিদ্রূপ করে বললাম : তবু ভাগ্যি বাদশা দরবারে গেছেন। তা কি হয়েছে ?

—নাদির কুলির মত কে এক ডাকতু আবার হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমায় হানা দিয়েছে।

এতক্ষণ যে বিদ্রূপের মর্জিটা ছিল, এ খবর শোনা মাত্রই সেটা যেন কর্পূরের মত উবে গেল। আবদালীদের আহমদের নাম শুনছিলাম কিছুদিন ধরেই। নাদির কুলির মৃত্যুর পর কান্দাহারের আফগানদের দিয়ে সে নতুন এক রাজ্য গঠন করেছে। তাহলে আহমদ আবদালাই নাকি ? হিন্দুস্থানের যা অবস্থা, আবার যদি কেউ এসে হানা দেয়, তাহলে দিল্লীর লাল কেল্লাটা পর্যন্ত গুঁড়িয়ে যাবে।

খবর নিতে হল। নাজির রজ আফজুনের কাছেই খবরটা জানলুম। আমার ধারণাই ঠিক। আহমদ আবদালীই হিন্দুস্থানে এসে পৌঁচেছেন। পাঞ্জাবে লাহোর দখল করে নিয়েছেন তিনি। কান্দাহার জয় করে গজনীর দিকে তিনি অগ্রসর হবার সময়েই সীমান্ত প্রদেশের সিপাহ-শালা দিল্লীর দেওয়ানীতে খবর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দরবার তখন নেইই তো সে সংবাদে কান দেবে কে ? আবদালী কাবুল দখল করে পেশোয়ারে এসে পৌঁছালেও দিল্লী-দরবারের টনক নড়েনি। অবশেষে তিনি লাহোরের দিকে রওনা হলে দিল্লীর হুঁশ হয়েছে।

আমি রজ আফজুনকে বললুম : কি হবে তাহলে ?

হতাশ ভঙ্গী করে রজ আফজুন বললেন : খুদাতালা জানেন কি হবে। আলমগীর বাদশার আমল থেকে হারেমে আছি। এমন অবস্থা কখনো দেখিনি। আল্লা এখন টেনে নিলেই বাঁচি।

—বাদশা কি করবেন ? একটা বাধাটাধা দেবেন তো ?

—কিছু তো একটা করতেই হবে। শুনছি ১৩ই রমজান বাদশা স্বয়ং দিল্লী থেকে বেরোবেন।

আল্লা মেহেরবান। বাদশা যে বেঁকেটেঁকে বসেননি, এটাই নসিব। হারেম থেকে তো তিনি বড় একটা বেরুতে চান না। হঠাৎ যে

এতটা সাহস করে ফেলবেন সেটা ভাবাই যায় না। খুদাতালা তাঁকে এখনো অন্তত সুমতি দিন।

সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম বাদশার যুদ্ধযাত্রা দেখবার জন্য। কিন্তু ১২ই রমজান তারিখে খবর পেলুম, বাদশা নিজে বেরুবেন ৪ঠা শওয়াল। এখন ছোটখাটো একটা বাহিনী পাঠিয়ে দিচ্ছেন পাঞ্জাবের দিকে। শুনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লুম। এ টালবাহানার অর্থ, শেষ পর্যন্ত তিনি হয়তো আর বেরুবেনই না।

আম দরবারও হয়েছে তেমনি। যেমন বাদশা তেমন তাঁর আমীর ওম্‌রা। একবার এগুচ্ছেন তো আর একবার পেছুচ্ছেন। এখনো তাঁরা ঠিকই করতে পারছেন না কি করবেন, অথবা করবেন না। অভিজ্ঞ সিপাহশালারেরা নাকি বলেছেন ঃ বাদশা স্বয়ং আবদালীকে বাধা দিতে না গেলে অসুবিধা হবে। কিন্তু হবু সিপাহশালারেরা বলেছে, আফগান শেয়ালটাকে বাধা দেবার জন্য স্বয়ং শাহেনশার যাবার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ মজার কথা এই যে, এইসব সিপাহশালারেরা কোনদিন যুদ্ধ কাকে বলে জানে না।

এতদিনে বোধহয় ওয়াজীর কামরুদ্দিনের টনক নড়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আবদালীকে ঠোকাতে হলে স্বয়ং বাদশাকে যেতে হবে। লাহোর না যান অন্তত কাছেপিঠে কোথাও গিয়ে শিবির ফেলে থাকুন। কাছেপিঠে মানে পাণিপথ বা কারনাল।

কারনালের নাম শুনলে আমাদের বুক কাঁপে। সেখানেই তো নাদির কুলি মোগল বাদশাকে চূড়ান্ত বে-ইজ্জত করেছিলেন। পানিপথ বরং মন্দ হয়। পানিপথের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মোগলদের সৌভাগ্য। হিজরী ৯০৪ সালে বাবুর বাদশা পানিপথেই দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে কোতল করে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহী কায়েম করেছিলেন। হিজরী ৯৩৪ সালে নতুন করে এখান থেকেই আবার মোগল বাদশাহীকে ঝালিয়ে নেন আকবর বাদশা। পানিপথ মোগলদের সৌভাগ্য। বাদশা যদি যান, তবে যেন পানিপথেই তাঁর শিবির ফেলেন।

অপদার্থ দরবার। বাঈজী, সিরাজী আর বিবিদের পেছনেই সব টাকাকড়ি ব্যয় করে বসে আছে। এখন চটপট করে একটা সেনাবাহিনী তৈরী করে যে পাঞ্জাবের দিকে ফৌজ পাঠাবে, সে ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। মির বকশী তহবিল ঝেড়েপুঁছে ষাট লক্ষ টাকার মত সংগ্রহ করেছেন। সেই নিয়েই যা-হোক কোনরকমে একটা বাহিনী তৈরী করা হয়েছে। সংখ্যায় সেটা খুব কম নয়—প্রায় দুই লক্ষ ফৌজ। কিন্তু কতদূর কাজ করতে পারবে সেটাই কথা।

বাদশার ভীমরতি ধরেছে। এই বিরাট বাহিনীর শিপাহশালার করে পাঠাচ্ছেন কিনা ওয়াজীর কামরুদ্দিনকে। যে ব্যক্তি ঘরের বিবি আর বোতলের সিরাজী ছেড়ে জন্মে কোনদিন বেরোয় নি, যে লোক নাদির কুলির আক্রমণের সময় দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে ছিল, তাকে কিনা দেওয়া হয়েছে এতবড় একটা ফৌজের দায়িত্ব! শেষ পর্যন্ত এ-বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌছায় কিনা তাইবা কে জানে। কামরুদ্দিনের সঙ্গে যাচ্ছেন অযোধ্যার সুবাদার মির অতিস সফদর জঙ্গ, জয়পুরের রাজা ঈশ্বরী সিং, আর কাবুলের সুবাদার নাসির খাঁ। এরাই যা ভরসা। নইলে ওয়াজীর কামরুদ্দিন যুদ্ধ করবেন, এটা বিশ্বাস করিনে। আল্লাতালা এখন মুখ রাখলে হয়।

মোগল বাহিনী দিল্লী ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। এখন দেখা যাক বিদেশী লুঠেরাকে ওরা বাধা দিতে পারে কি না।

কিন্তু ঐ যে বলেছি, ওয়াজীর কামরুদ্দিনের কম্ম নয় যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া —ঠিক তাই। দিল্লী থেকে ষোল মাইল উত্তরে নারেলা গিয়ে পৌছেই এ-বাহিনী থেমে পড়েছে। সংবাদ পাওয়া গেছে, আবদালী লাহোর দখল করে নতুন করে ফৌজ সংগ্রহ করে সেখানে কুচকাওয়াজ করাচ্ছেন। সংবাদ শুনেই ওয়াজীরের হয়ে গেছে। তিনি দিল্লীর দেওয়ানীতে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিয়েছেন, স্বয়ং বাদশা বা শাজাদা আহমদকে যেন তড়ি-ঘড়ি পাঠানো হয়। নইলে বাদশাহী ফৌজের মনোবল একদম থাকবে না। তোবা! একটা তওফাওয়ালীর ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে যুদ্ধ জয় হবে,

নইলে হবে না? মোগল আমীরওমরা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারে না? আকবর বাদশার সময় দিকবিদিক জয় করলো যে মোগলাই ফৌজ, তার সবগুলোতেই তিনি স্বয়ং গিয়েছিলেন? না কোন শাজাদাকে পাঠিয়েছিলেন? মানসিংহ বাংলা জয় করেন নি? খান-খানান মুনিম খাঁ বাংলা বিহার উড়িষ্যায় অভিযান চালান নি? উধম খাঁ আর পীর মহম্মদ মালব জয় করেন নি? তাহলে? সবই গেছে। মোগলদের আর কিছু নেই। এখন এই লালকেল্লাটা কবে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায় তাই দেখবার অপেক্ষা।

তওফাওয়ালীটা বোধহয় খোয়াব ঘরে বসে বসে মুখ টিপে হাসছে। তক্‌তে তাউসের পথ তো তার ছেলের জন্য পরিষ্কার হয়ে গেল। বাদশা নিজে না গিয়ে ঐ তওফাওয়ালীর বেটা আহমদটাকেই বাদশাহী ফৌজের নেতৃত্ব করবার জন্য পাঠাচ্ছেন। ২২শে জেল্কদ। আহমদ রওনা হয়ে গেছে—নারেলার দিকে। যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আর আমার কোন আগ্রহ নেই। একটা তওফাওয়ালীর ছেলে যদি মোগল সাম্রাজ্যের ইজ্জত রক্ষা করে, তার চেয়ে বরং লুঠেরারাই এ-দেশটা দখল করে নিক।

সংবাদ রাখবার আমার আর কোন আগ্রহ নেই। তবু রাখতে হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ১৯ দিনের মধ্যে বাদশাহী ফৌজ কারনাল অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে। নয় বছর আগে কারনালের বিপর্যয়ের কথা মনে করে বাদশাহী ফৌজ আর সেখানে দাঁড়ায়নি। তারা এগিয়ে গেছে সারহিন্দের দিকে। অবশ্য সেখানেও তেমনই অবস্থা। সার-হিন্দের ফৌজদার আলি মহম্মদ রোহিলা ভয়ে ভয়ে নিজের ফৌজদারী ছেড়ে বেরিলির দিকে পালিয়ে গেছেন। পাঞ্জাব আর দিল্লীর মধ্য প্রকৃতপক্ষে এখন কোন প্রতিবন্ধক নেই। হায়রে কাপুরুষের দল!

সারহিন্দেও অপেক্ষা করেনি বাদশাহী ফৌজ। ওয়াজীর সারহিন্দ দুর্গে নিজের হারেম রেখে, আহমদকে নিয়ে শতদ্রু পাড়ি দিয়ে ভারাওলিতে গিয়ে পৌছেছেন। অপদার্থ মোগল সেনাপতিরা!

পেছনের যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকেও ফিরে তাকাবার সময় হয়নি তাদের ? ফলে যা হবার তাই হয়েছে। আবদালী তাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছে। পেছন দিয়ে ঢুকে পড়ে, সারহিন্দ দখল করে ওয়াজীরের হারেমকে ধরে নিয়ে গেছে নিজের শিবিরে। ২৩শে জেলহজ্জ সে সংবাদ পেয়ে পড়ি কি মরি করে বাদশাহী ফৌজ পেছনে ছুটে এসে মানপুরে ছাউনি গড়েছে। এক একজন রুস্তম-ই-হিন্দ সেনাপতি আর কি! এখানে এসে বাদশাহী ফৌজ আবদালীর মুখোমুখি পরিখা খুঁড়ে বসে আছে। পালিয়ে যে আসেনি দিল্লীতে এই ভাগ্যি! এখন সংবাদের জন্য বসে আছি। দেখি কি হয়।

৭ই মহরম যুদ্ধের খবর পেলাম। ওয়াজীর আবদালীর পাঁচ গুণ বেশী ফৌজ নিয়ে গেলেও কিছুতেই ঐ আফগানটাকে আক্রমণ করবার সাহস পাননি। তিনি ফন্দিতে ছিলেন চারদিকের জমিদারেরা যদি আবদালীকে খাবার দাবার সরবরাহ না করে, তবেই সে ঘায়েল হবে। যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যেতে হবে তাকে। সে গুড়ে বালি। উল্টে নিজেকেই খাদ্যের অভাবে পড়ে তড়িঘড়ি যুদ্ধ আরম্ভ করতে হয়েছে। কাপুরুষের ভাগ্যে যা হয়, ওয়াজীরেরও তাই হয়েছে। কোমরে কামানের গোলা লেগে দুনিয়ার খেলা শেষ। তবে যাবার আগে নিমক হারামী করে যাননি তিনি। পুত্র মুইনকে বলে গেছেন, 'আমি তো চললাম। বাদশার কাজ এখনো হয়নি। আমার মৃত্যুর কথা ছড়িয়ে পড়বার আগেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়।'

চোখে পানি নিয়ে আব্বাজানের হুকুম মেনে নিয়েছে মুইন। খুদা মেহেরবান! আবদালীটা হেরে পালিয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, লড়ে গেছে বটে। মাত্র বার হাজার ফৌজ নিয়ে ষাট হাজার মোগলাই ফৌজকে হেস্ত নেস্ত করে গেছে। রাজপুতেরা তো তাদের ছোট কামান আর দামামা ফেলেই পালিয়ে গেছে। তবে মুইন সাহস হারায়নি কখনো। মরিয়া হয়ে লড়েছে। অবশেষে সফদর জঙ্গের কামানের গোলার কাছে তিষ্ঠাতে না পেরে আফগানরা পালিয়েছে।

সংবাদ শুনে হাজারো চেরাগ জ্বলে উঠে লালকেল্লা রোশনাই হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সফদর জঙ্গকে নিয়ে আহমদটা আফগান-দের তাড়াতে তাড়াতে লাহোরের দিকে এগিয়ে যাবে। খুদা ছোটলোকের উপরই খুশ মেজাজ হলেন শেষ পর্যন্ত? এমনিই তো হারামী তওফাওয়ালীটাকে এঁটে ওঠা যাচ্ছে না, এবার আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবে। বাদশা এখন নিশ্চয়ই আবার রোজ যাতায়াত আরম্ভ করবেন খোয়াব ঘরে?

আমরা খবর নিতে লাগলাম, কখন চিরাগী রোশনাইয়ে বাদশা ঐ তওফাওয়ালীটার কাছে খোয়াব ঘরে যান। কিন্তু খবর নিয়ে যেন তাজ্জব বনে গেলুম। বাদশা খুব অসুখ করে তস্‌বিখানায় পড়ে আছেন। কখন যে তাঁর অসুখ করল কে জানে। হেকিমেরা তাকে ঘন ঘন দেখছেন। বাদশা নাকি শাজাদা আহমদকে তাড়াতাড়ি দিল্লী ফিরে আসবার জন্যে হুকুম করেছেন। অবস্থা ভাল নয়।

সংবাদ পেয়ে এতদিন পরে সত্যি মনটার মধ্যে কেমন যেন হাহাকার করে উঠলো। বাদশা আমাদের, বিশেষ করে আমাকে প্রচণ্ড অবজ্ঞা করেছেন। আমার বিবাহিত জীবনের কোন মূল্যই থাকেনি হারেমের মধ্যে। এ জন্যেই বাদশার উপর অভিমানের আমার অন্ত ছিল না। তাঁর সম্পর্কে যা-তা বলতেও অনেক সময় ইতস্তত করিনি। এখন তার অসুস্থতার কথা শুনে কেমন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটা চিন্তাও ঢুকে গেল মনের মধ্যে। সত্যই যদি বাদশার কিছু একটা হয়? তবে? যাই হোক, এতদিন তবু বেগমের মর্যাদা নিয়ে ছিলুম। বাদশার কিছু হলে, বাদশা হবে ঐ তওফাওয়ালীর বেটা আহম্মদটা। তখন হয়তো মমতাজ মহল ছেড়ে বাঁদীদের আস্তানায় গিয়ে থাকতে হবে আমাদের! মনে মনে আল্লাতালার কাছে কেঁদে পড়লুম। বললুম: খুদাতালা, ক্ষমা কর বাঁদীদের। বাদশার যেন কোন ক্ষতি না হয়। যা-ই হোক, ঐ তওফাওয়ালীটার খিদমৎ যেন না খাটি কখনো। আল্লা মেহেরবান! মুখ তুলে তাকাও দুনিয়ার মালিক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চরম দুর্ঘটনাই ঘটে গেল। আল্লাতালা আমাদের কাতর প্রার্থনা শুনলেন না। জানিনা খুদাতালার কাছে কি গুনাহ্ করেছি। তিনি শাস্তিই দিলেন। কসুর মাপ করলেন না। হিজরী ১১২৬ সাল। ৮ই শফর। শাহেন শা চোখ বুজলেন। ইস্রাফিল এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। শাহেন শা বেহেস্তে শান্তি লাভ করুন। মমতাজ মহলে হাহাকার করে লুটিয়ে পড়ে আমরা কেঁদে উঠলুম। যত অবহেলাই আমাদের করুন না কেন তিনি, এ দুনিয়াতে আমাদের যে আর কেউ নেই! হায় আল্লা!

॥ ৯ ॥

৩০শে মহরম। হিজরী ১১২৬ সাল। লালকেল্লার প্রত্যেকটি দরওয়াজায় তোপ দাগা হচ্ছে। নহবতখানায় সারাদিন সানাই বেজে চলেছে। ছত্তচৌকের বাজারে আজ প্রচণ্ড ভিড়। আমীর ওম্‌রা সবাই এসে দেওয়ানী আমের দরবারে ভিড় করেছে। দেখতে পাচ্ছি, খোয়াব ঘরে সেই তওফায়ালীটার চারদিকে আজ অসংখ্য বান্দা বাঁদীর ভিড়। হাসি মুখে সমস্ত হারেম প্রাঙ্গনটাতে জাবিদ খাঁ ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আজ ওদের সবারই আনন্দের দিন। শাজাদা আহমদ শাহেন শা হয়ে দিল্লীর তক্‌তে তাউসে বসছেন আজ। মসজিদে মসজিদে নতুন শায়ের নামে খুত্‌বা পাঠ হচ্ছে। শুধু মমতাজ মহলে বিষন্ন ছায়া। একটা বাঁদীও আজ আমাদের মহলে নেই। সব ব্যস্ত খাসমহলের বৈঠকখানায় উৎসব দেখতে। নিরবে হজরত বেগমকে নিয়ে বসে আছি আমি আর মালেকা-ই-জামানী। এ জীবনে আমাদের আর কোন দিনই সুখ হলনা। হজরত মহম্মদ শার জীবদ্দশাতে তাঁর সাদী করা বেগম হয়েও অবজ্ঞায় দিন কাটিয়েছি। তাঁর মৃত্যুর পর নসিব খুসমেজাজ হল ঐ তওফাওয়ালীটার উপর। এখন হয়তো বেগম মহল

ছেড়ে আমাদের বাঁদী মহলেই চলে যেতে হবে। খুদাতালার কছে কি গুনাহ্ করেছিলাম তা তিনিই জানেন।

আমার নিজের জন্য দুঃখ নেই। দুঃখ সইতে সইতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। দুঃখ হয় মালেকা-ই-জামানীর জন্য। আমিতো জানি কোন অভিজাত ঘরের কন্যা তিনি। সমস্ত মোগল হারেমে আজ তাঁর মত কে আছে। অথচ সব চাইতে অবজ্ঞায় তিনিই আজ দূরে পড়ে আছেন এক কোণায়। তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না আমি। চোখে করুণ বিষাদ। মুখে নির্বাক মেঠান। আমি অনুভব করতে পারছি, অন্তরে তাঁর কি দুর্বিসহ যন্ত্রনা তাঁকে কুড়েকুড়ে খাচ্ছে। তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না বলেই চুপ করে বসে আছি। হারেমে উৎসবের কলমুখরতা যেন কানে এসে বিঁধছে।

রহিমা বাঁদী বোধহয় উৎসব দেখতেই এতক্ষণ মমতাজ মহলের বাইরে ছিল। মানুষ কত নিমকহারাম হতে পারে রহিমাই তার প্রমাণ। আমাদের দুর্ভাগ্য আজ। নতুন সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে খাসমহলের খোয়াব ঘরে। সে তাই তওফায়ালীটার করুণা কুড়াবার জন্য সেখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে। বড় রাগ হল। তাই ধমকে উঠে বললুম ঃ উল্লুকীটা এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?' আজ আর আমাদের ভয় পায়না বোধহয় রহিমা বাঁদী। তাই আমার ধমক খেয়েও দাঁত বার করে হাসতে হাসতে সে বলল ঃ নবাব কাদিশা হজরত কিব্‌লা-ই-আলমের মহলের ছিলুম বেগম সাহেবা।

—কিব্‌ল-ই-আলম! সে আবার কে ?

চোখদুটো বড় বড় করে অবাক ভঙ্গী দেখিয়ে রহিমা বলল ঃ সে কি বেগম সাহেবা! আপনি জানেন না ? নতুন শাহেন শার আম্মাজানের নাম হয়েছে কিব্‌লা-ই-আলম।

কোন কথা থাকলো না আর আমার মুখে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম ঃ ও!

রহিমা বলল ঃ কিব্‌লা-ই-আলমকে সালামত জানিয়ে এলাম।

রহিমার এ-কথার আর কোন উত্তর দিতে পারলাম না। কে জানে ও আমাদের বিদ্রূপ করেই এ-কথা শুনাচ্ছে কিনা।

সে বলল : খুব উৎসব হচ্ছে বেগম সাহেবা। আপনারা দেখতে গেলেন না?

এ-কথা শুনতেই হঠাৎ দপ করে যেন জ্বলে উঠলাম আমি। বললাম : বেয়াদব কোথাকার! মুখ সামলে কথা বলতে জানিস না। একটা তওফাওয়ালীকে আমরা সালাম জানাতে যাব নাকি?

বোধহয় রহিমা একটু ভয় পেয়ে গেল। বলল : "কসুর মাফ করবেন বেগম সাহেবা। আমি হজরত সাহেবাদেরই বাঁদী। কোন ত্রুটি করে থাকলে মাফ চাইছি।" আমাদের দুজনকেই কুর্ণিশ জানিয়ে সে নিজের কাজে চলে গেল।

মালেকা-ই-জামানী এতক্ষণে মুখ খুললেন। বললেন : সাহিবা মহল তোমার মেজাজ সামলে চলতে শেখ। নতুন জমানা এটা। মনে রেখ এতবড় একটা হারেমে আমাদের পেয়ার করবার মত লোক এখন নেই বললেও চলে। এ-সব যদি উধম বাঈয়ের কানে যায়, সে আমাদের বে-ইজ্জত করে ছাড়বে।

বললুম : কিন্তু আমার এ-সব সহ্য হয় না বেগম সাহেবা।

—সহ্য না করতে পারলেও করতে হবে। নসিব যখন আমাদের উপর বিরূপ তখন আর কি করা যাবে বল?

আমি চুপ করে থাকলাম।

মালেকা-ই-জামানী শূন্য উদাস দৃষ্টিতে আবার হারেমের আকাশটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুটা সময় চুপচাপ কাটলো।

বুকে আমার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। নিজের কক্ষে গিয়ে শুয়ে থাকবো বলে উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই সময় দেখি বৃদ্ধ নাজির রজ আফজুন একটা লাঠিতে ভর করে আমাদের মহলের দিকে আসছেন।

দাঁড়িয়ে ছিলাম। নাজিরকে দেখে আবার বসলাম। রজ

আফজুন কুর্ণিশ ঠুকতে ঠুকতে মমতাজ মহলের উঠানে ঢুকে বললেন: সালাম বেগম সাহেবা। খুদার মর্জিতে তবিয়ত নিশ্চয়ই ভাল? বললুম: খাঁ সাহেব কি আমাদের বিদ্রূপ করবার জন্যে এসেছেন নাকি? আমাদের তবিয়ত এখন ভাল থাকতে পারে?

রজ আফজুন বললেন: বেগম সাহেবা, সেইজন্যই আপনাদের কাছে আসা। আলমগীর বাদশার নিমক খেয়েছি। মোগল বাদশার রক্ত যাদের মধ্যে আছে, তাদের অবজ্ঞা করতে পারি নে। এক পা কবরের উপর দিয়ে আছি—কবে থাকি কবে নেই। আপনাদের দু-একটা কথা বলতে এলাম।

বললুম: বলুন খাঁ সাহেব। আজ দুনিয়াতে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই।

রজ আফজুন বললেন: খুদা মেহেরবান যদি দুয়া করেন তাহলে মানুষের মর্জিতে কি এসে যায়? তবে সাবধানের মার নেই।

—বলুন।

—নয়া জমানা এল সেতো দেখতেই পাচ্ছেন। নতুন শা'র আম্মাজান আপনাদের উপর খুশমেজাজ নন। সাবধানে থাকবেন।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: কি আর সাবধানে থাকব বলুন খাঁ সাহেব।

—সেতো ঠিকই বেগম সাহেবা। কি আর সাবধানে থাকবেন। তবে নিজেদের ধনদৌলত টাকাকড়ি একটু আড়ালে রাখবেন। আমি সন্দেহ করছি প্রথমে সে সবেরই খোঁজ হবে।

—হুম্!

আমি বললুম: মমতাজ মহলে আমাদের থাকতে দেবেন তো নতুন শাহেন শা?

রজ আফজুন বললেন: সে-কথা খুদা জানেন বেগম সাহেবা। তবে মমতাজ মহল থেকে সরালেও বেগম মহল থেকে আপনাদের সরাতে পারবেন না নতুন শা।

—অসম্ভব কি ?

—না, তা হবে না বেগম সাহেবা। তাহলে দিল্লীর তুরাণীরা ক্ষেপে যাবেন না ? তবে নতুন জমানায় ইরাণীদেরই লাভ হল্।

—কেন ?

—কেন, আপনি শুনেননি ? ইরাণী নেতা অযোধ্যার সুবেদার সফদর জঙ্গ যে নয়া উজীর হলেন।

—আচ্ছা !

—তবে কথা কি জানেন বেগম সাহেবা—লোকটা আমির খাঁর মত দুষ্ট নয় এই যা রক্ষা।

—তিনি কি আর আমাদের উপর নজর দেবেন ?

—না দিলেও খুদা আছেন বেগম সাহেবা। মনে রাখবেন, হকের জমানা না হলে তা টিকে থাকে না। বেশীদিন থাকবেও না। আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনা বেগম সাহেবা। হারাম ঢুকেছে হারেমে—জাবিদ খাঁ। সর্বত্র গুপ্তচর লাগিয়ে দিয়েছে। কে কি বলে কে জানে। নাজিরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এবার বাইরে গিয়ে বিশ্রাম নেব। তবে আপনাদের যাতে ক্ষতি না হয় সে চেষ্টা সব সময়ই করে যাব বেগম সাহেবা। এবার আসতে হুকুম হয়।

কুর্ণিশ জানিয়ে বৃদ্ধ রজ আফজুন হারেমের বাইরে চলে গেলেন। আমি আর মালেকা-ই-জামানী দুজনেই মুখোমুখি চুপ করে বসে রইলুম। কেউ কোন কথা বলতে পারলুম না।

তওফাওয়ালীর বাচ্চা গদিতে বসলেই সে কি মোগল বাদশা হয়ে যায় ? তা হয় না। আহমদটাও হতে পারেনি। আমরা জানতুম পরিণতি এই হবে। ও বুর্বকটা কি জানতো যে, একদিন সত্যিই দিল্লীর তক্তে তাউসে সে বসবে ? হঠাৎ বসে মাথার আর ঠিক নেই। তওফাওয়ালীটা নাজির জাবিদ খাঁর সঙ্গে সাট্ করে বলেছে : কুচ

পরোয়া নেই। রাজ্য চালাব আমরা। তুমি ফুর্তি করে যাও।'
আহমদ সেই ফুর্তি করছে।

শুনতে পাই সরাব, সিরাজী, গাঁজা, ভাঙ্, চরস, কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এ-সব সরবরাহ করছে ঐ খোজা জাবিদ খাঁ-টা। সঙ্গে দিচ্ছে যত রাজ্যের খবসুরত ছোটলোক জেনানা। আমাদের স্বর্গত শার আমলে যত না বাজে মেয়েছেলে হারেমে ঢুকেছিল তার চাইতে অনেক বেশী জেনানা ঢুকেছে হারেমে। আর জায়গা হচ্ছে না। খোজাটা কেল্লার কাছে কয়েক ক্রোশ জুড়ে একটা বাগিচা করে দিয়েছে। সে বাগিচা শুধু জেনানা আদমিতে ভর্তি। বাদশা ছাড়া অন্য পুরুষের সেখানে যাবার হুকুম নেই। নেশা করে আহমদ গিয়ে পড়ে থাকছে সেই বাগিচাতে। এদিকে ঐ তওফাওয়ালীটা হারেমের মধ্যে খোজাটাকে নিয়ে বেলেল্লাপনা চালাচ্ছে।

খোজাটা নাকি হয়েছে ছয়হাজারী মনসবদার। দেওয়ান-ই-খাস, আরজি-মুকাররার। বাদশা তাকে ডাকেন নবাব বাহাদুর বলে। নিজের দামামা, নিজের পতাকা, পাল্কী, সব পেয়ে গেছে নবাব বাহাদুর। ওয়াজীর দিয়ে কি হবে? সেই এখন রাজ্য চালায়। তাকে অবশ্য চালায় ঐ তওফাওয়ালী-টা। খোয়াবঘর থেকে দিনরাতই বুদ্ধি পরামর্শ আসছে। তাঁর সম্মানও কম হয় নি। নয়া বাদশা তার নানা নাম দিয়েছেন — নবাব কাদিশা, সাহিবা-উস্-জামানী, সাহিব জিউ সাহিবা, হজরত কিব্‌লা-ই-আলম, এইসব। বাদশার কর্মচারীদের কিব্‌লা-ই-আলমের দেউড়ীতে গিয়ে পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজই করবার উপায় নেই। রাজ্যের মুতালিবের বিচার করে এখন ঐ তওফাওয়ালীটা। দরবারের তারিখ-ই-ওয়ালা নাকি দুঃখ করে বলেছেন: 'হায় আল্লা!' এমন বুর্বক একটা মেয়ে মানুষের হাতেই হিন্দুস্থান চলবে নাকি?

আমাদের উপরও খুব একচোট খবরদারী করে গেছে তওফাওয়ালীটা। আমাদের টাকাকড়ি, গয়নাগাটি, সব বের করে তার হাতে না দিলে সে নাকি বে-ইজ্জত করবে আমাদের। হু! বে-ইজ্জত করলেই হোল আর

কি? আমাদের কিছু বললে তুরাণী আমীরেরা ঝাঁপিয়ে পড়বেনা হারেমের উপর! একটা সিয়াকে উজ্জীর করে তো তুরাণীদের বিরাগ-ভাজন হয়েছে আহমদ। আগে জানা যায় নি। এখন জানা যাচ্ছে। পাঞ্জাব থেকে দিল্লী ফেরার পথে পাণিপথেই নাকি সে সফদর জঙ্গকে ওয়াজীর করেছে। তবু ভাগ্যি নিজাম-উল্-মুল্ক আসফ ঝা কয়েকদিন আগে মারা গেছেন। তিনি এ সংবাদ শুনলে একটা বিরাট বিবাদ আরম্ভ হয়ে যেত।

তাই বা কম কি। তুরাণীরা ক্ষেপে গেছে সবাই। ঐ সিয়া ইরাণীটা এমন করে দপ্তর ভাগ করেছে যে, তুরাণীদের ভাগ্যে প্রায় কিছুই জোটেনি। ওয়াজীর কামরুদ্দিনের পুত্র ইনতিজাম উদ্দৌলা খান-ই খানান পেয়েছেন দ্বিতীয় মির বকশীর পদ। সেতো ক্ষেপে লাল। অথচ তারই তো ওয়াজীর হবার কথা। মির বকশীর পদ পেয়েছেন ওয়াজীরের হাতের লোক সঈদ সলাবত খান জুলফিকার জঙ্গ। মির অতিসের পদ পেয়েছেন ওয়াজীরের নিজের পুত্র জালাল উদ্দিন হায়দর। দেওয়ান হয়েছেন ইশাক খান নাজম-উদ্দৌলা। আবতুল্লা খান—সদর-ই-সুদর। সাত্নদ্দিন খান—খান-ই-সামন। সব বড় বড় পদই পড়েছে ইরাণীদের ভাগ্যে। তুরাণীরা ক্ষেপে লাল। সুযোগ পেলেই বাদশা সুদ্ধো তার ইরাণী সাকরেদদের তারা টুঁটি কামড়ে ধরবে। আমাদের বে-ইজ্জত করলেই হল আর কি!

অল্লাতালা পাপীকে পুরস্কার দেন আগে, শাস্তি দেন পরে! রাজ্য হাতে পেয়েই যে-ভাবে লাফালাফি আরম্ভ করে দিয়েছে তওফাওয়ালীটা, তাতে পতনের আর তার বিলম্ব নেই বলে রাখলুম। সেই কবে থেকে মোগলাই ফৌজের মাইনে বাকি। উনি এখন তুকোটী টাকা ব্যয় করে নাকি জন্মদিবস উদ্যাপন করবেন! তওফাওয়ালীর আবার জন্মদিবস! বুঝবে, বুঝবে, খুব আর দেরী নেই।

বিরোধ তো শুনছি আরম্ভ হয়ে গেছে। সিয়া হোক আর ইরাণী হোক, সফদর জঙ্গটা শুনছি লোক খারাপ নয়। কামরুদ্দিনের মত ঠুঁটো

ওয়াজীর হয়ে থাকতে রাজি নয় সে। তাতেই গোঁসা হয়েছে তওফাওয়ালীটার। খোজাটার সঙ্গে পরামর্শ করে বাদশাকে সে বুদ্ধি দিয়েছে যে, ইরাণী সফদর জঙ্গটাকে হটিয়ে তুরাণী কাউকে যেন ওয়াজীর করা হয়। সেই সুযোগে কামরুদ্দিনের বেটা ইনতিজাম উদ্দৌলা দেখি খুব জোর যাতায়াত শুরু করেছে হারেমের মধ্যে। একবার সে যাচ্ছে খোয়াব ঘরে ঐ তওফাওয়ালীটার কাছে, আবার দেওয়ানীখাসে গোপনে বাদশা আহমদের কাছে।

তুরাণী আমীরগুলোরও আর ইজ্জত নেই হিন্দুস্থানে। নইলে কাফের ঐ তওফাওয়ালীটার বেটার কাছে ওয়াজীরের পদের জন্য দরবার করতে আসে তারা ? হটিয়ে দিতে পারেনা আহমদটাকে গদি থেকে ? তারপর নতুন এক শাজাদাকে গদিতে বসাতে পারে না ? শাজাদার অভাব আছে নাকি মোগল হারেমে ? তুরাণীরা যদি এমন নির্লজ্জতার পরিচয় দেয় তাহলে সফদর জঙ্গ-টাকেই বরং আমরা মদত দেব।

মমতাজ মহলে তওফাওয়ালীটা দেখি খরচার হিসাব অনেক কমিয়ে দিয়েছে। সব বান্দা বাঁদীকে তাড়িয়ে দিয়ে সবেধন নীলমণি ঐ রহিমাকে রেখে দিয়েছে আমাদের জন্য। সে-জন্য দুঃখ করিনা। এ ভাবেই আমাদের শায়েস্তা করবে নাকি বাজারের মেয়েটা ? সে যদি তা ভেবে থাকে তো ভুল। আমাদের রক্তের মর্যাদাটা সে কি কেড়ে নিতে পারবে ?

হজরত বেগমটা বড় বাড় বাড়ন্ত। অল্প বয়েসেই একটা তাগড়াই লতার মত বেড়ে উঠছে সে। মেয়েটাকে সামলাতে সামলাতে মোগল বাদশাদের গল্প করছিলাম তার কাছে। তাকে তো বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সে যে-সে ঘরের মেয়ে নয়, স্বয়ং মোগল বাদশার কন্যা শাজাদী। আকবর বাদশার গল্প করছিলাম তার কাছে। এমন সময় দেখি রহিমা বাঁদী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। আমার কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলুম : কিরে এত ছুটে আসছিস ?

চোখ বড় বড় করে রহিমা বলল : জানেন বেগম সাহেবা, ওয়াজীর সাহেব ইদ্‌গা থেকে নামাজ পড়ে ফিরবার সময় দারা স্থকোর মহলের দরজার কাছে কারা যেন রাকালা থেকে তাঁকে গুলি ছুঁড়েছে। ওয়াজীর সাহেবের ঘোড়া আর তিনজন বান্দা মারা গেছে। রেগে গিয়ে ওয়াজীর সাহেব নিগাম-বোধ খাল থেকে দারা স্থকোর প্রাসাদ পর্যন্ত রাস্তার দু-পাশের ঘরবাড়ি দোকানপাট সব ভেঙে দিয়েছেন।

মালেকা-ই-জামানী মহলের ভেতরে ছিলেন। আমি রহিমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি এসে বাইরে দাঁড়ালেন। বললেন : কি হয়েছে? সব ভেঙে বললুম তাঁকে। শুনে তিনি গম্ভীরভাবে রহিমাকে বললেন : যাও, তোমার কাজে যাও।

রহিমা বোধহয় মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

আমি বললুম : রহিমাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

মালেকা-ই-জামানী বললেন : কিন্তু দেয়ালেরও কান আছে সেটা জেনে রেখ। যে ঘটনা ঘটেছে আমি সেটা জানি। এখন এ-সব কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কেউ বলতে পারেনা। এ সব ব্যাপার নিয়ে কোন রকম আলোচনা করতে নাজির রজ আফজুন নিষেধ করে দিয়েছেন। জেন, খুব শিগগীরই একটা মামামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে যাবে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। আহমদ সফদর জঙ্গকে হটাতে চাইছে। সে গোপনে দাক্ষিণাত্যের নতুন স্থবেদার নাসির জঙ্গকে দিল্লী আসতে লিখে দিয়েছে। এ খবর আজ হোক, কাল হোক, ওয়াজীর সফদর জঙ্গ পাবেনই। তখনই আরম্ভ হবে সংঘর্ষ।

—ঘটনা এতদূরই এগিয়ে গেছে নাকি ?

—হ্যাঁ।

মনে মনে আমার বেশ ভাল লাগলো। একটা গোলমাল হয়ে আহমদটা গদিচ্যুত হয়, আর তওফাওয়ালীটা জাহান্নামে যায় তো আমার

মন খুশী হয়। খুদাতালা থাকলে নিশ্চয়ই হবে। এ তো তারই সূত্রপাত।

মনের খুশ্‌মতো সংবাদ খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে গেলাম। মারাঠা সেনাপতি হিঞ্জের কাছ থেকে সফদর জঙ্গ আহমদ আর তার আম্মাজানের এই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলেছেন। তিনি জেনে ফেলেছেন যে, তাকে হটাবার জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে নাসির জঙ্গ দিল্লীর দিকে রওনা হয়েছে। খবর পেয়ে ওয়াজীর সাব্‌ রেগে লাল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার মারাঠা দোস্তদের নিজামকে বাধা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দারা সুকোর মহল ছেড়ে তিনি নিজেও শহরের বাইরে গিয়ে শিবির ফেলেছেন। হয়তো রীতিমত গোলমালই আরম্ভ হয়ে যাবে দু-এক-দিনের মধ্যে।

বেশ উৎফুল্ল বোধ করছিলাম। হঠাৎ এমন সময় লাহোর দরওয়াজাতে বাদশাহী দামামার শব্দ শোনা গেল। হারেমেও দেখলাম বেশ একটা প্রস্তুতি। শিকার যাত্রা বা যুদ্ধযাত্রায় বেরুলে হারেমে যেমন সাড়া পড়ে যায়, তেমনি একটা চাঞ্চল্য। দেখে মনে হচ্ছে ঐ তওফাওয়ালীটা যেন কোথায় বেরুচ্ছে। তাহলে যুদ্ধটুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল নাকি? চারদিকে খোঁজ করতে লাগলাম রহিমা বাঁদীটার। এ-সব খবর সে খুব ভাল রাখে।

কিন্তু রহিমাকে পাওয়া গেল না। দেখলাম নাজির রজ আফ-জুনকে। তিনি আমাদের মহলের দিকেই আসছিলেন। নাজির সাহেব এগিয়ে এসে সালাম জানালেন আমাকে ঃ সালাম বেগম সাহেবা।

বললুম ঃ আসুন নাজির সাহেব। খবর কি?

নাজিরের মুখখানা আজ বেশ হাসিখুশী। বললেন ঃ খবর ভালই।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বললুম ঃ বেগম মহলে একটা সাড়া পাচ্ছি। তওফা-ওয়ালীটা কোথাও যাচ্ছে নাকি? যুদ্ধটুদ্ধ বাধলো না তো?

আবার একটু হেসে রজ আফজুন বললেন ঃ যুদ্ধ নয়, দায়ে ঠেকে বেরুচ্ছেন কিব্‌লা-ই-আলম।

—কি হয়েছে ?

—ওয়াজীর গোঁসা করে শহরের বাইরে গিয়ে শিবির ফেলেছেন। তার গোঁসা দেখে বাদশার মুখে আর কথা নেই। বুক ধড়ফড় করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। খোজা জাবিদ খাঁ-টা মুখ আমসী করে বসে আছে দেখলাম।

—কেন ?

—বাদশা যাচ্ছেন ওয়াজীরের কাছে ক্ষমা চাইতে।

—সত্যি নাকি ?

—হ্যাঁ।

আমার মুখেও হাসি ফুটলো : তাহলে তওফাওয়ালীটার খুব শিক্ষা হয়েছে বলুন ?

—একবারে কি হবে ? অনেক জল খেতে হবে। আচ্ছা বেগম সাহেবা—খবরটা আপনাদের দিয়ে গেলুম। আমি এখন আসি। সালাম।

—সালাম।

রজ আফজুন চলে গেলেন।

বিকেলবেলাই খবর পেলাম। তওফাওয়ালীটাকে নিয়ে আহমদটা ওয়াজীরের শিবিরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এসেছে। নাকে খত দিয়ে আহমদ নাকি বলেছে যে, আর কখনো সে এমন বেয়াদবি করবে না। ওয়াজীরের সামনেই ফরমান জারি করে নাসির জঙ্গকে সে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাবার জন্য হুকুম করেছে। তোবা! তোবা বাদশাহী!

ছোটলোক যে, তার লাজ-লজ্জার বালাই থাকে না। ছোট লোকের বাচ্চারও থাকে না। তা যদি হোত, আবার দরবারে তুরাণীদের নিয়ে ঐ তওফাওয়ালীটা আর তার বাচ্চা গুজ্‌গুজ্ ফুস্‌ফুস্ আরম্ভ করত না। ভাল মানুষের মত ওয়াজীর ঐ তওফাওয়ালীটার কথাতে বিশ্বাস করে গেছেন রোহিলখণ্ডে আফগান শয়তানগুলোকে দমন করতে—সেই

ফাঁকে আবার বেশ দল পাকাবার চেষ্টা চলছে সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে। সকল দুষ্ট পরামর্শ দিচ্ছে ঐ খোজা জাবিদ খাঁ-টা। একদিন অপঘাতে মৃত্যু হবে ঐ কমবক্‌তটার এ-কথা বলে রাখলুম।

ওয়াজীরের অনুপস্থিতিতে দুষ্ট তুরাণী-চক্র স্থির করেছে যে, একের পর এক তারা বড় বড় রাজপদ থেকে ইরাণীদের, বিশেষ করে সফদর জঙ্গের পেয়ারের লোকদের হটিয়ে দেবে। মির বক্‌শী সলাবত খাঁ গিয়েছিলেন রাজপুতনায় যুদ্ধ করতে। এক্‌ বছর সেখানে নানা সংঘর্যে ব্যস্ত থেকে অবশেষে ফিরে এসেছেন দিল্লীতে। তাঁর আঠার হাজার মোগলাই ফৌজের জন্য প্রায় ব্যয় হয়েছে ষাট লক্ষ তঙ্কা। কিন্তু রাজপুতনা থেকে তিনি পাঁচ লাখ রুপিয়াও সংগ্রহ করতে পারেন নি। তার নিজের সুবা থেকেও এ-বছর কোন রাজস্ব আদায় হয়নি। বাদশা আহমদের কাছে সিপাহশালার সাহায্যের জন্যে আবেদন করেছেন। কিন্তু হারামী জাবিদ খাঁ-টা এই সুযোগে তাকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করছে—কারণ সলাবত খাঁ ওয়াজীর সফদর জঙ্গের হাতের লোক। বাদশা কোন জবাব দেয়নি সলাবত খাঁর আবেদনে। কি আশ্চর্য! এত বড় একটা আমীরের পাশে কিনা জাবিদ খাঁ-টাই বড় হল বাদশার কাছে! খোজাটা নাকি দাবি করেছে যে, সলাবত খাঁকে তার কাছে আর্জি পেশ করতে হবে। সলাবত রাজি হননি। একটা খোজার কাছে তিনি মাথা নত করবেন নাকি?

কিন্তু ফৌজেরা বাকি মাইনের জন্য তার মাথা খাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে নিজের প্রাসাদে ঢুকে চুপ করে বসে আছেন সলাবত। দরবারেও আসছেন না। বলেছেন: এখন কোন বাদশা আছে নাকি যে দরবারে যাব? খোজা যেখানে দরবার চালায় সে দরবারে ইজ্জত খোয়াতে যাব নাকি? হক্‌ কথা বলেছেন জনাব সলাবত খাঁ। অভিজাত ঘরের রক্ত আছে তাঁর মধ্যে। একথা তো তিনি বলবেনই।

জাবিদ খাঁ ইনিয়ে-বিনিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একথাটাকেই আরো বেশী করে বাদশার কানে পৌঁছে দিয়েছে। তওফাওয়ালীর বেটা

বাদশা। তার মাথায় আর কত বুদ্ধি হবে। শুনছি সলাবত খাঁকে সে মির বক্‌শীর পদ থেকে হটিয়ে দিয়ে ফরমান জারি করেছে।

সলাবত খাঁ শেষ পর্যন্ত কেল্লায় এসে বাদশার সঙ্গে ভেট করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হারামী খোজাটা তাকে নাকি লোক দিয়ে বের করে দিয়েছে। বাদশার হুকুমে তার মহলের চারপাশে ফৌজ বসে গেছে। ওদিকে সলাবতের ফৌজেরা চিৎকার করছে বাকি মাইনের জন্য। চৌদ্দ পুরুষের সঞ্চিত ধনরত্ন বিক্রী করে দিয়ে সলাবত কোন রকমে ফৌজেদের মাইনে মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন পথের ফকির আর সলাবতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

হায়রে জমানা!

মির বকশীর পদটা সঙ্গে সঙ্গে তুরাণীদের ঘরে গিয়ে উঠেছে! খোজাটার পরামর্শে বাদশা নিজাম-উল্‌-মুলক চিনকিলিচ খাঁর পুত্র গাজিউদ্দিনকে দিয়েছে এপদ। তার উপাধি হয়েছে আমির-উল্‌-উমারা। সেই সঙ্গে ইনতিজাম উদ্দৌলা হয়েছে খান-ই-খানান। খোজাটার নসিব বুঝি এখন খুশ্‌। সঙ্গে সঙ্গে খবর এসেছে—দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নাসির জঙ্গ খুন হয়েছেন দুষ্‌মণের হাতে। সেই পদ সে দিয়েছে মির বকশী গাজিউদ্দিনকে। সঙ্গে সঙ্গে একজন জাঁদরেল সুবেদার দোস্ত হয়ে গেছে খোজাটার। এটা কম কথা নাকি? ওয়াজীরের সঙ্গে লড়তে গেলে এমন একজন দোস্তই তো চাই। কারণ ওয়াজীর ফিরে এলে জাবিদের সঙ্গে সংঘর্ষ তার অনিবার্য। মির বকশীর পদ থেকে সলাবত খাঁকে হটানো সে অমনিই মেনে নেবে নাকি?

১৮ই রবিয়স্‌সানি। হিজরী ১১৩০ সাল। দীর্ঘদিন রোহিলখণ্ডে কাটিয়ে ওয়াজীর ফিরলেন দিল্লীতে। ইতিমধ্যে আবার আবদালীর আক্রমণ ঘটেছে পাঞ্জাবে। ২৭শে জেলহজ্জ আবদালী লাহোর দখল করে নিয়েছেন। সেই সংবাদ শুনেই ওয়াজীর তাড়াতাড়ি ফিরে

এসেছেন দিল্লীতে। তুরাণীরা শুধু ষড়যন্ত্রই জানে। বাধা দেবার ক্ষমতা আছে নাকি বিদেশী লুঠেরাকে ? অথচ ঔদ্ধত্য কত খোজাটার ! ওয়াজীর সফদর জঙ্গ যমুনা অতিক্রম করে এপারে আসছে শুনেই সে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বসে আছে আঙ্গুরি বাগিচায়। তার ইচ্ছা, ওয়াজীর যেন এ পার এসে প্রথমে তাকেই সালামত্ জানায়। কি সখ ! কুঁজো হয়ে চিত হয়ে শুতে চায়। ওয়াজীর কেন একটা খোজাকে সালামত্ জানাবেন ? তিনি সটান চলে গেছেন দারা সুকোর মহলে। মুখ আমসী করে কেল্লায় ফিরে এসে খোজাটা আহমদের কানের কাছে ফুস্‌ফস্ করতে লেগে গেছে। জাহান্নামে যায় না কেন জালিমটা, তাই ভাবি।

ওয়াজীর ফিরে আসতেই নাজির রজ আফজুন আমাদের জানিয়ে গেছেন যে, আমরা যেন সাবধানে থাকি। খুব শিগ্‌গীরই একটা গোলমাল আরম্ভ হয়ে যাবে দিল্লীর সর্বত্র। আমরা বসে আছি সেই ভরসায়, কবে গোলমাল আরম্ভ হয়ে খোজাটা কোতল হয়।

খুদাতালা এত অধর্ম সইবেন না এ-কথা ঠিক। এখন পোয়া বার ঐ তওফাওয়ালীটার। যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে হারেমের মধ্যে। আহ-মদটার তো এখন কোন জ্ঞানগম্যি নেই। সে পড়ে আছে জেনানা বাগি-চায় মদ খেয়ে চূড় হয়ে। সেই ফাঁকে হারেমের মধ্যে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে তওফাওয়ালীটা। সিরাজী সরাবের ছড়াছড়ি। নিয়ম কানুন জাহান্নামে দিয়ে জাবিদ খাঁ-কে নিয়ে রাতের বেলায় হারেমে পড়ে থাকছে। একটা খোজাকে নিয়ে কি বেলেল্লাপনা ! একটা পুরুষের মত চেহারা ছাড়া খোজাটার আছে কি ? তাকে নিয়ে পালঙ্কে শুয়ে যে কি সুখ পায় বাঈজীটা, আল্লাই জানেন। এদিকে তো সর্বত্র টি টি পড়ে গেছে। এ করে কি আর রাজ্য চলে ? খোজাটা খুব ধুমধাম করে দুই কোটী টাকা ব্যয়ে আবার নাকি জন্মদিবস পালন করছে ঐ তওফা-ওয়ালীটার—হজরত কিব্‌লা-ই-আলমের। অথচ শুনছি বাদশার

নিজের ফৌজেরাই মাইনে পাচ্ছে না। মরুক, আমার কি? যত শিগ্‌গীর দুষ্‌মণের রাজত্ব শেষ হয়।

৬ই জমা-সানি। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই শুনলাম দেওয়ানী আমের দিকে বেশ জোর গোলমাল। চিৎকার, হৈ হুল্লোড়, গালাগাল, এই সব চলছে। তাহলে কি ওয়াজীরের সঙ্গে খোজাটার সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে গেছে নাকি? শুনছি আবদালীকে বাধা দেবার নীতি নিয়ে ওয়াজীরের সঙ্গে খোজাটার ইতিমধ্যেই একটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে। ওয়াজীর চান মারাঠাদের সঙ্গে দোস্তী করে তাদের দিয়েই আফগানদের ঠেঙিয়ে তাড়াবেন। সে-জন্য ফেরার সময় সঙ্গে করে ৫০ হাজার মারাঠী ফৌজ নিয়ে এসেছেন তিনি। কিন্তু জাবিদ খাঁ-টা ওয়াজীরের সঙ্গে পরামর্শ না করেই আবদালীকে লাহোর ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করেছে। রেগে গিয়ে ওয়াজীর বলেছেন—তিনি যে ৫০ হাজার মারাঠী ফৌজ নিয়ে এসেছেন, তার খরচা তবে দেবে কে? দিল্লীর দেওয়ানী থেকে তাঁকে ৫০ হাজার তঙ্কা দেওয়া হোক। খোজাটা তা দিতে রাজি নয়। এদিকে টাকা না পেয়ে মারাঠী ফৌজেরা যমুনার পশ্চিম তীরে রীতিমত লুঠতরাজ চালিয়েছে। ভয়ানক রেগে গিয়ে একচোট শানিয়েছেন ওয়াজীর খোজাটাকে। তাহলে সেই গোলমালটাই লেগে গেল নাকি?

রহিমা বাঁদীকে সমস্ত কাজ ফেলে দেওয়ানী আমের দিকে পাঠালাম —যদি সে ঝরোকার পেছনে বসে সংবাদটা জেনে আসতে পারে।

এ-সব ব্যাপারে বাঁদীদের এখন কৌতূহলের অন্ত নেই। হারেমের মধ্যে বাঁদীদের উপভোগের বিষয় তো এখন এই সব কেচ্ছাকাহিনী।

আমার হুকুম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রহিমা ছুটে গেল ঝরোকার দিকে।

মালেকা ই-জামানীর কক্ষ থেকে হজরত বেগমকে তুলে এনে আমি রহিমার অপেক্ষায় মমতাজ মহলের বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলাম।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রহিমা ছুটে এল মমতাজ মহলে। ওড়নার আঁচল মুখে দিয়ে হাসতে হাসতে সে মরে যায় আর কি? বললুম: কিরে? এত হাসছিস কেন?

রহিমা বলল : বেগম সাহেবা, আপনি গিয়ে নিজের আঁখে দেখে আস্থন দেওয়ানী আমের মুখে কি ঘটছে।

ধমকে উঠলুম : কি ঘটছে তাই বলনা উল্লুকীটা।

সে বলল : একটা মদ্দা আর একটা মাদী-গাধা বেগম সাহেবা।

—তা এত হৈ হুল্লোড় কিসের ?

—কি বলেন বেগম সাহেবা, হবে না ?

—কেন ?

—শাহানশার ফৌজেরা কি কাণ্ড করছে, জানেন ?

—কি ?

—মদ্দা গাধাটাকে বানিয়েছে জাবিদ খাঁ—নবাব বাহাদুর, আর মাদী গাধাটাকে বানিয়েছে উধম বাঈ—হজরত কাদিসা।

—তাই নাকি ?

—জী বেগম সাহেবা।

—তারপর ?

—যে-কোন আমীর দেওয়ানী আমে ঢুকছেন, ফৌজেরা বলছে হজরত কাদিসা আর নবাব বাহাদুরকে আগে সেলাম কর, তবে দরবারে ঢুকতে পাবে।

খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠলুম। বললুম : তা, কেউ কিছু বলছে না ?

রহিমা বলল : বলবে কি ? এক বছরের মাইনে বাকি না ফৌজেদের ?

—মাইনে বাকি! ওদিকে তো দুইকোটী তঙ্কা জন্মদিবসে ব্যয় হবে শুনছি।

—সেই জন্যেই তো ওরা সব ক্ষেপে গেছে বেগম সাহেবা।

মনে মনে বললুম : ক্ষেপুক! এমনি অপমান হবারই প্রয়োজন ছিল ওদের। খুদাতালা আছেন। তিনি বিচার করবেন না ?

বুর্বক না হলে এর পরে লোকে হুঁসিয়ার হয়ে চলে। কিন্তু খোজা-

টার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই বোধ হয়। আবার বিবাদ আরম্ভ করে দিয়েছে সে সফদর জঙ্গের সঙ্গে। কথায় বলেনা, অতি বাড় বাড়তে নেই? খোজাটার হয়েছে তাই। জাঠদের নেতা সুরজমল এসেছে ওয়াজীরের সঙ্গে মোলাকাত্ করতে দিল্লীতে—খোজার মর্জি, আগে তার সঙ্গে ভেট করতে হবে জাঠ নেতাদের। কিন্তু জাঠ নেতারা ওয়াজীর থাকতে আগে একটা খোজার সঙ্গে ভেট করতে যাবে কেন? বিশেষ করে যাকে গাধা বানিয়ে দুদিন আগে মোগল ফৌজেরাই বে-ইজ্জত করেছে? তারা বলেছে, মোলাকাত্ করতে হয় ওয়াজীরের বাড়ি এস, এক সঙ্গে ভেট হবে।

১৩ই জমা-সানি। খোজটার লজ্জা নেই। আগ বাড়িয়ে ভেট নেবার জন্য ওয়াজীরের বাড়ি দারা সুকোর মহলে ছুটে গেছে সে। বে-আদব! বে-আদব!

সন্ধ্যাবেলা দেখলুম খাসমহল কেমন অন্ধকার। আমরা ভেবেছিলুম সন্ধ্যাবেলা আলোর রোশনাই ফুটবে মহলে। সিরাজী-সরাবে খুব ধুমধাম হবে আজ। কম কথাতো নয়। ওয়াজীর স্বয়ং দাওয়াত করতে বাধ্য হয়েছেন খোজাটাকে। এ-সবের পেছনে তো ঐ তওফাওয়ালীটারই হাত আছে। আসলে সেইতো করাচ্ছে এ-সব। একটা বাজারের বাঈজী বেগম নূরজাহান হতে চায় আর কি। কিন্তু তবে যে সন্ধ্যাবেলা খাসমহলে আওয়াজ পাচ্ছি না বড়? না ওয়াজীর সফদর জঙ্গ বে-ইজ্জত করে ফিরিয়ে দিয়েছেন খোজাটাকে? কিন্তু তাতে কি? ইজ্জত জ্ঞান আছে নাকি খোজাটার। গাধা বানিয়ে যেদিন অপমান করলো ফৌজেরা, সেদিনও তো হারেমে খুব হৈ হুল্লোড় করেছিল তওফা-ওয়ালীটা। আজ তবে এত নীরব কেন? খুব একটা কৌতূহল হল। মনে হল রহিমা বাঁদীকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই দেখলাম সন্তর্পণে নাজির রজ আফজুন ঢুকলেন মমতাজ মহলে। খুব আস্তে করে আমাকে একটা সালাম জানিয়ে রজ আফজুন বললেন: বেগম সাহেবা, আপনাকে একটা খবর জানাই।

খোজা জাবিদ খাঁ জাহান্নামে গেছে। ওয়াজীরের ভাড়াটিয়া তুর্কী গুণ্ডারা খুন করেছে তাকে।

—হ্যাঁ?

—জী বেগম সাহেবা। খেল্ শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের বলিনি—বিবাদ আরম্ভ হল বলে?

বললুম: তা বলেছিলেন বটে। বড় খুশমেজাজ হলাম নাজির সাহেব। এখন ঐ তওফাওয়ালীটা কবে যাবে বলতে পারেন?

—শিগ্‌গীরই এ জমানা শেষ হবে বেগম সাহেবা এটা জানবেন। কিন্তু তার আগে বড় রকমের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেতে পারে। আপনারা খুব সাবধান থাকবেন। হুঁসিয়ার করে দেবার জন্যই আজ আমি এলাম।

বললুম: ধন্যবাদ নাজির সাহেব। এই মোগল হারেমে আপনিই আমাদের একমাত্র বন্ধু। খুদা আপনার মঙ্গল করুন।

রজ আফজুন বললেন: মোগল বাদশাহী জাহান্নামে যাচ্ছে—চোখে আর এটা সইতে পারিনে বেগম সাহেবা। ছোটলোকে হারেম ভরে গেছে, তাই আপনাদের আমি বিশেষ চোখে দেখি। আপনাদের মূল্য এখন আর ক'জন বুঝে বলুন?

বললুম: তা জানি জনাব। জানি বলেই আপনার কথা আমরা এত করে মনে করি।

রজ আফজুন বললেন: সবই আল্লাতালার মর্জি বেগম সাহেবা। তবে আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াব না। চললুম। হজরত মালেকা-ই-জামানীকে আমার সালাম জানাবেন।

আমাকে কুর্ণিশ জানিয়ে যেমন নিঃশব্দে রজ আফজুন এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দেই চলে গেলেন। এতক্ষণে খাসমহলের নিরবতার অর্থ ধরতে পারলুম। আল্লা মেহেরবান! তিনি নিক্তির ওজনে বিচার করেন। জাবিদ খাঁর এ-রকম অপমৃত্যুই স্বাভাবিক ছিল। হারেমের ইজ্জত হয়তো এখন কিছুটা বাঁচবে।

পরদিন সকালবেলা খাসমহলের অবস্থাটা লক্ষ্য করলুম। বাদশা আহমদ খোজাটার মৃত্যুতে কোন কথাই নাকি বলেনি। বরং সারারাত বেশী করে সিরাজী খেয়ে বাজারের মেয়েদের নিয়ে খুব হৈ হুল্লোড় করেছে। তবে ঐ তওফাওয়ালীটা নাকি সারারাত ভর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। আহা রে! পেয়ারের খোজা। তাকে নিয়ে কতনা দিল্লাগী হোত। মেয়েমানুষ খোজার মধ্যে যে কি পায়, আল্লাতালাই জানেন। সকালবেলা খুব ভাল করে নজর করে দেখলুম, গয়নাগাটি সব খুলে ফেলেছে দুষ্‌মনীটা। হিঁদু কাফেরদের বিধবারা যে রকম সাদা কাপড় পরে, তেমন সাদা কাপড় পরেছে। আহা! পরবেই তো, খোজাটাকে ও-যে নিকা করেছিল। তোবা! তোবা!

ভোরবেলাই দেখলুম কিব্‌লা-ই-আলমকে সমবেদনা জানাতে হারেমের মধ্যে এসেছে ইনতিজামউদ্দৌলার আম্মা সোলাপুরি বেগম। ঐ আর এক জেনানা। তুখোর। হাড়ে হাড়ে শয়তানী বুদ্ধি। এই ফাঁকে ফুস্ মন্তর দেবার ইচ্ছা আর কি। ইনতিজামটাকেও দেখলাম। বোধহয় বাদশার সঙ্গে মোলাকাত্ করতে এয়েছে।

দূর থেকে আহমদকে দেখা যাচ্ছে। চুপ মেরে বসে আছে সে দেওয়ানী খাসের ময়ুর তক্‌তে। আমীর ওমরা অনেকেই এসেছেন। কে একজন হাত পা নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছে বাদশাকে। সব লোক আমি আর চিনি কই? রহিমাকে বললাম-ঃ লোকটা কে রে?

বাঁদী আমার কাজের বটে। ইতিমধ্যেই দেখি সব খবর খুঁটে খুঁটে নিয়ে এসেছে। সে বললঃ ওর নাম খাজা তানকিন। ওয়াজীরের লোক। নাজির রজ আফজুনকে দেখলুম বাদশার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন ওকে।

কি বলছে কে জানে। ওয়াজীর নিজে না এসে খোজাকে পাঠিয়েছেন কেন? তিনি বোধহয় ভয় পেয়েছেন। ওয়াজীর তো জানেন যে কত পেয়ারের খোজা ছিল জাবিদ খাঁ-টা বাদশা আর হজরত নবাব কাদিসার। সত্যি ওয়াজীরটাও কি বোকা! এমন বাদশাকে ভয়ের

কি আছে? বলা উচিত: যা করেছি বেশ করেছি। এমনতর খোজা আবার যদি হারেমে ঢোকে তো বাদশাকেই গদি থেকে হটিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু ওয়াজীর সম্পর্কে যা শুনছি তাতে এমন হিম্মত দেখাবার মুরোদ তার হবে কি? সাহস থাকলে কি হবে—বুদ্ধিসুদ্ধি খুব কম। টাকাকে টাকা বলে মনে করেন না। হাওয়ায় উড়িয়ে দেন। কেউ যদি গিয়ে চোখের পানি ফেলল তো অমনিই সে পেয়ারের লোক হয়ে গেল। কোথায় লড়িয়ে লোকের সঙ্গে ভাবসাব হবে—তা নয় তো ভাব হল আমাদের স্বর্গত বাদশা মহম্মদ শার পেয়ারের মুসায়েব আলিকুলির সঙ্গে। দরবারের সেই বাঈজীটার সঙ্গে যে তার সাদী দেওয়া হয়েছিল শুনেছি তার একটা বাচ্চা হয়েছে। মেয়ে। বেশ ডাগরডোগরটি নাকি হয়ে উঠেছে। শুনছি অমন খবসুরত মেয়ে নাকি দেখা যায় না। আমাদের হজরত বেগমের সমান বয়স। নাম গন্না। নিজের বেটার সঙ্গে সাদী দেবার ইচ্ছা ছিল গন্নার। কিন্তু আমির খাঁ-টা জোর করে ইশাকের বোন বাহুর সঙ্গে সাদী দিয়ে গেছে ওয়াজীরের লেড়কা সুজাউদ্দৌলার। তবু মেয়েটাকে ভুলতে পারেন নি ওয়াজীর। সেই সেবার যখন দিল্লীতে ইরাণী তুরাণী হল্লা হোল, তখন নিজের হারেমে এনে উঠিয়েছিলেন আলিকুলির পরিবারকে। এখনো যেতে দেননি। লোকে তাই নিয়ে কিচ্ছা কম করে নাকি! তুরাণীরা বলে, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে ওয়াজীরের, ছোট্ট একরত্তি লেড়কিকে সাদী করবার সখ। কাণ্ডজ্ঞান একটু কম আছে ওয়াজীরের। শা জাহান বাদশার সময় যে বড় বড় ইরাণী ওয়াজীর ছিলেন—আলিমর্দন, সাদুল্লা খাঁ, মির জুম্‌লা বা আলমগীর বাদশার সময় মির্জা নাজব খাঁ, তেমন নন ওয়াজীর সফদর জঙ্গ।

কয়েক প্রহর পরেই ওয়াজীর খাজা সাহেবকে কেন পাঠিয়েছিলেন সেটা জানতে পারলুম। ওয়াজীর নাকি বাদশাকে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন গোঁসা না করেন। খোজাটা বড় অসুবিধা করছিল। তাকে না হটিয়ে কোন উপায় ছিল না। কিন্তু বাদশা যেন কোন ভয় না

করেন। তাকে অস্বীকার করবার কোন অভিপ্রায় ওয়াজীর সাহেবের নেই। বরং বাদশার যে-কোন হুকুম তিনি সব সময় তামিল করবার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

ওয়াজীর বোধহয় ভুল করছেন। আহমদের কাছে আবেদন জানিয়ে কি হবে? তার কোন বোধগম্যি আছে নাকি? সেতো গাঁজা, ভাঙ, চরস আর বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে থাকে। আসলে সব চালায় তো ঐ তওফাওয়ালীটা। পেয়ারের খোজাকে হারিয়ে সে এখন ফোঁসফোঁস করছে। রাতের বিছানায় বুকে জড়িয়ে ধরবার কেউ যে রইল না এখন। এ শোক ঐ তওফাওয়ালীটা ভুলতে পারবেনা। ক্ষমা করবে না সে ওয়াজীরকে। তারপর আবার তুরাণী উল্লুকগুলো এসে ফিস্‌ফিস্‌ করতে আরম্ভ করেছে। শয়তানের বাচ্চা ইনতিজামউদ্দিন আর সোলাপুরি বেগমকে তো চিনি আমি। একটু নরম হয়েছে কি ওয়াজীরের খেল্‌ খতম। যেমন করে কড়া পাহারায় রেখেছেন তিনি বাদশাকে এখন পর্যন্ত, তেমনি রাখতে হবে। হারেমে যাকে তাকে ঢুকতে দিলে বিপদ অনিবার্য। যতটা খুশমেজাজ হয়েছিলাম ততটাই অস্বস্তি বোধ করলাম। ওয়াজীর ভুল করলেই সব গেল।

আমাদের নসিবে আল্লাতালা সুখ দেন নি। সুতরাং আমাদের যে শত্রুপক্ষ তার অসুখ হবে কেমন করে? শেষ পর্যন্ত ওয়াজীর ভুলই করলেন। ১৬ই শাবান। হিজরী ১১৩০ সাল। খবর পাওয়া গেল দাক্ষিণাত্যের সুবেদার গাজিউদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। আমরা ভাবলুম, যাক, বাঁচা গেল। এবার ওয়াজীরের হাত আরও শক্ত হবে। একটা বড় তুরাণী শত্রু তো তার গেল। সেখানে একজন ইরাণী আমীরকে বসিয়ে দিলেই তুরাণীরা কাত। কিন্তু···ঐ-যে আগেই বলেছি, ওয়াজীরের বুদ্ধিসুদ্ধি কম। সেই ভুলই করলেন তিনি।

গাজিউদ্দিনের ছেলে শিহাবউদ্দিন। এখনো সে একটা বাচ্চা লেড়কা। বয়েস সবেমাত্র সতের। তার মামু ইনতিজামের দৃষ্টি নিজামের টাকাকড়ির উপর। শোনা যায় গাজিউদ্দিন গুনে গুনে ষাটলক্ষ তঙ্কা

রেখে গেছেন শিহাবের জন্য। মদ খেয়ে আর জেনানা মানুষ নিয়ে ফুর্তি করে টাকা ওড়াননি তিনি। ইনতিজাম বাদশা আহমদকে খোঁচাচ্ছে সেই টাকাটা হাত করবার জন্য। টের পেয়ে শিহাবুদ্দিনের চতুর মৌলানা অকিবত রহমত কাশ্মিরী লেড়কাটাকে বুঝিয়েছে যে, বাঁচতে চাইলে ওয়াজীরকে গিয়ে ধরে পড়। ধরে পড়লে ওয়াজীর আর না করতে পারবেন না। ইনতিজামের হাত থেকে এ-যাত্রায় বাঁচবে। কিন্তু তুরাণীরা মারামারি কাটাকাটি করে মরলে ওয়াজীরের কি? অথচ সেই ভুলই করলেন তিনি।

মৌলানার কথা শুনে রাত্রিবেলার প্রথম প্রহরেই শিহাবুদ্দিন গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়েছিল ওয়াজীরের বৈঠকখানার সিঁড়িতে। সারারাত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। বাচ্চা লেড়কা দেখে ওয়াজীরের মন গলে দরিয়া। বলেছেন: আগে দানাপানি খাও, পরে কথা শুনব। কিন্তু শিহাবের এক কথা, আগে কথা না দিলে দানাপানি ছোঁবেনা সে। অবশেষে ওয়াজীর শিহাবের আর্জি শুনেছেন। শিহাব নাকি বলেছে: ওয়াজীর তার আব্বাজান। তার ধনদৌলত জান-প্রাণ ওয়াজীরের হাতে। তিনি কথা দিলেই তা বাঁচে। ওয়াজীর কথা দিয়েছেন, শিহাব যখন তাকে আব্বাজান বলে ডেকেছে, তার ধনদৌলত রক্ষার দায়িত্ব তিনি নেবেন। নিজের ছেলের সঙ্গে পাগড়ি বদল করে শিহাবকে তিনি ধর্মপুত্তুর বলে ঘরে তুলেছেন। একেবারে খাসমহলে নিয়ে গেছেন বেগম সাহেবার কাছে। এতবড় ঘরের জেনানা হয়েও শিহাবের সামনে বোরখা খুলে কথা বলেছেন বেগম সাহেবা। সত্যি, সফদর জঙ্গ ওয়াজীরের বুদ্ধিসুদ্ধি বোধহয় কিছু নেই, নইলে হারেমের মধ্যে কেউ পরের ছেলেকে ঢোকায়? শুধু কি তাই? না দেখে, না বুঝে, সটান তাকে বাদশার দরবারে এনে মির বক্শী করে ছেড়েছেন সেই সঙ্গে। বিরাট এক উপাধি দিয়েছেন—গাজিউদ্দিন খান বাহাদুর আমীর-উল-উমারা ইমাদ-উল্-মুল্ক।

কিন্তু ওয়াজীরের নসিব। এখন হিতে বিপরীত হয়েছে। হারেমের

মধ্যে যখন তখন যাকে তাকে ঢুকালেই হল আর কি? এমন যে বৃদ্ধ সঈদ হুসেন আলি সেও মোগল হারেমে ঢুকে বাদশা রফি-উদ্-দরজাতের বেগমের দিকে কুদৃষ্টি ফেলেছিল। আর এ তো তরতাজা জোয়ান মানুষ। পাগল হয়েছে শিহাবুদ্দিন ওয়াজীর সাহেবের মহলে মুসায়ের আলিকুলির বেটী গন্নাবানুকে দেখে। কিন্তু খবর নিয়ে সে জানতে পেরেছে, ঠাঁই বড় শক্ত। ওয়াজীরের মহল থেকে আলিকুলির কন্যাকে বের করে আনা অসম্ভব। নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার দৃষ্টিও নাকি ঐ গন্নাবানুর উপর। ওয়াজীর সাহেবের ইচ্ছা, শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলের সঙ্গেই সাদী দেন তার। এতে আলিকুলিরও অমত নেই। সে নিজে সিয়া, সিয়ার ঘরেই তো মেয়ে দিতে চাইবে। তার উপর সফদর জঙ্গ তাকে সব চাইতে বেশী পেয়ার করেন।

কিন্তু মেয়েছেলের নেশা জব্বর নেশা। সে নেশায় পেলে মানুষের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে নাকি। শিহাবটা পাগল হয়েছে। যে করেই হোক গন্নাবানুকে তার চাই-ই। সে-জন্যে যদি নিমকহারামী করতে হয় সে তাতেও পিছ পা নয়।

কিন্তু এসব বুঝবার মত বুদ্ধি ওয়াজীরের নেই। তিনি আরও আদর করে এনে শিহাবুদ্দিনকে মির বক্শীর দপ্তরে বসিয়েছেন। দু-একদিন চালচলন লক্ষ্য করা উচিত ছিলনা তার?

ওয়াজীর ভেবেছেন—সাপের মাথায় ধুলো দিয়েছি, আর মাথা তুলতে পারবে না সে। নিজের সিপাহশালার আবু তোরাব খাঁকে কিল্লাদার করে কেল্লার ভেতর পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, হারেমে ঢুকবার দেউড়ীতে নিজের ফৌজ বসিয়ে রেখেছেন—যাতে ইচ্ছামত কেউ ভেতরে যেতে না পারে বা বাইরে আসতে না পারে।

হারামী হল ঐ তওফাওয়ালীটা। ওয়াজীর সেটা জানেন। তাই দু-একদিনের মধ্যে দেখছি ছয় ছয়টা নতুন বাঁদী এসেছে ভেতরে। রহিমার কাছে শুনছি ওরা নাকি ওয়াজীর সাহেবের গুপ্তচর—হজরত কাদিশার উপর নজর রাখবার জন্য কেল্লায় এসেছে। তওফাওয়ালীটার মুখ দেখি

থমথমে। বাজারের মেয়েমানুষ। বুদ্ধিতে সে চৌকস। ঠিক বুঝতে পেরেছে।

৪ঠা রজব। হঠাৎ দেখি খাসমহলের দরজায় খুব ভিড়। হৈ-হুল্লোড়। ব্যাপার কি? গভীর কৌতূহলে তাকিয়ে থাকলাম। আমাদের নিজেদের তো খাসমহলে যাবার উপায় নেই। তওফা-ওয়ালীটা ভাববে খোঁজখবর নিতে এসেছি। আর তাছাড়া আমাদের একটা ইজ্জত আছে। খানদানী বংশের মেয়ে হয়ে আমরা একটা তওফাওয়ালীর ঘরের কাছে যাব কেন। খোঁজ করলাম রহিমার। সে নেই। হারেমের কোথাও কোন ঘটনা ঘটলেই তাকে আর পায় কে। সে বেটী নিশ্চয়ই খাসমহলের উঠানে গেছে। দেখি ব্যাপারটা কি।

কিছুকাল বাদেই বাঁদীটাকে দেখলুম এদিকে আসছে। ও মমতাজ মহলে ঢুকতেই বললুম: ব্যাপার কিরে?

বিরাট একটা খবর আছে রহিমার কাছে। চোখে মুখে তার খুশমেজাজ। সে বলল: হজরত কাদিশার মহলে ওয়াজীর সাহেব ছয়টা বাঁদী পাঠিয়ে দিয়েছেন কিব্‌লা-ই-আলমকে নজরে নজরে রাখবার জন্য। বুঝতে পেরে কিব্‌লা-ই-আলম ঘাড় ধরে মহল থেকে তাদের বের করে দিয়েছেন।

বললুম: তওফাওয়ালীটার সাহস আছে দেখছি। তোদের বাদশা যা পারল না, তার আস্মাজান দেখি তাই করল? বাদশার ঘাড়েও তো কিল্লাদার বসিয়েছেন ওয়াজীর সাহেব। বাদশা তো দেখি চুপ মেরে আছেন। এত মেজাজ এখন নসিবে সইলে হয়।

—হুঁ, সবাই তো তাই বলে বেড়াচ্ছে যে, ওয়াজীর আবার একটা কিছু না করে বসেন।

বললুম: আল্লা জানেন। ঐ তওফাওয়ালীটার মেজাজ মেনে নেওয়া তো তাঁর উচিত নয়।

কিন্তু দু-একদিন কেটে গেলেও ওয়াজীরকে কিছু করতে দেখলুম

না। আমরা ভেবেছিলাম একটা ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবেন। উল্টে তিনি নিজেই দরবারে আসা বন্ধ করে দিলেন। তাহলে ঐ তওফা-ওয়ালীটার মেজাজ দেখে ওয়াজীর সাহেবও ভয় পেয়ে গেছেন নাকি? কিন্তু না, দেখলুম—তওফাওয়ালীটা আর তার লেড়কাটাই ভয় পেয়েছে বেশী।

১০ই রজব সকালবেলা দেখলুম ছেলেকে নিয়ে হারেম ছেড়ে কোথায় যেন বেরুচ্ছেন বিবিজান। কেউ কিছু বুঝতে পারলুম না। এমন কি রহিমা বাঁদী পর্যন্ত কোন খবর দিতে পারল না। অবশেষে সংবাদটা পেলুম সন্ধ্যাবেলা। বাদশা আর কিব্লা-ই-আলম গেছিলেন ওয়াজীরের কাছে নাকে খত দিতে। কসম খেয়ে তাঁকে আবার এনে কেল্লার দরবারে বসিয়েছেন। কথা দিয়েছেন, ওয়াজীরের কথার খেলাপ করবেন না আর কোনদিন। এবারকার মত মাফ করতে হুকুম হয়। তোবা! তোবা!

ওয়াজীর খুব চেপে ধরেছেন। সুযোগ পেলে কে না চেপে ধরে? এখন আল্লার মেহেরবানিতে ঐ তওফাওয়ালীটা খতম হয়তো বাঁচি। ওয়াজীর সাব্ হুকুম করেছেন যে, তাঁর কিল্লাদার তুরাব খাঁ নিজে পাহারা দেবে লাহোর দরওয়াজা, আর খাস দরবারের দরওয়াজা পাহারা দেবে লক্ষ্মীনারায়ণ। কেল্লার ভেতর কে ঢুকবে বা ঢুকবে না, সেটা নির্ভর করবে ওয়াজীরের মর্জির উপর। ওয়াজীরের বেটা মির অতিস সুজা-উদ্দৌলা ছাড়া আর কারো ঢুকবারই উপায় নেই কেল্লায় এখন। ওয়াজীরের হুকুমে ঘোড়ায় চড়ে বা অস্ত্র নিয়ে কেল্লায় কেউ আসতে পারবে না। আমীরদের মর্যাদা নেই? তাঁরা এমনি এমনি আসতে পারেন? ফলে নাকি আর কোন আমীরই আসছেন না দরবারে। আসছেন শুধু সফদর জঙ্গের পেয়ারের লোকেরা।

১লা রজব। নামাজবার। কেল্লার মসজিদে নামাজ পড়তে যাবে আহমদ। কিন্তু একজন আমীর ওম্‌রাও নাকি আসেনি। এমন কি বাদশার দেহরক্ষী ফৌজেরাও নেই কেউ। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে

কখনো ঘটেনি। আমেদ কিল্লাদারকে তলব করে জানতে চেয়েছে, আমীরেরা কই? তুমি তাদের কেল্লায় ঢুকতে দাওনি, না ওয়াজীর বারণ করেছেন?

কিল্লাদার নাকি জানিয়ে দিয়েছে যে, সে কাউকে বাধা দেয়নি। আমীরেরা না এলে সে কি করতে পারে? রেগে গিয়ে আহমদ দরবার ডেকেছে ৩রা আর ৪ঠা রজব। সব আমীরদের হাজির থাকতে হুকুম করেছে সে।

নাজির রজ আফজুন এসেছিলেন সন্ধ্যাবেলা। তিনি মালেকা-ই-জামানীকে বলে গেছেন—হুঁসিয়ার থাকবেন বেগম সাহেবা, বড় গোলমাল হবে মনে হচ্ছে।

মমতাজ মহলের উঠানে হজরত বেগমকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বড় দুর্দান্ত হয়েছে মেয়েটা। যেমন ডানাকাটা হুরীর মত রূপ, তেমনি বাড়-বাড়ন্ত। নজরে নজরে রাখতে হয় তাকে। তওফাওয়ালীটার নজরে পড়লে কি ফুস্ মন্তর করে কে জানে। নাজিরকে দেখে কোন রকমে হজরতকে সামলে নিয়ে কাছে এলাম। মালেকা-ই-জামানী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: কেন, ব্যাপার কি?

রজ আফজুন বললেন: খুব শিগ্গীরই ওয়াজীরের সঙ্গে বাদশার একটা কিছু হয়ে যাবে। বাদশাকে কু-পরামর্শ দিচ্ছে ইনতিজাম আর শিহাবুদ্দিন।

আমি বললুম: শিহাবুদ্দিন তো ওয়াজীরের সাহেবের লোক?

হেসে রজ আফজুন বললেন: সে হল সবচেয়ে শয়তান। কাজ হাসিল করে এখন ভিড়েছে নিজেদের দলে। ওয়াজীরের ওপর সে হাড়ে হাড়ে চটা।

—কেন?

—ওয়াজীর সাহেব সেটা জানেন না। কিন্তু বুঝবেন পরে। আলিকুলির বেটী গন্নাকে দেখে ভুলেছে শিহাব। ভাবছে, ওয়াজীর সাহেবের নিজের স্বার্থ আছে, তাই নিজের বেগম মহলে আটকে রেখেছেন

তাকে। তাকে পেতে হলে ওয়াজীরের সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য। সেই আটঘাট খুঁজছে সে এখন। আপনারা জানেন না, ইতিমধ্যে ক্বিব্লা-ই-আলমের সঙ্গে বেশ কয়েকবার মোলাকাত্ হয়ে গেছে তার। হজরত কাদিশাও ফুঁসলাবার চেষ্টা করছেন তাকে। ছেলেমানুষ হলেও শিহাবের সাহস আছে। আর তার আব্বাজান বেশকিছু টাকাকড়িও রেখে গেছেন তার জন্য। সুতরাং বাদশা আর তার আম্মাজানের এখন শিহাবকেই বেশী প্রয়োজন।

মালেকা-ই জামানী বললেন : তাহলে কি হবে ?

—একটা গোলমাল বাধবেই। তাতে বাদশাও গদিচ্যুত হতে পারেন, নয়তো ওয়াজীর সাহেবেরও ক্ষমতা যেতে পারে। তবে আপনারা জানবেন—আপনাদের বন্ধু ঐ ওয়াজীর সাহেবই।

মালেকা-ই-জামানী গম্ভীর হয়ে গেলেন : হুম্।

তুদিন পরেই দরবারের খবর পেলাম। দেওয়ানী আমে কোন তুরাণী আমীরই হাজির হননি। দরবারে এসেছেন শুধু ইরাণী আমীরেরা। দিল্লীসুদ্ধো তুরাণী আমীরদের নাকি অসুখ করেছে, তাই আসতে পারেন নি। আমি মালেকা-ই-জামানীকে বললুম : ব্যাপারটা কেমন হল ?

মালেকা-ই-জামানী বললেন : শিগ্গীরই একটা কিছু ঘটবে। দেখছ না তওফাওয়ালীটার মুখ কেমন থমথম করছে কয়দিন।

আমরা সবাই সশঙ্কচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই নানা রকম খবর আসতে লাগলো। ৯ই শাবান। খবর পেলাম, দিল্লীর চার মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে তলকটোরাতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মারাঠী ফৌজ এসে শিবির ফেলেছে। মারাঠাদের নামে মোগলদের বড় ভয়। সংবাদ শুনে গা ছম্‌ছম্ করতে লাগলো। চারমাস পরে আরও চার হাজার মারাঠী ফৌজ এসে ২৮শে জেল্কদ কালকা পাহাড়ে ছাউনি ফেলল। মারাঠাদের মনে কি আছে

কে জানে। শুনছি মারাঠারা এখন ওয়াজীর সাহেবের দোস্ত। তাহলে ওয়াজীর সাহেবই তাদের আনালেন নাকি? এদিকে হারেমের অবস্থা তো সাংঘাতিক। দু-বেলা পেট ভরে এখন আমাদের খাওয়া জুটবে কিনা কে জানে। বান্দা-বাঁদীরা মাইনে পায়না দু-বছর। আমাদের রহিমা বাঁদীই মুখ ভার করে ছিল। মালেকা-ই-জামানী নিজের তহবিল থেকে তার এক বছরের মাইনে পুষিয়ে দিয়েছেন। তবে সে মমতাজ মহলের খিদমদ খাটছে।

বড় গাছ যখন পড়ে—সব নিয়ে পড়ে। নিজে ভাঙে, আশেপাশে অপর কেউ থাকলে তাকেও চাপা দিয়ে মারে। মোগল বাদশাহী যখন ডুবতে বসেছে, তখন অনেককে নিয়েই ডুববে। বিপদের উপর বিপদ। রমজান মাসে আবার খবর পাওয়া গেল যে, সেই আবদালী দুষ্‌মনটা পাঞ্জাব দখল করতে আসছে। এবার হয়তো সে দিল্লীতেও এসে পড়বে। শুনে অবধি লালকেল্লা থমথম করছে। ওয়াজীর সাহেব আহমদকে খবর পাঠিয়েছেন যে, বাদশা নিজে যদি আবদালীকে রুখতে পাঞ্জাব যান তো ভাল হয়।

ওয়াজীরও যেমন। যুদ্ধের ঐ তওফাওয়ালীর বাচ্চাটা জানে কি? একবার সে তালেগোলে পাঞ্জাব অবধি গিয়েছিল বলে যুদ্ধ করবার হিম্মত আছে নাকি তার? আর তা ছাড়া মোগল বাদশার ফৌজই বা কোথায়? হারেমের বান্দাদের যে মাইনে দিতে পারেনা—সে ফৌজ পাবে কোথায়? আহমদও নাকি তাই বলে পাঠিয়েছে ওয়াজীরকে: যুদ্ধে কি আমি একা যাব নাকি? আমার আছে কি? রুপিয়া আছে, না তঙ্কা আছে? না আছে ফৌজ?

বাদশার মতই কথা বটে। তোবা! তোবা! কেন—তওফাওয়ালী আম্মাটাকে নিয়ে যা না? খোজাটা থাকতে তখন তো খুব দিল্লাগী করে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করেছে, মাইনে দিয়ে ফৌজ রাখতে পারে নি?

আহমদ নাকি ফৌজ গঠনের জন্যে ওয়াজীরের কাছে টাকা চেয়েছিল। ওয়াজীর তার কোন জবাব দেননি। উল্টে ১৭ই রমজান চিঠি লিখে-

বাদশাকে জানিয়েছেন যে, ২৫শে রমজান ভাল দিন আছে। সেদিন যেন বাদশা নিজের ফৌজ নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে রওনা হয়ে যান। আহমদ জবাব দিয়ে পাঠিয়েছে, আমার দ্বারা হবেনা। যা পারুন করুন। ওয়াজীরের নাকি আর কোন জবাব আসে নি। হায়রে বাদশাহী? এমন কাপুরুষের দেশে বাস করে ফয়দা কি? এখন দেখছি লুঠেরারা যদি লালকেল্লাও লুট করে, এসে কেউ বাধা দেবেনা। নাদির কুলির আমীর সেই মহম্মদ ইয়ার খাঁ ঠিকই বলেছিলেন যে, মোগল আমীরেরা এখন ভেড়ার পাল।

সত্যি, সত্যি, আবদালীটাকে বাধা দেবার কোন চেষ্টাই হলনা। উল্টে হাজার দুই আফগান ফৌজ নিয়ে আবদালীর দূত এসে দিল্লীতে হাজির হল ২৭শে জেল্কদ। অট্টকের কাছে হিন্দুস্থানের সীমান্তে অপেক্ষা করছেন আবদালী। দিল্লীর দরবারে চিঠি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, বর্তমান বছরের জন্য ৫০ লক্ষ রূপিয়া কর দিতে হবে। না দিলে আফগানেরা এসে দিল্লীতে হানা দেবে।

পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা দেবে দিল্লীর বাদশা? তবেই হয়েছে। বলে দু-বেলা খানা জোটেনা! হজরত বেগমকে দু-দিন একছিটে দুধই খাওয়াতে পারিনি। পঞ্চাশ লাখ রুপিয়া থাকলে তো বাদশা নিজেই এগিয়ে যেতে পারতো পাঞ্জাবের দিকে। দরবারে বসে বাদশা নাকি আটদিন সময় চেয়েছে আফগান দূতের কাছে। আটদিন কেন, আট বছর হলেও কিছু করবার ক্ষমতা আছে নাকি তার?

তুরাণীরা ধরেছে ওয়াজীরকে—মারাঠারা তো তোমার দোস্ত। হিন্দুস্থানের চব্বিশটা সুবার চৌথ দিয়েছেন তাদের দিল্লীর বাদশা। এ ছাড়া বাদশার হয়ে লড়বার জন্য আগ্রা আর আজমীরও তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে। আফগানদের বিরুদ্ধে এবার তাদের লড়তে বল?

ওয়াজীর নাকি কথা দিয়েছেন যে, মারাঠা দোস্ত সমেত মোট চল্লিশ হাজার ফৌজ নিয়ে তিনি আবদালীকে বাধা দিতে এগিয়ে যাবেন।

দেখা যাক কি হয়।

বিদেশীকে বাধা দেবে দিল্লী আমীরেরা? তবেই হয়েছে। নিজেদের মধ্যে কাজিয়া করবে কে তবে! দিল্লীতে দেখি খুব একটা গুঞ্জরণ উঠেছে। চারদিকে একটা চাপা উত্তেজনা। ইনতিজামউদ্দৌলার সঙ্গে ওয়াজীরের একটা মারামারি বেধে যায় আর কি। কয়েকটা দিন ধরে দিল্লী থমথম করছে। ৪ঠা মহরম ওয়াজীরের খোজা এসে আহমদের হাতে চিঠি দিয়ে গেল। ওয়াজীর নাকি শুনেছেন যে, রাত্রি-বেলা ইনতিজাম ওয়াজীরের প্রাসাদ দারা স্থকোর মহল আক্রমণ করবে। তিনিও নিজের ফৌজ নিয়ে প্রস্তুত। বাদশা ইনতিজামকে ডেকে পাঠালে ইনতিজাম নাকি জানিয়েছে যে, এ-সব ঝুটা কথা। পরদিন সংবাদটা ছড়িয়ে পড়তেই দিল্লীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। বেনেরা দোকান-পাট ফাঁক করে যে যার মত জিনিসপত্র লুকিয়ে ফেলছে। প্রত্যেকেই যে যার বাড়ি পাহারা দেবার ব্যবস্থা করছে। ইনতিজামের মহলের সামনে নাকি মারাঠারা ঘুর্ ঘুর্ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। একটা গোলমাল হলে লুটতরাজের হিড়িক পড়ে যাবে। লালকেল্লার খাস চৌকি আর জিলাউ-ই-খাস ফৌজেরা কেল্লার ধারে ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। কখন যে কি হয় বলা ছুস্কর। নাজির রজ আফজুনকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তিনদিন আর তিনি এ-মুখোই হচ্ছেন না। আমরা ভেবে ভেবে সারা। অবশেষে তিনদিন পর খবর পেলাম যে, বাদশার হুকুমে যে যার ফৌজ শহরের বাইরে নিয়ে গেছে। হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচা গেল।

সব মিটে গেলে রজ আফজুন এলেন মমতাজ মহলে। বললুম: এতদিন কোথায় ছিলেন? সব মিটে গেছে তো?

নাজির সাহেব হেসে বললেন: মিটলো কি? সবে তো শুরু?

—তার মানে? শুনছি, যে যার ফৌজ সরিয়ে নিয়ে গেছে?

—তা গেছে বটে, তবে ওটা সাময়িক। হুঁসিয়ার থাকবেন। ছু-এক দিনের মধ্যেই গোলমাল বাধবে।

একটা স্বস্তি অনুভব করছিলাম। নাজিরের কথায় সব ভেস্তে গেল। কখন আবার কি ভাবে গোলমাল হয় কে জানে।

৮ই মহরম। সকালবেলা আস্তে আস্তে রহিমা বাঁদী এসে আমায় ডাকলো: হজরত সাহেবা, দেখবেন আসুন। আমি তখন হজরত-বানুকে 'ফিরদৌসির শাহনামা' থেকে গল্প শোনাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি কিতাব বন্ধ করে ফিরে তাকালাম: কি রে?

—দেখবেন, এদিকে আসুন।

—কি?

—ঐ যে···দেখুন।

বাইরে আসবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। হজরত বায়না ধরল: আম্মাজান আমিও যাব।

ধমকে উঠে বললুম: না, তুমি এখন বাইরে যাবেনা। ভেতরে থাক।

রহিমার সঙ্গে আমি বাইরে এলুম।

খাসমহলের উঠানের দিকে হাতের ইশারা করে রহিমা আমায় দেখালো। দেখলুম ষোল সতের বছর বয়সের একটি ছেলে যাচ্ছে খোয়াব ঘরের দিকে। বললুম: লেড়কাটা কে রে?

রহিমা বলল: ও মা! জানেন না? ঐ তো নয়া মির বক্‌শী।

—তার মানে? শিহাবুদ্দিন?

—জী বেগম সাহেবা—গজিউদ্দিন খান বাহাদুর ফিরুজ জঙ্গ আমীর-উল্‌-উমারা ইমাদ-উল্‌-মুল্‌ক।

—আচ্ছা! এই নাকি মির বক্‌শী।

—হ্যাঁ।

—তা ও হারেমের মধ্যে কেন?

—কয়দিন ধরেই তো আসছেন। কি যেন গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌ করছেন কিব্‌লা-ই-আলমের সঙ্গে।

বটে! তবে এর সঙ্গে সাট চলছে তওফাওয়ালীটার? আমি

তাড়াতাড়ি মালেকা-ই-জামানীর কক্ষে ছুটে গেলাম। তাকে সংবাদটা দিতে হবে।

সেদিনই রাত্রির প্রথমপ্রহরে হৈ হট্টগোল শোনা গেল কেল্লার মধ্যে। বাদশার ফৌজেরা চারদিকে সব ছোটাছুটি করছে। মমতাজ মহলের ভেতরে বসে ত্রাসে আমাদের মরে যাওয়ার উপক্রম। রহিমা বাঁদী ওরই মধ্যে সাহস করে বাইরে গিয়ে খবর নিয়ে এল, ওয়াজীর সাহেব নাকি বিরাট ফৌজ নিয়ে কেল্লা আক্রমণ করতে আসছেন। খবর পেয়ে বাদশা হারেমের সব বান্দা আর মনসবদারদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কেল্লার দেয়ালে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছেন। কি হয় কে জানে। বাদশা মির অতিসকে ডেকে হুকুম করেছেন কেল্লার বাইরে তাঁর কামান নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে।

কি হয় কে জানে। আমাদের চোখের ঘুম ছুটে গেছে। আমরা অপেক্ষা করছি মুহুর্মুহু কখন গোলাগুলি ছুটতে আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু, না। আর একপ্রহর কেটে গেলেও কোন গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল না।

অবশেষে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেলে আমরা খবর পেলাম। চুপিচুপি নাজির রজ আফজুন এসে আমাদের জানালেন যে, আর ভয় নেই। এখনই কিছু ঘটছে না আর।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: ওয়াজীর সাহেব চলে গেছেন নাকি?

একটু হাসলেন নাজির রজ আফজুন। বললেন: ওয়াজীর কোথায়? সব মিথ্যে। ভাঁওতা দিয়ে ওয়াজীরের লোক মির অতিস তুরাব খাঁকে কেল্লা থেকে বের করে দিয়েছেন বাদশা।

আমি বললুম: তওফাওয়ালীর বেটার এত বুদ্ধি আছে নাকি মাথায়?

নাজির বললেন: বাদশার মাথায় এত বুদ্ধি হবে কোত্থেকে? বুদ্ধি দিয়েছে ঐ শিহাবুদ্দিন।

—এই জন্যই বুঝি সেদিন মির বকশীটা হারেমে এসেছিল তওফা-ওয়ালীটার সঙ্গে দেখা করতে ?

—আজ্ঞে বেগম সাহেবা।

—কি নিমকহারাম ছেলেটা!

—ঐ মুসায়ের আলিকুলির মেয়েটার জন্যই মির বকশী এত সব কাণ্ড করছে।

—এতে কি ঐ মেয়েটাকে পাবে সে ?

—আল্লা জানেন। মির বকশী ভেবেছে ওয়াজীরকে দিল্লী থেকে হটাতে পারলেই মেয়েটাকে পাবে সে। দেখা যাক এখন কি হয়। ঘটনা যা আরম্ভ হল—তাতে অনেকদূর গড়াবে বলেই মনে হয়।

রজ আফজুন চলে গেলেন।

আমরা একটু মন খারাপ করে বসে রইলুম। কেল্লার উপর থেকে ওয়াজীরের প্রভাব কমে গেল। এবার তওফাওয়ালীটার পোয়া বার।

পরদিন সকালবেলা শুনলাম বাদশা নিজের মাথার পাগড়ি খিলাৎ পাঠিয়েছে ওয়াজীরকে। সে বোধহয় ভয় পেয়ে গেছে। আরও কিছুক্ষণ পরে শুনলুম, ওয়াজীর নোকরি ছেড়ে দিয়ে বাদশার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি লিখেছেন : শাহেন শা যখন আমার উপর অখুশ তখন আমাকে যেখানে খুশী যাবার হুকুম করুন। আমার নিজের টাকাকড়ি যা পাওনা আছে তা থেকে আমার ফৌজেদের মাহিনা মিটিয়ে দেবেন। জাঁহাপনার খুশীমত ওয়াজীরের পদ যাকে খুশী দিতে পারেন।

আমি মালেকা-ই-জামানীকে বললুম : এবার বোধহয় আহমদটা ভয় পেতে পারে'।

মালেকা-ই-জামানী বললেন : ভয় পাবে কি ? তার পরামর্শ দাতারা নেই ? ওয়াজীর যাতে নোকরি ছেড়ে দেন এ-জন্যেই তো তারা এ কাজ করছে।

বিরাট একটা উৎকণ্ঠায় রইলুম আমরা। দেওয়ানী আমে তুরাণী-

-দের নিয়ে বৈঠক বসেছে। আহ্‌মদ কি সত্যি সত্যি এ-চিঠি পেয়ে ওয়াজীরকে ছাড়িয়ে দেবে ? রহিমা বাঁদীকে বললুম : খবরটা জেনে দিতে পারিস ?

সে বলল : নিশ্চয়ই বেগম সাহেবা। হুকুম করেন তো এখনি সব জেনে আসতে পারি।

মালেকা-ই-জামানী বললেন : সাবধান। আমরা যে তোকে পাঠিয়েছি এ-খবর যেন কেউ না জানে।

রহিমা বলল : নিশ্চিন্ত থাকুন বেগম সাহেবা। এ-খবর কেউ জানবে না।

রহিমা চলে গেল।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম।

খবর পেতে খুব বেশী বিলম্ব হলনা। জানতে পারলুম, বাদশা সঙ্গে সঙ্গে ওয়াজীরের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন। তবে ওয়াজীরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তার সম্পত্তির উপর হাত দেওয়া হবেনা। নিজের সুবা অযোধ্যাতে গিয়ে তিনি থাকতে পারেন। বাদশা নাকি খিলাৎ নেবার জন্য তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শেষ খবরটা পেয়ে মালেকা-ই-জামানী গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি বললুম : কি হল বেগম সাহেবা ?

মালেকা-ই-জামানী বললেন : এখনো বুঝতে পারছ না ? ওয়াজীরকে একবার কেল্লার ভিতর আনতে পারলে খতম করে দেবে তুরাণীরা।

—তাহলে ?

—যে করেই হোক ওয়াজীর সাহেবকে একটা খবর পাঠাতে হবে।

—কিন্তু কেল্লার বাইরে কাকে পাঠাবেন ?

—তাই তো ভাবছি।

কিছুক্ষণ মালেকা-ই-জামানী কি ভাবলেন। তারপর রহিমাকে কাছে ডাকলেন : শোন্‌।

রহিমা কাছে এগিয়ে এল।

মালেকা-ই-জামানী বললেন : তোকে আমি নিজে বাঁদী রেখেছিলাম মনে আছে তো ?

—জী বেগম সাহেবা।

—তোর মাইনে আমি দেই। দেওয়ানী থেকে আসে না জানিস তো ?

—জী মালেকান।

—তোকে আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারি ?

জিব কেটে রহিমা বলল : খুদার কসম বেগম সাহেবা, নিমক-হারামী করব না কোনদিন।

—কসম খেয়েছিস—মনে থাকবেতো ?

—জী বেগম সাহেবা।

—তাহলে শোন্। তোকে একটা চিঠি দেব। চিঠিটা ওয়াজীর সাহেবের কাছে পৌঁছে দিবি। কেল্লার বাইরে তোকে যেতে দিচ্ছে তো ?

—জী বেগম সাহেবা।

—তাহলে একটু অপেক্ষা কর।

মালেকা-ই-জামানী মহলের ভেতর ঢুকে গেলেন। খানিকক্ষণ কি করলেন। বোধহয় ওয়াজীরের কাছে খুব সাবধানে একটা চিঠি লিখলেন—তারপর চিঠিটা নিয়ে বাইরে এসে রহিমার হাতে দিয়ে বললেন : এটা ওয়াজীরের কাছে পৌঁছে দিবি।

—জী বেগম সাহেবা।

—এই নে, দুটো আসরফি দিলাম। কাজ হাসিল করে ফিরলে আরও পাবি।

—জী বেগম সাহেবা।

আসরফি দুটো হাতে পেয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মালেকা-ই-জামানীকে কুর্ণিশ জানাল রহিমা। তারপর দ্রুত দিল্লী-দরওজার দিকে ছুটে গেল।

আমি বললুম : কাজটা কি ভাল হল ? ও যদি নিমকহারামী করে ?

মালেকা-ই-জামানী বললেন : না, তা করবে না।

কি জানি, কি হয়। তবু কেমন একটা ভয়ে ভয়ে থাকলাম যেন।

না, রহিমা নিমকহারামী করেনি। চিঠিটা ঠিকই ওয়াজীরের হাতে পৌঁছে দিয়েছিল। ওয়াজীর খিলাৎ নিতে আর কেল্লার ভেতর আসেন নি। বরং আম-দরবারই ওয়াজীরের কাছে খিলাৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন ওয়াজীর সাহেব কি করবেন সেটাই সকলের চিন্তা।

ওয়াজীর বোধহয় ভাবতেও পারেন নি যে, বাদশা সত্যিসত্যি তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে খিলাৎ পাঠাবেন। হয়তো দরবারেই ঢুকতেন তিনি। কিন্তু মালেকা-ই-জামানীর চিঠি পেয়ে আর ঢোকেন নি। দারা সুকোর মহলেই আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করে তিনি বুঝেছেন যে, বাদশা এবার তুরাণী দলের কব্জায়। সত্যিসত্যিই ওয়াজীর পদত্যাগ করুন তিনি এটাই চান। অবশেষে ১৭ই মহরম দারা সুকোর মহল থেকে তিনি দিল্লী ছেড়ে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। আগেই কিছু সংখ্যক ফৌজ আর শিবির পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি মুরাবাদের দিকে। এবার নিজেই বেরুলেন।

বেলা প্রথম প্রহরেই ওয়াজীর সাহেব বেরিয়ে পড়েছিলেন। কেল্লার উপর থেকে এ-দৃশ্য দেখতে পেয়েই রহিমা বাঁদী ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে এসে বলল : বেগম সাহেবা, ওয়াজীর সাহেব দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—দেখবেন আসুন।

হজরত বেগমকে নিয়ে মমতাজ মহলের উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার কিনারে ছুটে গেলাম আমি। মালেকা-ই-জামানীও এলেন।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। দিল্লীতে তো কখনো বড় একটা বৃষ্টি দেখি না। তাহলে আশমানটাও ওয়াজীর সাহেবের জন্য কাঁদছে নাকি আজ? কেল্লার ধারে গিয়ে দেখলাম—নিজের হারেমের বান্দা, বাঁদী, ফৌজ, সব নিয়ে বিরাট মিছিল করে চলেছেন ওয়াজীর সাহেব। এত বড় একটা মিছিল সম্পূর্ণ নিঃশব্দে চলেছে। যেন খোয়াব দেখছি। খোয়াব দেখলে যেমন শব্দ শোনা যায় না, ঠিক তেমনি। ওয়াজীর যাচ্ছিলেন আগে আগে হাতীর পিঠে চেপে।

কিছুদূর গিয়ে দেখলুম হাতীটা থমকে দাঁড়াল। কেন? আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলুম। কিছুক্ষণ পরে দেখলুম হাতীটা হাঁটু গেড়ে বসছে। হাতীরা যেমন করে 'বাদশা সালামত্' জানায় ঠিক তেমন ভঙ্গী। বুঝলুম দিল্লী ছেড়ে যাবার আগে শেষবার বাদশাকে সালাম জানিয়ে যাচ্ছেন ওয়াজীর সাব্। দেখে যেন আমাদের চোখ দুটোও ভিজে উঠল। আর দাঁড়ালাম না, তাড়াতাড়ি মমতাজ মহলে চলে এলাম।

সারাটা দুপুর আমরা মমতাজ মহলে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকলাম। কান পেতে থাকলাম খাস মহলের খোয়াব ঘরের দিকে আর দেওয়ানী খাসের চত্বরে—কখন উৎসবের হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ হয়ে যায় তাই শুনবার জন্যে। এত বড় একটা জয় হয়েছে তওফাওয়ালীটা আর তার বাচ্চার—আনন্দে উৎসব করবে না? কিন্তু সে-রকম কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। আমাদের বেশ অবাক লাগলো।

সন্ধ্যাবেলা আবার চুপিচুপি নাজির রজ আফজুনকে দেখলুম মমতাজ মহলে। মালেকা-ই-জামানী আর আমি চুপ করে বসে-ছিলাম। মহলে ঢুকে রজ আফজুন আমাদের সালাম জানালেন: সালাম বেগম সাহেবা।

আমি বললুম: আসুন খাঁ সাহেব। ওয়াজীর তাহলে চলে গেলেন?

— জী বেগম সাহেবা।

—একটুও বাধা দিলেন না?

—আল্লা জানেন, এখনো কিছু বলা যায় না।

—তওফাওয়ালীটা তো আমোদ-ফুর্তি করছে না আজ?

—আমোদ-ফুর্তি বেরিয়ে গেছে বেগম সাহেবা।

—কেন?

—মির বক্শী বলছেন ওয়াজীর সাহেবকে এমনি যেতে দেওয়া হবে না। আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু সে হিম্মত কিব্লা-ই-

আলম আর বাদশার আছে নাকি? তারা চুপ করে আছেন।

—তা শিহাবের এত সাহস হল কোত্থেকে যে যুদ্ধ করবে?

—না করে উপায় কি বেগম সাহেবা। যে-জন্যে নিমকহারামী করা সে জিনিষই যে সে পেল না।

—কি?

—সেই মুসায়েরের মেয়েটা। ওয়াজীর সাহেব যে আলিকুলির মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

—আহা রে। তাই নাকি?

—হ্যাঁ, বেগম সাহেবা। মির বক্‌শী তো পাগল।

—তাহলে একটা যুদ্ধটুদ্ধ হয়ে যেতে পারে বলুন?

—তা পারে। না হলে তো মির বক্‌শী বাদশা আর কিব্‌লা-ই আলমের উপর ক্ষেপে যাবেন। তখন সামলাবে কে?

—সেই জন্যেই বুঝি তওফাওয়ালীটা চুপ?

—জী বেগম সাহেবা।

—শেষ পর্যন্ত কাফের জেনানাটা মির বক্‌শীর হাতেই খতম হবে একথা আপনাকে বলে রাখলুম নাজির সাহেব।

—আল্লা জানেন কি হবে। তবে এ-বাদশাহী যে আর টিকবে না তা বুঝতে পারছি।

রজ আফজুন যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন—তেমনি নিঃশব্দে চলে গেলেন।

আমরা আবার ভাবতে লাগলুম।

ছ'সপ্তাহ কেটে গেছে। ওয়াজীর সাহেব রাজধানী ছেড়ে গেলেও এখনো শহরের আশপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদিকে শিহাবুদ্দিনও প্রস্তুত। কিন্তু কোন ঘটনা ঘটছে না। ওয়াজীর হয়তো ভাবছেন—তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করবেন কিনা। ওদিকে মির বক্‌শী তো রোজই

জোর তাগাদা দিচ্ছে বাদশাকে—ওয়াজীরকে আক্রমণ করার জন্যে। বাদশা আর নতুন ওয়াজীর ইনতিজামের যুদ্ধকে বড় ভয়। তারা ভাবছে —ওয়াজীর ভালয় ভালয় চলে গেলে আর হৈ-হুল্লোড়ের প্রয়োজন কি। ওদিকে মারাঠা আর আফগানদের দলে ভিড়াবার জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দিল্লী-দরবার। কি হবে কেউ বলতে পারছে না।

অবশেষে যুদ্ধই আরম্ভ হয়ে গেল। নতুন মির বক্‌শী ওয়াজীরকে হুকুম পাঠালে, তিনি যেন পত্রপাঠ মুসায়ের আলিকুলি আর তার কন্যাকে দিল্লী পাঠিয়ে দেন। নইলে জব্বর শাস্তি ভোগ করতে হবে। ওয়াজীর সাহেব এর উত্তর দিলেন তার জাঠ দোস্তদের দিয়ে যমুনার পূব পারে বাদশার খাসমহল লুঠ করে। শহরে হৈ হৈ পড়ে গেল। একদিনেই গমের দানার দাম উঠলো চারগুণ। বাদশা হুকুমনামা পাঠালো ওয়াজীরকে: এসব বন্ধ করুন। ওয়াজীর লিখে পাঠালেন: মির বক্‌শী আর নতুন ওয়াজীরকে কেল্লার বার করে দিন—তবে কথা।

তোবা! বাদশার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত। এর পরেও যুদ্ধ না করে সে চুপ করে আছে?

১২ই শফর। লাহোর দরওয়াজার কাছে খুব গোলমাল শুনলাম। ওয়াজীর সাহেব কেল্লা আক্রমণ করেছেন নাকি দেখবার উদ্দেশ্যে মহল ছেড়ে কেল্লার ধারে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য বাইরে এলাম। এমন সময় দেখি রহিমা ছুটে আসছে। বললুম: কি হয়েছে রে?

হাঁফাতে হাঁফাতে রহিমা বলল: ইনতিজামউদ্দৌলা আর মির বক্‌শী পাল্কী করে কেল্লায় আসছিলেন। ওয়াজীর সাহেবের দুই গোলন্দাজ যমুনা পার হয়ে এপারে এসে গুলি ছুঁড়েছে। অল্পের জন্য মির বক্‌শীর মৌলানা অকিবৎ মহম্মদ বেঁচে গেছেন। তিনি ছিলেন পিছনে। ওয়াজীরের গোলন্দাজদের একজন যমুনায় লাফিয়ে পড়ে ওপারে চলে গেছে। আর একজন ধরা পড়েছে। তুরাণীরা তার পেটে ছোরা মেরে তাকে খতম করে ফেলেছে।

বললুম: তাই নাকি? তারপর?

—মির বক্‌শী বলেছেন, বাদশা সঙ্গে যান আর না যান তিনি একাই ওয়াজীরের সঙ্গে লড়বেন। তাকে তিনি দেখে নেবেন।

বুঝলুম, এই আরম্ভ হে'ল। এখন ঘটনা গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কে জানে। এখনই শুনছি দিল্লীতে দানাপানির দাম আগুন। শেষে হয়তো কেল্লাতে কোন খাবারই পাওয়া যাবে না।

ওয়াজীর বোধহয় ভালমতন লড়বেন বলেই ঠিক করেছেন। ওয়াজীরের জাঠ দোস্ত ফকির রাজেন্দ্র গিরি ১৭ই শফর যমুনার ধারে নাগলি গ্রামের তুরাণীদের ঘরবাড়ি লুঠ করলেন। সমস্ত শহরে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। ভয়ে লোকে অস্থির। বাদশা ওয়াজীরের আত্মীয় স্বজনের কাছে আবেদন পাঠালো তারা যেন ওয়াজীরকে শান্ত করেন। কিন্তু ওয়াজীর জানিয়েছেন, বাদশা যদি সমস্ত রাজপদ থেকে তুরাণীদের তাড়িয়ে দেন তবেই শান্তি হতে পারে।

বাদশা এখন তুরাণীদের হাতের মুঠোয়। তারা এসব ছাড়ে নাকি! বিশেষ করে মির বক্‌শী তো যুদ্ধই চায়। বাদশাকে চাপ দিয়ে সে ওয়াজীরের পুত্র নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলাকে মির অতিসের পদ থেকে হটিয়ে দিলে। ওয়াজীরের জাঠ দোস্তরা দিল্লীর বাজার লুঠ করে তার জবাব দিলে। দলে দলে লোকেরা এসে কেল্লার চারদিকে আশ্রয়ের জন্য ভিড় জমালে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ২২শে শফর তারই উপর ওয়াজীরের দোস্তেরা সইদারা, বিজল মসজিদ, তারকাগঞ্জ আর আবদুল্লানগর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে। লুঠেরারা এগুতে এগুতে একেবারে নয়া শহরের দরজা পর্যন্ত লুঠ করে গেল। দিল্লীর ভয়ার্ত মানুষের কণ্ঠে শুধু এক কথা—'জাঠ গর্দি' 'জাঠ গর্দি'। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে মির বক্‌শী তার দলবল নিয়ে বেরুলেন লুঠেরাদের বাধা দেবার জন্য। গোলা বারুদের ধূয়ায় আশমান ভরে গেল। চারদিকে শুধু বারুদের গন্ধ। নাদির কুলির আক্রমণেও দিল্লীতে বুঝি এমন বিশ্রী অবস্থা হয়নি। কেল্লার সামনের ময়দানে যেন বাজার বসে গেছে। লোকজনেরা পালিয়ে এসে সেখানে জড় হয়েছে। বাদশা

হুকুম করেছে, চাঁদনীচকের সাহিবাদবাগে যেন তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়।

এদ্দিনও আহমদ প্রকাশ্যে ওয়াজীরকে তার পদ থেকে হটিয়ে দিতে সাহস করেনি। দিল্লী লুঠ হবার পর রেগে গিয়ে সে ইনতিজামকে ওয়াজীরের পদটা দিয়ে দিলে। ইনতিজামের নতুন নাম হল খান বাহাদুর ইতিমাদউদ্দৌলা। শিহাবকে দেওয়া হল—নিজাম-উল্-মুলক আসফ ঝা উপাধি।

ওদিকে ওয়াজীর তওফাওয়ালীটার বাচ্চাকে শাহেনশা বলে মানবেন না বলে একজন খোজাকে তক্তে বসিয়ে 'পাদিশা' বলে সেলাম জানিয়ে তার নাম দিলেন—আকবর আদিল শা। রটিয়ে দিলেন, সে নাকি আলমগীরের পুত্র শাজাদা কামবক্সের নাতি। তিনি নিজে হলেন নয়া বাদশার ওয়াজীর। আহমদের হুকুমনামা আর মানে কে?

মির বক্শী ইমাদ উল্‌ মুল্‌ক তা শুনে ক্ষেপে লাল। সে বলেছে নিমকহারাম রাফিজি ওয়াজীর সফদর জঙ্গকে সে কোতল করবেই। সমস্ত সুন্নী মুসলমানদের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে সে। বিরোধটা এখন সিয়া সুন্নীতে দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ যে মেয়েছেলেটার জন্য তার এত কাণ্ডকারখানা সে বেটীই তো সিয়া মুসায়েরের কন্যা। অবশ্য নতুন মির বক্শী নাকি মুসায়েরটাকে জালিম বলে গালাগাল দেয়নি। বরং খিলাৎ পাঠিয়ে মির তুজুক করেছে। কিন্তু সে খিলাৎ এখন সিয়ারা নেয় নাকি? মুসায়ের আলিকুলি সে খিলাৎ ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। ইমাদের আরও জেদ চেপে গেছে, ঐ মুসায়েরের বেটী গন্না বেগমকে তার চাই-ই।

লড়াই বেশ জমবে, বোঝাই যাচ্ছে। মির বক্শী তার আব্বাজানের জমানো সমস্ত টাকাকড়ি লাগিয়ে দিয়েছে ফৌজেদের পেছনে। বিরাট এক বাদাকশী ফৌজ এসে জড় হয়েছে। মির বক্শীর হুকুমে ইরানী সিয়াদের অনেক ঘরবাড়ি লুঠ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

তওফাওয়ালীটাকে দেখছি শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে

এগিয়ে এসেছে। ঝরোকায় এসে অনবরত সলাপরামর্শ করছে আমীরদের সঙ্গে। টাকা পয়সা যা গুছিয়েছিল, কিছু কিছু দেখি বার করছে। তার চাইতেও বেশী ভাঙছে হারেমের আসবাব পত্র। সোনা রূপার বাসন আর কিছু থাকলো না বোধহয়। গালিয়ে গালিয়ে আসরফি আর তঙ্কা হবার জন্য টাকশালে চলে যাচ্ছে। দেখলে সত্যি মায়া লাগে। বাদশা শাহাজান যদি কবর থেকে টেরও পান এসব, জ্বলে পুড়ে মরবেন। ভাগ্যি তাকে কবর দেওয়া হয়েছে আগ্রার তাজমহলে।

২৯শে শফর থেকে নিত্য গোলমাল শুরু হয়ে গেল আশেপাশে। এই ওয়াজীর দিল্লীতে হানা দেন তো মির বক্শীর ফৌজ কেল্লা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাদের তাড়া করে। মুসায়েরের বেটীর জন্য মির বক্শী পাগল। বাঁচিমরি জ্ঞান নেই। সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওয়াজীরের ফৌজ দেখলেই।

আমাদের হজরত বান্নু দেখি কয়দিন প্রহরের পর প্রহর ধরে আর্শীতে মুখ দেখছে। বেশ ডাগরডোগরটি হয়ে উঠেছে তো। বোধহয় গন্নাবান্নুর কথা শুনে মনের মধ্যে ওর একটা ঈর্ষা জেগেছে। নিজের মুখ দেখে সে বুঝতে চায় তার চেয়ে খবসুরত সারা হিন্দুস্থানে কেউ আছে কিনা।

ওয়াজীরের ফৌজেরা দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা দখল করে নিয়েছে। কেল্লা আর কোটলাতে কয়দিন ধরেই গুলি বিনিময় চলেছে। কখন যে একটা ঘাড়ের উপর এসে পড়ে কে বলবে। খাসমহলে আহমদ আর তার তওফাওয়ালী আম্মার মত আমাদেরও প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত। একটা কিছু এদিক ওদিক হলে, কে যায় আর কে থাকে।

২৬শে রবিঃল আউয়ল তুরাণীদের মধ্যে বেশ একটা আনন্দ লক্ষ্য করলুম। খবর পেলুম যে ঈদ্‌গার কাছে বড় লড়াইয়ে মির বক্শীর কাছে ওয়াজীর সাহেব হেরে গেছেন। দুদিন পরে আরও খুশীর খবর এল তুরাণীদের কাছে—ওয়াজীরের ডান হাত জাঠদের রাজেন্দ্রগিরি

গোঁসাই বাদাকশী ফৌজের গুলিতে মারা গেছেন। ওয়াজীর সাহেব একেবারে মুষড়ে পড়েছেন।

তওফাওয়ালীটা'র নসিব বুঝি খুশমেজাজ। ৩রা জমা-য়ল খবর পেলাম ওয়াজীর দিল্লীর কাছ থেকে ১৫ মাইল দূরে সরে গেছেন। বাদাকশী ফৌজেরা যমুনা থেকে কালকা পাহাড় পর্যন্ত বিরাট পরিখা খুঁড়ে এগিয়ে গেছে। কিন্তু তাহলে কি হয়, ওয়াজীরের জাঠ দোস্তেরা ক্ষেপে গিয়ে যা খুশী তাই করতে আরম্ভ করেছে। 'জাঠগদি'তে চতুর্দিক ছারেখারে গেছে। বাদশাহী ফৌজেরা যে রুটি খাবে সে সংস্থান নেই। খাদ্যশস্য কিছুই আসতে পারছে না দিল্লীতে। এদিকে মির বক্‌শীও প্রায় ফতুর হবার উপক্রম। তার যুদ্ধের আগ্রহ দেখে নয়া ওয়াজীর ইনতিজ্জাম আর ঐ তওফাওয়ালীটা হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ১লা রজব সে নাকি হারেমে এসে বলে গেছে, টাকা পয়সা না দিলে যুদ্ধ আর চলবে না। কিব্‌লা-ই-আলম যেন তাহলে অন্য সিপাহশালার দেখেন।

শুনে মালেকা-ই-জামানী একটু খুশী হলেন। বললেন: 'ওয়াজীর সফদর জঙ্গকে খবরটা দিতে পারলে হতো।' কিন্তু খবর দেবে কে? জাঠেরা যা আরম্ভ করেছে তাতে যমুনা ছাড়িয়ে কেউ ওদিকে গেলে কাঁধের উপর তার মাথা থাকবে নাকি?

শুনলুম, ভয় পেয়ে আহমদ সফদর জঙ্গের সঙ্গে একটা মিটমাট করবার চেষ্টা করেছিল। তা হয়নি। ১৬ই রজব শুনলুম সফদর জঙ্গ জব্বর আক্রমণ করেছেন বাদশাহী ফৌজকে। কিন্তু যুৎ করতে পারেন নি। মির বক্‌শীটা মরিয়া হয়ে লড়ে কোন রকমে বাদশাহী ফৌজের মান বাঁচিয়েছে। সফদর জঙ্গ হটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বল্লভগড়ে। কিন্তু মির বক্‌শী জয়লাভ করেও কিছু করতে পারেন নি। টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেছে, নতুন ফৌজ চাই। আর দু-একদিন যুদ্ধ চালালেই সফদর জঙ্গ খতম হবেন। বারবার সে খবর দিচ্ছে কেল্লাতে—বাদশা যেন স্বয়ং কেল্লা থেকে ফৌজ নিয়ে বেরোন। বেরুলেই কাম ফতে।

কিন্তু আহমদ বেরুবে যুদ্ধে ? তবেই হয়েছে। সে মোটেও বেরোয় নি।

১৩ই রবিয়স সানি ইদ্‌গা থেকে মির বক্‌শী নিজেই নাকি কেল্লায় এসে কিব্‌লা-ই-আলমের সঙ্গে চটাচটি করে গেছে। টাকা পয়সাও দেবে না, বাদশাও যুদ্ধে যাবে না, তাহলে মির বক্‌শীকে নিঃশেষিত করবার দরকার ছিল কি ? কিন্তু আহমদ আর তার আম্মাজান সে কথার কোন জবাবই নাকি দেয়নি।

জবাব দেবে কি ? পরে সব শুনলুম নাজির রজ আফজুনের কাছে। ইনতিজাম নাকি বাদশাকে বুঝিয়েছে যে, যে হারে মির বক্‌শী সাফল্য অর্জন করছে—তাতে সে যদি ওয়াজীর সফদর জঙ্গকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে পারে, তাহলে তাকে আটকানো দায় হবে। বরং ওয়াজীর সফদর জঙ্গের সঙ্গে একটা মিটমাট করে তাকে বাঁচিয়ে রাখাই ভাল। মির বক্‌শীকে একমাত্র সে-ই আটকাতে পারবে। কিন্তু সেকথা কি আর মির বক্‌শী জানে ? সে তো ঐ মুসায়েরের বেটীটার জন্য পাগল হয়ে লড়েই যাচ্ছে। ভাবছে, এই বুঝি বাদশা আর কিব্‌লা-ই-আলম টাকা পয়সা বা ফৌজ পাঠালো তার জন্যে। কিন্তু সত্যি কিছু যাচ্ছে না দেখে আবার ১০ই জমা-য়ুল সে এসে শেষবার অনুরোধ জানিয়ে গেছে তাদের। আর একটি মাত্র ঘা দিতে পারলেই নাকি সফদর জঙ্গ হাঁটু গেড়ে বসে পড়বেন। বাদশা যেন অন্তত একবারের জন্যও কেল্লা থেকে ফৌজ নিয়ে বেরোন।

কিন্তু বাদশা তো যাবে না বলে ঠিকই করেছে। সে রাজি হয়নি। তওফাওয়ালীটা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনমতে ফেরৎ পাঠিয়েছে মির বক্‌শীকে। ওদিকে তলে তলে জয়পুরের রাজা মাধোসিংকে পাঠিয়েছে তারা সফদর জঙ্গের কাছে একটা মিটমাট করবার জন্যে। হায় রে বেয়াকুব মির বক্‌শী! যখন এসব জানতে পেল সে তখন কাজ হাসিল হয়ে গেছে।

২৫শে শাবান। রাজা মাধোসিংয়ের কর্মচারী ফত্‌ সিং বাদশার ফরমান আর খিলাৎ নিয়ে গেছে সফদর জঙ্গের কাছে। খবর পেয়ে

মির বক্‌শী ছুটে এসেছে দরবারে। আহমদকে খুব চেপে ধরেছে সে :
—এর অর্থ কি ?

শুনে আহমদ নাকি আশমান থেকে পড়েছে। বলেছে, সে এর কিছুই জানেনা। ওদিকে নয়া ওয়াজীর ইনতিজামও নাকি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারছে না। সে বলছে, হয়তো রাজা মাধোসিংকে বাদশা যে খিলাৎ পাঠিয়েছিলেন, সে খিলাৎ-ই তিনি সফদর জঙ্গকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কাউকে কিছু না জানিয়ে।

কিন্তু যে-ই পাঠাক না কেন খিলাৎ, এর অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ বন্ধ। তাহলে নিজের যথাসর্বস্ব খুঁইয়ে মির বক্‌শীর লড়াই করবার প্রয়োজন ছিল কি ? মুসায়েরের বেটীকেও তো পাওয়া গেল না। তাকে নিয়ে সফদর জঙ্গ যাবেন এখন অযোধ্যাতে। নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলা হয়তো আঁখে সুর্মা মেখে সাদী করবে তাকে। হায় রে নসিব !

কিন্তু আল্লা যা করেন ভালর জন্যেই। শুনছি মির বক্‌শী নাকি শেষ পর্যন্ত সব ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। সে বলেছে, বাদশা আর কিব্‌লা-ই-আলমকে সে দেখে নেবে। তাই যেন হয়। তওফা-ওয়ালীটাকে ধরে সে যদি গোর দেয় তো জামি মসজিদে সিন্নি পাঠাব আমি।

॥ ১০ ॥

কথায় বলে শয়তানের বিচার হয় তাড়াতাড়ি, আল্লাতালার বিচার ধীরে ধীরে। তওফাওয়ালীটা ভেবেছিল কেল্লা মাৎ। কাজ হাসিল করে সে মির বক্‌শীকে অষ্টরম্ভা দেখাবে। কিন্তু তার সে গুড়ে বালি পড়েছে। খুব রেগে গেছে মির বক্‌শী। তার তাজা রক্ত, অল্প বয়েস। এত করল সে সেই মুসায়েরের মেয়েটার জন্য অথচ তওফাওয়ালী আর বাদশার নয়া ওয়াজীর কিনা ষড়যন্ত্র করে তাকেই করে দিল হাত ছাড়া। চৌদ্দ পুরুষের টাকাকড়ি মির বক্‌শী তবে ব্যয় করল কিসের জন্য ?

সব সে জেনে ফেলেছে। সে জেনে ফেলেছে যে, গোপনে সফদর জঙ্গের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ইনতিজাম আর বাদশা তাকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে দিয়েছে। মির বক্শী যে-রকম একের পর এক ঐ ঘাগু-ওয়াজীরটাকে হটিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল—তাতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল তারা। ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত বা সব ক্ষমতা মির বক্শী নিজেই দখল করে নেয়। এ বিশ্বাসঘাতকতা শিহাবুদ্দিন কখনো ভুলবে না।

আম দরবারে নাকি মির বক্শী বেশ চোখ রাঙিয়েই কথা বলেছে বাদশার সঙ্গে। বলেছে, তাহলে তার সিনদাগ ফৌজের মাইনেটা এবার মিটিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু তা দেবার হিম্মত আছে নাকি তওফাওয়ালীর বাচ্চাটার? কোন সুবা থেকে এক কানা কড়িও রাজস্ব আসছে না। বাদশার সম্বল শুধু দিল্লীর আশেপাশের খাস জমিন। এবার মির বক্শীটার সঙ্গে নিশ্চয়ই লাগবে। লাগুক, লাগুক, খুব করে লাগুক।

বাদশা আর তার নয়া ওয়াজীরের কথা হল—মির বক্শী তো নিজের সুবা থেকেই তার ফৌজেদের মাইনে দিতে পারে। কিন্তু মির বক্শী সেটা দেবে কেন? এ-যুদ্ধে তার ফয়দা হয়েছে কি? সে তা' শুনতে রাজি নয়। সে ভয় দেখিয়েছে যে, বাদশা যদি টাকা না দেয় তো সিন্দাগ ফৌজেদের সে কেল্লার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত বাদশা নাকি পনের লক্ষ রুপিয়া মির বক্শীকে দিয়েছে। কিন্তু সে সেটা নিজে আত্মসাৎ করে সিন্দাগ ফৌজেদের সত্যিসত্যি কেল্লার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। তাই বল। আমরা কি ছাই এত কিছু জানতুম। তাইতো কয়েকদিন যাবৎ কেল্লার দরওয়াজাতে হৈ-হুল্লোড় শুনছি। দেখছি আম দরবার বসছে না। হারেমের মধ্যে তওফা-ওয়ালীটার ঘরে আহমদ চুপিচুপি বসে আছে। ওয়াজীর ইনতিজামও নাকি বেরুচ্ছে না ঘর থেকে। মির অতিস, মির তুজুক, দেওয়ান, নাজির, সবাই ভয়ে তটস্থ। সিন্দাগরা নাকি গালাগাল করে কারো

আর ইজ্জত রাখছে না। বাদশা যে আর ঝরোকায় গিয়ে সালামত্ নেবে সে বুকের পাটা তার নেই। তওফাওয়ালীটারও দেউড়ীতে গিয়ে দরবার বসানো বন্ধ হয়ে গেছে।

নাজির রজ্জ আফজুনের ভয় আর সঙ্কোচ অনেকটা কেটেছে। আগে আমাদের মমতাজ মহলে আসতে ঐ তওফাওয়ালীটার কথা সাতবার করে তিনি ভাবতেন। কিন্তু এখন দেখছি সবার চোখের উপর দিয়েই তিনি আসছেন। অভিজ্ঞ লোক। হয়তো বুঝেছেন, তওফাওয়ালীটার বাচ্চা আহমদ বাদশার জমানা খতম হতে আর দেরী নেই। ২৩শে জেল্কদ। দেখলুম মালেকা-ই-জামানীকে সালামত্ জানাবার জন্য দিনদুপুরেই আমাদের মহলে এসেছেন তিনি। ওদিকে তখনো মির বক্শীর সিন্দাগ ফৌজেদের হল্লা চলেছে কেল্লার দরজাতে। নাজিরকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললুম: —খবর কি খাঁ সাহেব, বলুন ?

মৃদু হেসে আমাকে সালাম জানিয়ে তিনি বললেন: কি খবর চান, বলুন ?

বললুম: কেল্লার দরজাতে এত হল্লা কেন ?

নাজির বললেন: জানেন না বেগম সাহেবা ? এ হল্লা তো কয়দিন ধরেই চলেছে।

—ব্যাপার কি ?

—মির বক্শীর সঙ্গে বাদশা, কিব্‌লা-ই-আলম আর নয়া ওয়াজীরের বিরোধ চলেছে।

—কেন ?

—সেতো সবই জানেন বেগম সাহেবা। কাজ হাসিল করে কিব্‌লা-ই-আলম আর ওয়াজীর এখন মির বক্শীকে তেমন আমল দিচ্ছেন না। সফদর জঙ্গ তো পালিয়ে যেতে পারলেন ওদের জন্যেই। নইলে মির বক্শীর কাছে নির্ঘাৎ তার পরাজয় ঘটতো।

—তা ফৌজেরা কি রোজ দু-বেলা কেল্লার দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেই মির বক্‌শীর কাজ উদ্ধার হবে ?

—কেন বেগম সাহেবা, আপনারা জানেন না ? ব্যাপার যে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। মির বক্‌শী বাদশার খাসজমিন কইল আর সেকেন্দ্রাবাদ লুঠ করতে এগিয়ে গেছেন। ওদিকে মির বক্‌শীর মৌলানা অকিবত মহম্মদ খাঁ রেওয়ারির কৃষকদের কাছ থেকে খাস রাজস্ব নিজে আদায় করে নিচ্ছে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তাই বুঝি কয়দিন দেখছি বাদশাটা হারেমের মধ্যে এসে বসে আছে ?

—জী, বেগম সাহেবা।

—কি হবে বলে আপনার মনে হয় খাঁ সাহেব ?

আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে রজ আফজুন বললেন : মির বক্‌শীর সঙ্গে নয়া ওয়াজীর ইনতিজাম পারবে না। বাদশা এখন ওয়াজীরের কথাই শুনছেন। মনে হয় ভাল হবে না।

—ভাল হবে না। তার মানে ? গদিটদি যাবে নাকি আহমদের ?

আবার একটু হাসলেন রজ আফজুন। বললেন : দেখুন বেগম সাহেবা—কি হয়।

বললুম : আমাদের কোন ভয় নেই তো ?

—না। তেমন ভয় নেই।

রাজস্ব আদায়ের নামে খাস জমিনের রাজস্ব নিজের পিরানের পকেটে রাখছে মির বক্‌শী। যেখানে সম্ভব সেখানেই ঢু মারছে সে। টাকার জন্য দোজখে ঢুকতে হলেও বোধহয় মির বক্‌শী রাজি। কিন্তু একটু মুশকিলে পড়ে গেছে—কুম্ভের গিয়ে। যুৎ করতে পারছে না। দুর্গের ভিতর বসে আছে লোকেরা। মির বক্‌শীকে টাকা পয়সা দেবে

না তারা কিছুতেই। অথচ টাকা পয়সা মির বক্শীর চাই-ই। দেওয়ানী আমে জরুরী বার্তা এসেছে, শাহেনশা যেন তড়িঘড়ি কেল্লার বড় বড় কামানগুলো মির বক্শীকে পাঠিয়ে দেন। তওফাওয়ালীর বাচ্চাটাকে তো চেনেনা মির বক্শী। কাজ হাসিল। এখন আর মির বক্শীর দরকার কি? কেল্লার কামান দিয়ে সে বাদশার খাস তালুক লুঠ করে চলুক আর কি। এমনিই তো নাস্তাপানির পয়সা জোটে না! শেষে খাবার-দাবারটাও চুলোয় যাক। নয়া ওয়াজীর ইনতিজামের পরামর্শে আহমদ নাকি কোন জবাবই দেয়নি মির বক্শীকে। দেখা যাক এখন কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়।

হজরত বেগমটা বেশ বাড়ন্ত। সালোয়ার কামিজ পরলে এখন দেখি বেশ একটা খবসুরত জেনানা আদমির মত দেখায়। নিজেও সে বেশ সজাগ দেখছি। সারা দিনরাত আর্শীর কাছে ঘুরঘুর করে নিজেকে দেখবে। ভাবসাব দেখলে বেশ হাসি পায়। আবার ভয়ও করে। হারেমের কোথায় শিষমহল, কোথায় রংমহল, কোথায় খোয়াব ঘর, কোথায় হামাম ঘর, সব ঘুরে ঘুরে দেখা চাই। খোসবাই আতর ঢেলে সারা দিনরাত মেয়ে শুধু ঘুরে ঘুরে সব দেখবে। কু-নজর ঐ তওফাওয়ালীটার। দেখে ফেলে কখন কি কেলেঙ্কারী ঘটায় কে জানে। হয়তো বা কোন ফাঁকে খোজা দিয়ে লোপাট করে নিয়ে মীনা বাজারে বিক্রী করে দেবে বেনিয়াদের কাছে। এখন তো শুনি খবসুরত জেনানা আদমির দাম বাজারে লাখ রুপিয়া।

৭ই মহরম। সামলাচ্ছিলাম মেয়েটাকে যমুনার দিকে কেল্লার ধারে গিয়ে। কিন্তু নিচের দিকে তাকিয়ে মুখের কথা হারিয়ে যাবার উপক্রম। দেখি সারি সারি ছাউনি পড়েছে মারাঠাদের। দুষ্ট ইঁদুরগুলোর ছাউনি দেখলে দিল্লীর সব লোকেই বুঝতে পারে ওরা কারা। মেওয়াটী লুঠেরাগুলোর চাইতেও হারামী এই কাফেরেরা। দেখলে পরে ভয় লাগে। দিল্লীতে ছাউনি ফেললেই একটা না একটা ঝামেলা পাকাবেই। আনলো কারা কাফেরগুলোকে? আহমদকে

শায়েস্তা করতে মির বক্‌শী নিয়ে এল নাকি? হজরত বেগম তাকিয়ে দেখছিল মারাঠাগুলোকেই। আমাকে কাছে পেয়ে বলল: আম্মা, ঐ আদমিগুলো দরিয়ার ধারে অমন করে ঘর করে বসেছে কেন?

মুখে হাত চাপা দিয়ে বললুম: চল্‌, চল্‌, আর এক মুহূর্তও নয়। এখনই কোথায় কেল্লার ময়দানে আগুন জ্বলে উঠে কিনা কে বলবে। টানতে টানতেই প্রায় হজরত বেগমকে নিয়ে মমতাজ মহলে এসে ঢুকলাম।

মালেকা-ই-জামানীকে জিজ্ঞেস করতে মারাঠাদের কথা আমাকে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। দেখলুম রহিমা বাঁদীও এ খবরটা পায়নি। অথচ খবরটা না-জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। মারাঠাগুলো এমনি এসে ছাউনি ফেলে না। হয় লুঠতরাজ কিছু চালাবে—নয়তো অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। খবর পেলাম রজ আফজুনের খোজা দবির মহম্মদের কাছে। মির বক্‌শী তার মৌলানা অকিবত মহম্মদকে পাঠিয়েছে বাদশাকে চাপ দিয়ে কামানগুলো আদায় করে নেবার জন্যে। আহমদ নাকি খবর পেয়ে কেল্লার ফৌজদের হুকুম করেছিল অকিবতকে রুখতে। কিন্তু দেওয়ানী আমের বান্দাদের সে তাগদ আর আছে নাকি। গোলাগুলির নাম শুনলে আমীরেরা দেশ ছেড়ে পালায় এখন। রুখবার হিম্মত হয়নি কারো। মারাঠারা এসে যমুনার ধারে ছাউনি ফেলেছে। তবে তওফাওয়ালীর বাচ্চাটার সাহস আছে বলতে হবে। সে নাকি বলেছে, যা হয়, তা হয়, কামান দেবনা মির বক্‌শীকে। কিন্তু মির বক্‌শীর মৌলানা সে-সব শুনবে কেন? সে বলেছে, কামান না দাওতো দিল্লী জাহান্নামে যাবে। সে তার বাদাকশী ফৌজেদের নিয়ে দিল্লীর হিন্দুদের দোকানপাট লুঠ করতে লেগে গেছে। কিন্তু তাতে আহমদ আর তার ওয়াজীর ইনতিজামের কি? কেল্লার দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারা বেশ দিব্যি বসে আছে। তোবা! তোবা! এর নাম বাদশাহী।

কিন্তু ঘরে খিল এঁটে বসে থাকলে কি শয়তানে ছাড়বে? মির বক্‌শীর মৌলানা বদমাসের হদ্দ। দুই বছরের উপর নাকি বাদশার

সিন্দাগ ফৌজেরা একটা কানাকড়িও মাইনে পায় না। তাদের আরও ক্ষেপিয়ে দিয়েছে সে। ১লা শফর, দেখি কেল্লার চারদিকে প্রচণ্ড গোলমাল আর চিৎকার। দেয়ালের ফাঁকে একটুখানি উঁকি দিয়ে দেখলুম, হাজারে হাজারে সিনদাগ আর বাদাকশী ফৌজেরা কেল্লার সব কয়টা দরজা আটকে চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে: মির বক্শীকে কামান দাও, নয়তো ঝরোকা ভেঙে হারেমের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বে-ইজ্জত করব বেগমদের।' বলে কি! শুনে তো আমার বুক ধুক্‌ধুক্ করছে। দৌড়ে মমতাজ মহলে ঢুকে মালেকা-ই-জামানীকে বললাম: বেগম সাহেবা, নাজির সাহেবকে খবর দিন। লুঠেরারা হারেমের ভিতর ঢুকলো বলে।

—'সেকি!' মালেকা-ই-জামানী আসমান থেকে পড়লেন।

আমি বললুম: হ্যাঁ বেগম সাহেবা, আমি নিজের চোখে দেখে এলুম।

—তাহলে?

—নাজির সাহেবকে তলব করুন—একটা কিছু করতে হবে।

জরুরী তলব গেল নাজিরের কাছে।

খবর পেয়েই নাজির সাহেব ছুটে এসে বললেন: কি হয়েছে বেগম সাহেবা?

মালেকা-ই-জামানী বললেন: হবে আবার কি! লুঠেরারা যে হারেমে ঢুকছে!

—কোথায়?

—সাহিবা মহল নিজের চোখে দেখে এসেছে।

নাজির রজ আফজুন আমার দিকে তাকালেন: কি হয়েছে বেগম সাহেবা?

যা দেখেছি সব বললুম। তখনো ভয়ে আমার বুক ঢিপঢিপ করছে।

শুনে হেসে ফেললেন নাজির সাহেব: না বেগম সাহেবা। ওরা ভয় দেখাচ্ছিল। চলে গেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। বললুম: তাহলে আর কিছু হবে না বলুন?

নাজির বললেন: হবে কিনা খুদা মালুম। তবে বাদশা হয়তো বে-ইজ্জত হয়ে যেতে পারেন। কামান না দিলে মৌলানা অকিবতও ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

—আহমদটা এখনও কামান ছাড়ে নি?

—না।

নাজিরের কথা হাতে হাতে ফলল দেখলাম। পরদিন সকালবেলা দেখি ঝরোকাতেই চিৎকার। সিনদাগ আর বাদাকশীরা দরজা ভেঙে হারেমের মধ্যেই ঢুকে আর কি। কেল্লার ফৌজেরা দেখি ছুটাছুটি করছে। মৌলানা অকিবত হারেমের ভিতর হানা দিলে যা-হোক এবার তো রুখতে হবে। খোজারাও দেখি সব ঢাল তরোয়াল নিয়ে তৈরী। মালেকা-ই-জামানী আর আমি গোপন কুঠরিতে ঢুকে আমাদের ধনদৌলত সব দেখে এলাম—লুঠেরারা হারেমে ঢুকে আবার খোঁজটোজ না পায় সব। হজরত বেগমকে মমতাজ মহল ছেড়ে উঠানটাতেও নামতে দিলুম না। লুঠেরাদের চোখ পড়ে প্রথমেই খবসুরত জেনানা আর টাকাকড়ি গয়নাগাটির উপর।

আমাদের নসিব ভাল। সিন্‌দাগ আর বাদাকশীরা হারেমে না ঢুকেই সন্ধ্যাবেলা ঝরোকা ছেড়ে চলে গেল। ভাবলাম অন্তত আজকের দিনের মত বাঁচা গেল। কিন্তু কাপুরুষ মোগল বাদশার কপালে শান্তি আছে নাকি? মতি মসজিদে আজানের শব্দ মিলিয়ে না যেতেই দেখি হৈ হুল্লোড় পড়ে গেছে শহরে। হৈ-চৈ, চিৎকার, আর গোলাগুলির শব্দ। ব্যাপার কি? দেখি হারেমের মধ্যেও ছোটাছুটি পড়ে গেছে। হজরত বেগম ছুটে গিয়ে মালেকা-ই-জামানীকে জড়িয়ে ধরে দেখি কাঁপছে।

নাজির রজ্জ আফজুনের খোঁজ করতে লাগলুম। কিন্তু তার

কোন পাত্তাই নেই। আবার কি কাণ্ড হবে কে জানে। কিছু বুঝতে না পেরে উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে লাগলুম আমরা।

গোলাগুলি বন্ধ হল রাত্রি দুই প্রহরে। অবশেষে খবরটা পেলুম। আহমদ খুব গোপনে কেল্লা থেকে মির অতিসকে পাঠিয়েছিল নয়া ওয়াজীর ইনতিজামের কাছে—কয়েকটা ছোট কামান, রাখালা নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু গোপনে কিছু করবার উপায় আছে নাকি এখন? বাদাকশী আর সিন্‌দাগরা লুঠেরার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা শহরের বুকের উপর দিয়ে। জুমা মসজিদের কাছে মির অতিসের উপর চড়াও হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা। কামানগুলো পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছিল। ভাবসাব দেখে মির অতিস গিয়ে দৌড়ে উঠেছিলেন পাশের এক আমীরের মহলে। কামানগুলো যায় দেখে ওয়াজীর তার নিজের মির অতিস বখুরদারকে পাঠিয়েছিল জুমা মসজিদের কাছে। মোগলাই ফৌজ নিয়ে বখুরদার খাঁ সিন্‌দাগ আর বাদাকশীদের ভেদ করে গিয়ে ওঠে রাস্তার ওপাশে আর এক আমীরের ঘরে। দুইদিক থেকে গোলা-গুলি ছুঁড়ে অবশেষে সিন্‌দাগ আর বাদাকশীদের ভাগিয়ে দিয়েছে মোগলিয়ারা। ওদিকে গোলাগুলিতে খাসবাজারের ঘরের চালা পুড়ে গিয়ে একাকার। জুমা মসজিদেরও নাকি খানিকটা পুড়ে গেছে। মির অতিস কোন রকমে জান্‌প্রাণ নিয়ে কেল্লায় ঢুকে দরজা এঁটে দিয়েছেন। তাতেও কি স্বস্তি! বাদাকশী আর সিন্‌দাগরা হটে গিয়ে, যমুনার ধারে এসে দল পাকিয়ে, আবার এসে হল্লা জুড়েছিল ঝরোকার দরজায়। অবশেষে কেল্লার ভারি কামানের গোলা খেয়ে তারা ভেগেছে দরিয়ার ওপারে। তোবা! তোবা! দিল্লীর বাদশাহীতে আর আছে কি?

ভোরবেলা খবর পেলাম মির বকশীর মৌলানা অকিবত শহর ছেড়ে বাইরে চলে গেছে। মৌলানাটার কথা যা শুনছি—সে বেটা তওফা-ওয়ালীর বাচ্চা বাদশা আহমদের চাইতেও অনেক খারাপ। সে গিয়ে জয়সিংহপুরাতে গিয়ে শিবির ফেলেছে। তবে হ্যাঁ, যাবার আগে বুঝিয়ে

দিয়ে গেছে যে শয়তানের বাচ্চারা কি রকম হতে পারে। বেশ কিছু লোক মারা গেছে বদমাসদের হাতে। মারা গেছে মোগলিয়া, সিনদাগ আর বাদাকশীরাও। খাস বাহার আর খারি-বাউলিতে ঘরবাড়ির আর নাকি কিছু নেই। ঝড়ো হাওয়ায় তচ্‌নচ্‌ করে দিলে যেমন হয় তেমনি নাকি দেখা যাচ্ছে সকালবেলা দিল্লী শহরকে। খুদাতালা জানেন মানুষের নসিবে এখন কি আছে। মির বকশী সহজে ছাড়বেনা। সেইতো লেলিয়ে দিয়েছে এইসব লোকেদের লালকেল্লার বিরুদ্ধে। একটা মুসায়েরের মেয়ের জন্য সর্বস্ব খোয়ালো সে ওয়াজীর সফদর জঙ্গের সঙ্গে লড়ে। অথচ ইনতিজাম আর আহমদের জন্য সেই মুসায়েরের মেয়েটাকে নিয়েই ওয়াজীর চলে গেলেন লক্ষ্ণৌতে। এ দুঃখ মির বকশী শিহাব কখনো ভুলতে পারবে? তার উপর বয়স তার এত কম! ছাড়বেনা সে নিশ্চয়ই। মাঝখান থেকে সাধারণ লোকের মরণ দিল্লীতে।

আহমদের নয়া ওয়াজীর ইনতিজামের সাহস না থাকলে কি হবে, মাথায় বুদ্ধি আছে। নাজির রজ আফজুনের কাছ থেকে শুনে সব বুঝতে পারলাম। বয়স অল্প হলে কি হবে, মির বকশী শিহাব চড়চড় করে উঠে যাচ্ছে। তার ডান হাত হারামীর বাচ্চা দক্ষিণ মুলুকের মারাঠারা। সফদর জঙ্গকে হটিয়ে দিয়ে সে এখন চাইছে জাঠদের কব্জা করে তাদের ধনদৌলত সব লুটে নিতে। একবার সেটা পারলেই মির বকশীকে আর পায় কে। তখন কেল্লা থেকে তওফাওয়ালীর বাচ্চা আহমদকে হটিয়ে দিয়ে সে-ই যদি দেওয়ানী আমে দরবার জাঁকিয়ে বসে তবে বলে কে। ওয়াজীর ইনতিজাম সেটা বুঝতে পেরেই সফদর জঙ্গকে খতম হতে দেয়নি। জাঠদের দমন করবার জন্য মির বকশীর দাবী মত কেল্লার বড় বড় কামানগুলোও এই জন্যে সে পাঠাতে দেয় নি। এখন নাকি সে মতলব ভাঁজছে—সফদর জঙ্গ, জাঠ আর রাজপুত রাজাদের নিয়ে একটা দোস্তী তৈরী করবে। সেইজন্যে গোপনে সিকান্দ্রাবাদে বাদশার সঙ্গে জাঠ রাজপুত আর সফদর জঙ্গের একটা মোলাকাত করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে সে। শিকারের নাম করে আহমদ নাকি যাবে সিকান্দ্রা-

বাদের দিকে। জাঠ রাজা সুরজমল আর সফদর জঙ্গের কাছে দাওয়াত চলে গেছে। এরা একবার মিলতে পারলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে মির বকশীর উপর। বাদশার সঙ্গে কেল্লা থেকে তাই বড় বড় কামানগুলোও যাচ্ছে। উঃ! হতচ্ছাড়া মির বকশীটা এখন কোথায় আছে কে জানে। খবরটা একবার তাকে পাঠাতে পারলে হোত। আর যাই হোক শেষে তওফা-ওয়ালীর বাচ্চাটা জিতুক এটাতো আর আমরা চাইনে।

হজরত বেগমটার মনে মনে বোধহয় শয়তানী বুদ্ধি চাপছে। আর্শীতে ঘন ঘন মুখ দেখার যা নমুনা দেখছি, সেটা ভাল নয়! কিন্তু করবই বা কি? অল্প বয়সেই যে হিন্দুস্থানের জেনানাদের যৌবন আসে। ঠোঁটে মেহেদী পাতার রং লাগিয়ে, গায় আতর মেখে, মেয়ে দেখি কি যেন ভাবছে। এমন করে তাকে আগে কখনো ভাবতে দেখিনি। সারাটা হারেমে ছুটোছুটি করেই ঘুরে বেড়ায় সে। বললুম: কি হয়েছে আম্মা? ভাবছ কি?

হজরত বলল: আচ্ছা আম্মা, গন্না-বেগমটা কে গো?

বললুম: কেন? কি হল? সে এক মুসায়েরের কন্যা।

—খুব নাকি খবসুরত দেখতে?

—কে বললে?

—রহিমা বাঁদী।

বললুম: তোমার চেয়ে খবসুরত নয় আম্মা।

—তার জন্যেই মির বকশীটা নাকি পাগল হয়েছে?

—শুনি তো তাই।

—মির বকশীটার আক্কেল কি—একটা মুসায়েরের মেয়ের জন্য পাগল হল?

—কি করবে আম্মা। সেতো আর তোমাকে দেখেনি।

হজরত মুখ বাঁকিয়ে বলল: ধ্যাত্।

—ধ্যাত্ কেন আম্মা। মির বকশীর বয়স অল্প। দেখতে সুন্দর। পছন্দ হয়না তাকে?

—তোবা। সেতো বাদশার বান্দা। শাজাদী তাকে পছন্দ করবে কি।

বললুম : তবু সে দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল্-মুল্ক। বাদশার মির বকশী।

হুজরত বলল : তবু তো সে বান্দা। তার আছে কি?

—তোমার তবে কাকে পছন্দ আম্মা? ওয়াজীর ইনতিজামের মত লোককে।

হুজরত বলল : ওয়াক! থুঃ! সে আবার একটা মানুষ নাকি?

—তবে কাকে পছন্দ তোমার।

—শাহেন শা না হলে আমিই সাদীই করব না।

—বুড়ো শাহেন শা?

—তোবা! তোবা! হুজরত মুখ ফিরিয়ে নিল।

মনে মনে হাসলুম। বুঝলুম, মেয়ের দেহে যৌবন আসছে। কিন্তু সেতো জানেনা যে, মোগল শাজাদীদের কপালে দুর্দশা! অমন যে খব-সুরত শাজাদী জাহান আরা বেগম আর জেব-উন্নেসা, তাদেরও সাদী হয়নি। মোগল শাজাদীদের স্বপ্ন আর সফল হল কবে? বাদশার ঘরে শাজাদী হয়ে জন্মে কোন ফয়দা নেই। কিন্তু হুজরতকে সে কথা আর বললুম না। স্বপ্ন দেখে যে সুখ পাচ্ছে মেয়ে—পাক না। আগেই তাকে ব্যথা দিয়ে আর হবে কি।

কিন্তু?…সত্যি সে-কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে হুজরত খুব সচেতন বুঝতে পারি। অথচ……। মেয়ে হয়ে সাধারণ ঘরে জন্মালেই বুঝি হুজরত ভাল করত।

হুজরত বলল : সে মুসায়েরের মেয়ে নাকি লক্ষ্ণৌতে এখন?

বললুম : হ্যাঁ, আম্মা।

—ওয়াজীর সফদর জঙ্গের বেটা নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলা নাকি সাদী করবে তাঁকে।

অবাক হয়ে হুজরতের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। এ সব কথা সে জানে কি করে! তাকে কি একটা বলব বলে যেন ভাবলুম

আমি। এমন সময় দেখলুম ব্যস্তসমস্ত হয়ে মহলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন মালেকা-ই-জামানী। তাকে এমন ব্যস্ত হতে বহুদিন দেখিনি। বললুম: কি হয়েছে বেগম সাহেবা? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

মালেকা-ই-জামানী বললেন: খবর শুনেছ?

তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম: কি?

—৯ই শফর আমাদের বাদশা নাকি বেরুচ্ছে শিকারে।

বিদ্রূপ করে বললুম: তাই নাকি? তওফাওয়ালীর বাচ্চা আবার শিকার করতে জানে নাকি? তা শিকারে কি বাঈজী আর তওফাওয়ালী নিয়ে যাবে নাকি?

—খুদাতালা জানেন।

—আশেপাশেই মারাঠা, বাদাকশী আর সিনদাগরা ঘুরে বেড়াচ্চে। আহমদ সেটা জানে তো?

—জানে নিশ্চয়ই। ওয়াজীর ইনতিজাম নাকি সাহস দিয়ে বলেছে কুচ পরোয়া নেই। সঙ্গে সে আছে কামান আর মোগলাই ফৌজ নিয়ে।

বললুম: তবেই হয়েছে। কামরুদ্দিন জিন্দাগী-ভর গাঁজা-ভাঙ-চরস খেয়ে কাটিয়েছে। তার ছেলে হয়ে ইনতিজাম যাবে যুদ্ধ করতে? সিরাজীর পেয়ালা ওয়াজীরের মহলে বসে কাঁদবে না? তবে যা করেন খুদাতালা ভালর জন্যেই করেন। বে-ইজ্জত হয়ে গদি যাবে-নিশ্চয় বলে রাখলুম। শিহাব তকে তকে আছে, পেলে ঘাড় মটকাবেনা তওফা-ওয়ালীর বাচ্চাটার!

মালেকা-ই-জামানী বললেন: কিন্তু আহমদ যে আমাদেরও টানছে?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আগেকার বাদশাদের মত সে নাকি হারেম নিয়ে বেরুবে।

বললুম: বিষ নেই সাপের কুলোপ না চক্কর। তাগদ নেই তার আবার হারেম নিয়ে বেরুবেন শিকারে! তা কে কে যাবেন?

—শুনছি কিব্‌লা-ই-আলম যাবে, আর যাবে আহমদের বেগম ইনায়েতপুরী-বাঈ। শাজাদা বাঁকা আর সাহিবা বেগমও যাবে বাদশার সঙ্গে। ওরা বেরুবে লাহোর দরজা দিয়ে। আমাদের ভাগ্যে সাধারণ দরজা। সঙ্গে যাবে সরফরাজ মহল আর উত্তমকুমারী নিয়ে যাবেন নাজির রজ আফজুন খাঁ। পথে নাকি বাদশার সঙ্গে মোলাকাত করে সঙ্গ নেবে তার শ্যালিকা, আহমদের মেয়ে দিলাফ্রজ বানুকে নিয়ে।

বললুম ঃ ভাল কথা। তওফাওয়ালীর বাচ্চাটার জন্যে যদি লাল-কেল্লা ছেড়ে তবু একটু বেরুতে পারি! সেই নাদিরের হিন্দুস্থান আক্রমণের সময় কারনাল যাওয়া ছাড়া বাইরে তো যাই নি এ কয়বছর। যা করেন খুদা ভালর জন্যেই।

মালেকা-ই-জামানী বললেন ঃ ভাবছি টাকাকড়ি গয়নাগাটির করব কি। সঙ্গে নেব নাকি ?

আমি রে রে করে উঠলাম ঃ মাথা খারাপ! মারাঠা ইঁদুরগুলো পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখন লুঠ করে ঠিক আছে ? মাটির নিচে পুঁতে রেখে যাব সব।

আমার প্রস্তাবটা মনোমত হল বুঝি মালেকা-ই-জামানীর। ঘাড় নেড়ে বললেন ঃ ঠিক বলেছ।

অবশেষে সত্যই বেরুলাম। কিন্তু বেরুনো কি আর যায়! নামে বাদশা। কাজে তো তওফাওয়ালীর বাচ্চাটা বাজারের মিস্কিন। গোলন্দাজ ফৌজেরা বেঁকে বসলো, মাইনে না মিটিয়ে দিলে তারা এক-পাও বেরুবে না। দরবারের হাতীর চারদিন ধরে দানা নেই। পিঠে করে হারেম বইবে কি, তারা নিজেরাই ধুঁকছে। কামান টানবার জন্য একটা বলদও নেই। টাকা নগদা না দিলেও কুলিরাও বলছে যাবে না। ভাবলুম যাওয়াই হবেনা। কিন্তু কি করে কি হয়ে গেল। বোধহয় গয়নাগাটি বিক্রী করে তওফাওয়ালীটা আর ইনতিজামের আম্মা কিছু টাকা দিয়েছিল, তাই নিয়ে অবশেষে বেরুনো গেল কেল্লা থেকে।

লুনি এসে প্রথম তাঁবু পড়ল বাদশার। দেখে হাসি চাপতে পারিনে।

যে মোগল বাদশাদের তাঁবু ছিল কেল্লার এক একটা হারেমের মহলের চাইতেও সুন্দর, তার দশা কি? ছিঁড়ে ছিঁড়ে শত ছিন্ন। তাঁবুর ফুটো দিয়ে মাথার উপরের আসমানটা পর্যন্ত দেখা যায়। নিচের কথা আর বলে কি হবে, পায়ের নিচের গালিচা বোধহয় উটগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। লোকগুলো কি বুর্বক! তবু এ বাদশাকে শাহেন শা বলে সেলাম ঠুকে?

তাঁবুতে বসে শুনলাম রাস্তার অবস্থা ভাল নয়। মির বক্‌শীর মৌলানা অকিবত দু-দিন আগেও এ তল্লাটে লুটতরাজ চালিয়ে গেছে। সে ছিল গাজিবাদে। আমাদের আসবার কথা শুনে সিকান্দ্রাবাদে গিয়ে ছাউনি ফেলেছে। আহমদ ভেবেছিল লুনির বাগিচায় বসে তওফা-ওয়ালীদের নিয়ে সে-একটু মজা লুটবে। কিন্তু ওয়াজীর ইনতিজামের তর্ সয়না। সে চায় তাড়াতাড়ি সিকান্দ্রাবাদে পৌঁছুতে। অবশেষে ২০শে শফর লুনির উদ্যান ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হল। যেমন বাদশা তেমন তার গতি। দশ মাইল পথ পার হতে গেল এক হপ্তা। সিকান্দ্রা-বাদের কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম ২৯শে শফর।

সিকান্দ্রাবাদে গিয়ে শুনলাম মির বক্‌শীর মৌলানা অকিবত হাজার পঞ্চাশেক টাকা লুট করে আমাদের কেটে পড়েছে খুরজার দিকে। আহমদ খুশী। খুদাতালা মেহেরবান, সত্যিই অকিবতের মুখোমুখি হতে হয় নি তাকে।

মৌজ করে তওফাওয়ালীদের মহড়া চালাতে হুকুম করল আহমদ। কিন্তু, ভাবলে হাসি পায়। নাচ দেখা তো দূরস্থান—সে নিজেই ভোঁ দৌড় লাগালো সিকান্দ্রাবাদ ছেড়ে। আমাদের যেমন নসিব! একটু বসা হলনা। আবার তক্ষুনি সালোয়ার কামিজ এঁটে বেরিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবার হুকুম এল।

সিকান্দ্রাবাদে খবর এল—মির বক্‌শী তার মারাঠা দোস্তদের নিয়ে জাঠদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে সিকান্দ্রাবাদের দিকে এগিয়ে আসছে বাদশাকে গ্রেপ্তার করবে বলে। শুনে তো আহমদের চোখের পানিও

থাকলো না আর। জুমাবারে দিনভর নামাজ পড়ে আর কিছু বাকি রাখলো না সে। সরাব সিরাজী মাথায় উঠলো। মুখে শুধু এক কথা : আল্লা রসুল, মেহেরবান খুদা, দুয়া কর।

ওয়াজীরের অবস্থাও তেমনি। আমরা যে আমরা, আমাদেরও যেন ভয় ঢুকে গেল।

অবশেষে কিছুটা স্বস্তির সংবাদ পেলাম সন্ধ্যাবেলা। মৌলানা অকিবতের নাকি মন ঘুরেছে। আল্লার নামে কসম খেয়ে সে বলেছে, লুঠতরাজ আর করবে না। মির বক্শীকে সে ছেড়ে দিয়েছে। ওয়াজীর ইনতিজামের সঙ্গে গুলারমানি পরে সে এসে ভেট করে গেছে বাদশার সঙ্গে। সে এবার বাদশার পক্ষে। 'বাদশা সালামত্' জানিয়ে সে আবার খুরজা চলে গেছে সেখানে বাদশার হুকুম তামিল করবার জন্যে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবাই বাঁচলুম। কিব্লা-ই-আলম হুকুম করল সন্ধ্যাবেলা ফুর্তি করবার জন্য।

কিন্তু খুদাতালা নিমকহারাম, বে-ইজ্জত, আর কাপুরুষকে ফুর্তি করবার অবসর তো বেশীদিন দেন না। পরদিন ফৈজিরের আজান শেষ না হতেই খুরজা থেকে মৌলানা অকিবত খবর দিয়ে পাঠালো যে সর্বনাশ হবার জোগাড়। মারাঠা দুষ্মন মলহর রাও হোলকার নাকি পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে দিল্লী যাচ্ছে কেল্লা দখল করতে। কোন এক বন্দী শাজাদাকে খালাস দিয়ে দেওয়ানী আমের নসমন-জিলা ইলাহীতে বসিয়ে 'বাদশা-সালামত্' জানাবার ইচ্ছা তার। সংবাদ শুনে আহমদের তো হাত পা সেঁধিয়ে যাবার উপক্রম। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বান্দা বাঁদী দিয়ে ঝান্সির দিকে তাঁবু পাঠিয়ে দিল সে। হুকুম হোল—পরদিনই দিল্লী ফিরে রওনা হতে হবে। খবর শুনে মালেকা-ই-জামানী মুখ টিপে হেসে আমায় বললেন : কেমন বেড়ানো হোল সাহিবা মহল ?

তওফাওয়ালীর বাচ্চাটার ভাবসাব দেখে আমি মনে মনে খুশী। তবু বাইরে বে-খুশ ভাব দেখিয়ে বললুম : নসিবে সুখ নাইতো কি হবে। লালকেল্লার পাথর কামড়েই পড়ে থাকতে হবে আমাদের।

মালেকা-ই-জামানী বললেন : লালকেল্লায় আর পৌঁছুতে পারে কিনা আহমদ, তাই দেখ।

সত্যি, অবস্থা প্রায় সে-রকম হয়েই দাঁড়াল। মির বক্‌শীর মৌলানাটা বদমাইসের একশেষ। শয়তানী বুদ্ধি নিয়েই আহমদের শিবিরে এসেছিল সে। আসলে দিল্লীর দিকে যায়নি কোন ফৌজ। কুড়ি হাজার মারাঠা বর্গী নিয়ে মলহর হোলকার আসছে সিকান্দ্রাবাদের দিকেই। রাত্রিবেলায় খবর পেলাম, সে আছে বার ক্রোশের মধ্যেই। খবর পেয়ে কিব্‌লা-ই-আলম মাথার চুল ছিঁড়ে বলল : অকিবতের মুখে কুষ্ঠ হবে।' কিন্তু তওফাওয়ালীর অভিশাপ কবে কার লাগে ? আমরা বুঝলুম একটা কিছু গোলমাল হবেই।

ওদিকে খবর পেয়েই ওয়াজীর ইনতিজামকে তলব করে পাঠাল আহমদ। ইনতিজামের তখন মেজাজ গরম। সে বুঝতে পেরেছে যে, তওফাওয়ালীর বাচ্চা এই ভীরুটাকে দিয়ে কোন কাজ হবেনা। রেগে-মেগে সে বলেছে—সে নাকি কোন বুদ্ধি দিতে পারবে না। তা শুনে তো আহমদের হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নাকাড়া পিটিয়ে, ফিরে যাবার হুকুম দিয়ে, নিজের জন্য তক্‌ত-ই-রওয়ান তলব করে পাঠিয়েছে সে। রাতেই নাকি সোরাজপুরের দিকে যেতে হবে। আমাদের হজরত বেগমের বোধহয় একটুখানি ঘুম ঘুম পেয়েছিল। নাকাড়ার শব্দে জেগে উঠে চারদিকে হৈ হৈ শুনে বলল : কি হয়েছে আম্মাজান ? হল্লা কিসের ?

বললুম : হল্লা কিসের খুদাতালা জানেন। এখনি বাক্স-পেটারা গুছিয়ে রওনা দিতে হবে।

—কোথায় ?

—লালকেল্লা।

—কেন, বেড়ানো হবে না ?

বললুম : আর বেড়ানো ! এখন জান্‌-মান নিয়ে ফিরি তো আগে।

মালেকা-ই-জামানী আর আমি খোঁজ করতে লাগলুম নাজির রজ আফজুনের। আমাদের নিয়ে তাঁরই বেরুবার কথা।

ইতিমধ্যেই শিবিরের চারপাশে বেশ হট্টগোল পড়ে গেছে। মারাঠাদের নাম শুনে সবার মনেই ভয় ঢুকে গেছে। আহমদ আর তওফাওয়ালীটার শিবির বোধহয় ভাঙা হয়ে গেছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই বেশী উদ্বেগ ভোগ করছি। নাজির কোথায়? যাই হোক না কেন, মারাঠারা যে ভাল লোক নয় একথা তো ঠিক! ওদের হাতে পড়লে বে-ইজ্জতের আর বাকি থাকবে না কিছু। শিবিরে মালেকা-ই-জামানীও পায়চারী করছিলেন। আমায় বললেন: কি হবে সাহিবা মহল? নাজির রজ আফজুন যে এখনো এলো না?

আমি বললুম: ভয় খাবেন না বেগম সাহেবা। আহমদ আর তওফাওয়ালীটা আমাদের ফেলে পালিয়ে গেলেও রজ আফজুন যাবেন না। তিনি জানেন মোগল হারেমের ইজ্জত রাখতে গেলে আমাদের দিকেই তাকে প্রথম তাকাতে হবে। তওফাওয়ালীটা মারাঠাদের হাতে বে-ইজ্জত হলে দিল্লীর লোকে কিছু বলবে না। কিন্তু আমরা ধরা পড়লে মোগল আমীরদের লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: খুদা জানেন। এখন মান ইজ্জত নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি।

আমরা কথা বলতে বলতেই নাজির সাহেবকে আমাদের শিবিরে দেখা গেল। বয়সেয় ভারে নুইয়ে গেলেও একটা আভিজাত্যের ছাপ এখনো তাঁর চোখে মুখে লেগে আছে। হবেই তো। আলমগীর বাদশার আমলের লোক যে রজ আফজুন।

আমাদের কাছে এসে প্রায় মাটিতে শুইয়ে পড়ে 'সালামত্' জানালেন নাজির সাহেব।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: খবর কি খাঁ সাহেব। শুনছি মারাঠারা এসে পড়েছে কাছেবিছেই?

—জী বেগম সাহেবা।

—তাহলে ?

—এখুনি আমাদের শিবির উঠিয়ে রওনা দিতে হবে।

—আহমদ কোথায় ?

—শাহেনশা আগেই রওনা হয়ে চলে গেছেন।

—হ্যাঁ! এমন বে-আক্কেল বে-সরমও বাদশা হয় নাকি! হারেমের ইজ্জতটার কথাও ভাবলে না ?

আমি বললুম: সঙ্গে আর কে কে গেছে ?

রজ আফজুন বললেন: কিব্‌লা-ই-আলম, বেগম ইনায়েত পুরিবাঈ, শাজাদা মামুদ, আর হজরত সাহিবা বেগম।

আমি বললুম: বাদশার সঙ্গে যাবার এলেম নাই বলেই বোধহয় আহমদ আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেল না ?

জিব কেটে রজ আফজুন বললেন: শোভানাল্লা! বেগম সাহেবা কি যে বলেন। আপনারা সঙ্গে থাকলে শাহেনশার আরও ইজ্জত বাড়বে।

মালেকা-ই-জামানীর ধৈর্য ছিলনা। না থাকবারই কথা। হজরত বেগম রয়েছে আমাদের সঙ্গে। তওফাওয়ালীটার মুখে ছাই দিয়ে রূপ তো তার কম হয়নি। লুঠেরাদের হাতে পড়লে কি হয় কে জানে। তিনি তাই বললেন: শিবির উঠাবেন কখন, তাই বলুন ? ব্যাপার খুব ভাল মনে হচ্ছে না।

—এখনি শিবির উঠবে বেগম সাহেবা।

—আমাদের সঙ্গে আর কে কে যাবেন ?

—শাহেনশার দুই মেয়ে, হজরত সরফরাজ মহল, আর রাণী উত্তম-কুমারী।

গোলমালটা ক্রমশ বাড়ছিল। স্বয়ং বাদশা পালিয়েছে শুনে শিবিরের কারো আর ভরসা নেই। যে যে-ভাবে পারছে গুছিয়ে-গাছিয়ে কেটে পড়ছে। হৈ হুল্লোড় হট্টগোলে একটা বাজারের চাইতেও গোলমাল বেশী শোনা যাচ্ছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ, বয়েল গাড়ির

চাকার শব্দ, বান্দা বাঁদীদের কণ্ঠস্বর, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দোজখে আছি না দুনিয়ায়, বোঝা ভার। অবস্থা দেখে সাহসী মানুষেরও সাহস উবে যাচ্ছে। আরও ভয়ংকর ব্যাপার হয়েছে রাত্তির বলে। খুদাতালা বিরূপ, আসমানে চাঁদও নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোনদিকে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। মালেকা-ই-জামানী হজরত বেগমকে বুকে জড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করছেন কখন শিবির ভাঙবে সেই প্রত্যাশায়।

রাত প্রায় দুপুর। রজ আফজুন দুটো বয়েল গাড়ি ঠিক করে এনে, একটাতে আমাকে, আর একটাতে হজরত বেগম আর মালেকা-ই-জামানীকে উঠতে বললেন। হজরত আমাকে বলল ঃ আম্মাজান, তুমি ও গাড়িতে কেন? এখানে এস।

রজ আফজুন বললেন ঃ শাজাদী, আপনাদের আলাগ আলাগ গাড়িতেই যেতে হবে। কেল্লায় গিয়ে আবার আম্মাজানের কোলে যাবেন। নিন এখন গাড়িতে চাপুন, আর দেরী নয়।

মালেকা-ই- জামানী হজরত বেগমকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আমিও উঠলুম। অন্যান্য বেগম আর শাজাদীরা কোন গাড়িতে উঠলেন কিছুই ঠাহর করা গেল না। গাড়ি ছেড়ে দিল। অন্ধকারের মধ্যেও এইটুকু বঝলুম যে সার বেঁধে গাড়ি চলেছে। আগে পিছে বান্দা বাঁদী আর কুলিকামিনের ভিড়। মেহেরবান খুদাতালা জানেন, নসিবে কি আছে। এখন ভালয় ভালয় কেল্লায় গিয়ে উঠতে পারলে হয়।

চলা দরকার তাড়াতাড়ি। কিন্তু ভিড় জমে গেছে এমন যে গাড়ি প্রায় চলছেই না। অথচ অনবরত খবর পাচ্ছি মারাঠারা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। তওফাওয়ালীর বাচ্চাটা জাহান্নামে যাক। তাগদ যদি নেই, তবে কেল্লা ছেড়ে বেরুলো কেন? এখন কি হয় কে জানে।

বিপদ যেখানে, সেখানেই যত দেরী। অবশেষে সেই বিপদই ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকার কেটে চিড়িক দিয়ে মাঝে মাঝে আলো ফুটতে লাগলো। সেই সঙ্গে শব্দ—গুড়ুম, গুড়ুম! হৈ হুল্লোড় আর

চিৎকার উঠলো আমাদের সারিতে। নিয়ম শৃঙ্খলা সব ভেঙে পড়লো দেখতে দেখতে। যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো। কি হয়েছে কে জানে। অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে নাজির রজ আফজুনকে খোঁজ করতে লাগলুম। কিন্তু তার খোঁজ কোথায়? চতুর্দিকে তখন অন্ধকারের মধ্যে তুমুল কাণ্ড। কে এক বান্দা ছিল আমার পাশে। বলল: ভয় করবেন না বেগম সাহেবা। নাজির সাহেব মারাঠা ডাকুদের সঙ্গে লড়ছেন।

এই বিপদের মধ্যেও যেন হাসি পেল। যেখানে জোয়ানরা সব ভয়ে পালাচ্ছে সেখানে কিনা আশী বছরের এক বুড়ো রুখবে দুষ্‌মনকে? কিন্তু হচ্ছে কি এখন সেটাই জানা দরকার। চতুর্দিকের গোলমালে আসল ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

অবশেষে রজ আফজুনকে দেখলাম আমার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললুম: নাজির সাহেব, খবর কি? এত হল্লা কেন?

মাথা নিচু করে রজ আফজুন বললেন: মারাঠা দুষ্‌মনেরা আমাদের উপর চড়াও হয়েছিল বেগম সাহেবা।

—ওরা কি হটে গেছে?

—না হজরত সাহেবা।

—সেকি! তাহলে?

—আমরা ওদের হাতে আটকে গেছি।

—এ্যাঁ! আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

উজির সাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: তবে, তত ভয় নেই বেগম সাহেবা। আমাদের ধরেছে অকিবতের লোকেরা। হাজার হোক মুসলমানতো! হারেমের বেগমদের বে-ইজ্জত করবেনা!

চোখে পানি এসে গেছে আমার। তবু মনে হয় একটুখানি হাসি। কি সান্ত্বনা নাজির সাহেবের! বললুম: মালেকা-ই-জামানী কোথায়?

মাথা নিচু করে রইলেন রজ আফজুন। কোন কথা বললেন না। আমার বুকটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে দুরুদুরু করে কেঁপে

উঠলো। বললুম : কথা বলছেন না—কেন ? বেগম সাহেবা কোথায় ?

রজ আফজুন বললেন : তিনি মারাঠা ডাকুদের হাতে ধরা পড়েছেন বেগম সাহেবা।

প্রায় যেন হাহাকার করে উঠলুম আমি। বললুম : সে কি! তাঁর সঙ্গে যে হজরত বেগম রয়েছে! হায় আল্লা! তাকে আবার বে-ইজ্জত না করে মারাঠারা ?

নাজির সাহেব বললেন : না বেগম সাহেবা, তেমন চিন্তা করবেন না। মোগল হারেমের জেনানাদের বে-ইজ্জত করবার ক্ষমতা এখনো হবেনা তুষ্‌মনদের।

রাগ হল। বললুম : করলেই আটকায় কে ? নিজের হারেমের জেনানাদের রাখতে পারেনা—মোগল বাদশাদের আছে কি ?

রজ আফজুন সে-কথার কোন উত্তর দিলেন না।

আমি বললুম : এখন আমরা চলছি কোথায় ?

—লুনির কাজি-সাহেবের মোকামায়।

—কেন ?

—আল্লা জানেন অকিবতের মনে কি আছে।

—মালেকা-ই-জামানীকে মারাঠারা নিল কোথায় ?

—সে খবর পাইনি হজরত সাহেবা।

নাজিরকে আর কোন কথা না বলে আমি চুপ করে গেলাম।

সত্যি, নসিবে আল্লা এত দুঃখও দিয়েছিলেন! হিন্দুস্থানের পাদিশার বেগমদের কিনা সামান্য একটা মৌলানা আটক করে, আর কাফের মারাঠাগুলো হারেমের উপর হাত দেয় ? তোবা! তোবা!

রাত্রিবেলা আর কিছু জানা গেল না। কাজি সাহেবের ঘরে আটক পড়ে থাকলুম। একটুখানি দানাপানিও বরাতে জুটলো না। মনে মনে সবাই আল্লাতালাকে ডাকতে লাগলুম : আর যা-ই হোক, বে-ইজ্জত যেন না হই।

...নমালে রাত প্রায় কেটে গিয়েছিল রাস্তাতেই। কাজি ... গিয়ে দু-এক প্রহর কাটাবার পরেই মুরগীর ডাক শোনা ... হট্টগোলের মধ্যেও শহরের মসজিদ থেকে ভেসে এল ...। আল্লাতালা এখন নেক্ নজরে তাকালে হয় তাঁর ... দিকে।

...লা ফুটে উঠতে না উঠতেই খবর পেলাম। সোরাজ-পুর ... াদের খবর পেয়ে পেয়ারের লোকজন নিয়ে আহমদটা ... ী হাতীর পিঠে চেপে দিল্লী পালিয়েছে। এতক্ষণ প্রায় দিল্লী ... াকাছি চলে গেছে তারা। উজির ইনতিজাম পালিয়েছে আ... ...গে। আশ্চর্য উজির। তুরাণীদের একটা কলঙ্ক ই... ...যাক, মরুকগে ওরা, সে চিন্তা আমাদের নেই। মা... ...। খবর পেলে স্বস্তি পাই। আমি ভাবছিলুম মালেকা-ই-জ... ...রতের কথা।

সে চিন্তা ছিল নাজির রজ আফজুনেরও। সকালে উঠেই বেগম সাহেবাদের খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলেন তিনি। বেলা এক প্রহরে খবর পেলাম। মালেকা-ই-জামানী আর হজরত বহাল তবিয়তে আছে। আমাদের রহিমাও আছে সেখানে। মারাঠা দুষ্‌মনেরা কাফের হলেও বেশী সম্মান দেখিয়েছে মালেকা-ই-জামানীকে। বেগম সাহেবার পরিচয় পেয়ে মলহর রাও হোলকার আর এক মুহূর্তও দেরী করেন নি। সিকান্দ্রাবাদের ফৌজদারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁকে। তবে অন্যান্য বান্দা-বাঁদীদের বে-ইজ্জতের একশেষ করে ছেড়েছেন। লুঠতরাজ করে আর কিছু রাখেন নি। শিবির তচ্‌নচ্‌।

মির বক্‌শী শিহাব নাকি সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিল মালেকা-ই-জামানীকে সালামত্‌ জানাতে। এসব তো তারই কাজ, আহমদ আর ইনতিজামকে চাপ দেবে বলে। তাই বলে হারেমের জেনানারা বে-ইজ্জত হোক এটা সে চায় নি। তাই আস্ত একটা মোহর নজরানা দিয়ে মালেকা-ই-জামানীকে সালামত্‌ জানিয়ে সে বলেছে, বান্দার গোস্তাকী

মাফ হয় বেগম সাহেবা। দুষ্‌মন মারাঠারা এসব করে বেড়াচ্ছে। আমাকে তারা আমলই দিচ্ছে না। সরমে মরে যাচ্ছি আমি।

মালেকা ই-জামানী নাকি কপাল চাপড়ে নিজের নসিবকে দুষছেন। মির বক্‌শীকে কিছু বলেন নি।

আল্লা মেহেরবান, খুব বাঁচিয়েছেন। দুষ্‌মনেরা যে বেগম সাহেবার উপর হাত দেয় নি এই যথেষ্ট। এখন ভালয় ভালয় ফিরে যেতে পেলে হয়।

দুপুরবেলা রজ আফজুন কাজি সাহেবের বৈঠকখানায় আমাকে সালাম জানিয়ে বলল: হজ্‌রত সাহেবা, কোন ভাবনা করবেন না। মলহর রাওয়ের চিঠি নিয়ে এখনই আমি দিল্লী যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি যাতে কেল্লায় ফিরে যেতে পারেন, সে ব্যবস্থা করছি।

আমি বললুম: আমাকে একা আর কাজি সাহেবের বৈঠকখানায় কেন, মালেকা-ই-জামানীর কাছে পাঠিয়ে দিন।

রজ আফজুন বললেন: চিন্তা করবেন না, দু-একদিনের মধ্যে সবাই দিল্লীর দিকে রওনা হবেন। সবাই একবারে গিয়ে কেল্লায় উঠবেন। আমি আসি।

আমাকে সালাম জানিয়ে রজ আফজুন চলে গেলেন। আমি একেবারে বোকা তো নই। আমি বুঝতে পারলুম যে, মারাঠাদের শর্ত নিয়ে নাজির সাহেব গেলেন কেল্লাতে। আমরা রইলুম জামিন। আহমদ শর্ত মেনে নিলে কেল্লায় যাবার হুকুম মিলবে, নইলে নয়। কিন্তু তওফাওয়ালীর বাচ্চার কি ইজ্জত জ্ঞান আছে যে, হারেমের জেনানাদের কথা সে ভাববে? খুদাতালা জানেন—আমাদের নসিবে কি আছে না আছে।

রজ আফজুন দিল্লীতে গেলেন ১৩ই রবিয়ল-আউয়ল। ভাবলুম দিল্লীর খবর এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের সেকেন্দ্রাবাদে। কিন্তু মির বক্‌শী শিহাব তার মারাঠা দোস্তদের নিয়ে পরদিনই রওনা হল দিল্লীর দিকে সঙ্গে চললুম আমরাও।

গাম নাজিরের মুখে মলহর রাওয়ের শর্ত পেয়ে ইনতিজাম
পেছিল—সে লড়বে মারাঠাদের সঙ্গে। যে ব্যাটা মারাঠা-
লে দৌড়ে পালায়—সে নাকি লড়বে! তওফাওয়ালীর
আহমদের বুদ্ধি আছে। সে নাকি ইনতিজামের তড়-
বিশ্বাস করেনি। তবে কোন জবাবও দেয়নি নাজিরকে।
পেয়ে মির বক্‌শী ক্ষেপে লাল। ইনতিজাম আর
া সে দেবেই। একটা ডবগা ছুঁড়ি হাতছাড়া হয়ে গেছে
না! এ-কথা সে ভুলবে না কোনদিন। কেল্লার জবাব না
শী তার মারাঠা দোস্তদের লেলিয়ে দিলে। যমুনা পার
লা গিয়ে জয়সিংপুরা আর দিল্লী শহরের আশেপাশে
রাজ চালালো ওরা। খিজরাবাদ, নিজাম উদ্দিন দরগার
ঠে হয়ে গেল। অবশেষে ভয় পেয়ে কেল্লা থেকে
লকারের সব দাবি মেনে নিয়ে আহমদ ফরমান পাঠালে
তবে সব শান্ত।

আহমদ ফরমান পাঠিয়ে মারাঠাদের সব দাবি মেনে নিলে কেল্লার হারেমে ঢুকবার অনুমতি হল আমাদের। সন্ধ্যার মুখে মুখে লাহোর দরজা দিয়ে কেল্লায় ঢুকলাম আমরা। হারেমে ঢুকেই বোরখা খুলে ফেলে খোঁজ করলাম মালেকা-ই-জামানী আর হজরত বেগমের। ওরাও বোধহয় আমার খোঁজই করছিল। মালেকা-ই-জামানী দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন: আল্লার মেহেরমান সাহিবা মহল যে, আমার বে-ইজ্জত করেন নি তিনি।

আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না। অবশেষে একটু শান্ত বোধ করলে হজরত বেগমকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলাম। মালেকা-ই-জামানীর দিকে তাকিয়ে বললাম: আমার যত ভয় ছিল এই আম্মার জন্য। শত্রু-মুখে ছাই দিয়ে আম্মার তো আমার রূপ কম নয়!

মালেকা-ই-জামানী সে-কথার জবাব না দিয়ে হজরতের প্রতি

আমার স্নেহের আধিক্য লক্ষ্য করে একটুখানি হাসলেন মাত্র। অবশেষে আমরা হারেমে এসে আবার মমতাজ মহলের উঠানে দাঁড়ালুম। আল্লা দুনিয়ার মালিক তাঁর বান্দা বাঁদীদের দুয়া করুন।

আমাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মির বক্‌শী শিহাব তার মৌলানা অকিবত মহম্মদকে নিয়ে কেল্লায় ঢুকে এসেছিল দেওয়ানী খাসে। আহমদের আর বুঝতে বাকি ছিল না যে, এতসব করলো কে। ভয়ে তার মুখে আর কথা ছিল না। ওয়াজীরের পদ না পেলে মির বক্‌শী থাকবে না—এটাও সে জানতো। সুতরাং দেওয়ানী খাসে বসে সেই বিকেলেই ফরমান জারি করে ওয়াজীরের পদ দিল সে শিহাবুদ্দিনকে। শুনতে পেলাম নয়া ওয়াজীর কুরাণ ছুঁয়ে কসম খেয়েছে যে, বাদশার গায়ে সে হাত দেবে না, আর যাই করুক। আহমদের সেইটুকুই না ভরসা!

তওফাওয়ালীটার মুখের চেহারা এখন কেমন—আল্লাতালা জানেন। মনে হল একবার খোয়াব ঘরে গিয়ে বাজারের মেয়েছেলেটাকে দেখে আসি। কিন্তু আমাদেরই অবস্থা কি? নড়বার উপায় আছে? এ-কয়দিনের ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে। মনের উপরও চাপতো কম যায়নি। সুতরাং স্বস্তিমত একটু বিশ্রাম নেবার কথাই আগে চিন্তা করলাম।

১৬ই রবিয়ল আউয়ল। সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠতেই রহিমা বাঁদী এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল: বেগম সাহেবা, দেখবেন আসুন।

বললুম: আবার হল কি?

—খাস দেওয়ানীতে দরবার বসেছে?

—এত ভোরে দরবার!

—মির বক্‌শী শিহাবুদ্দিন এসেছেন ওয়াজীর হতে।

বেশ একটা কৌতূহল হল দেখবার জন্যে। ক্ষমতা তো এখন মির বক্‌শীর হাতেই। দেখি না কি হয়? উঠে এসে মমতাজ মহলের মাঠে দাঁড়ালাম। দূরে উঁকি দিয়ে খাসমহলের ভেতরটা খুব স্পষ্ট না হলেও

দেখা যায়। দেখলুম চার জন লোক। আশেপাশে আহমদের খোজা আর বান্দারা। রহিমাকে বললুম চারজন লোক কে কে রে?

এসব ব্যাপারে রহিমা ওস্তাদ। সব জেনে শুনেই এসেছিল। ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমায় সে বলল ঃ ঐ যে হিঁদু মতন দেখছেন ঃ ও হল মারাঠা দুষ্‌মন মলহর রাওয়ের দেওয়ান—নাম—তাড্রা গঙ্গাধর। আর ঐ হল মৌলানা অকিবত। তার পাশে তার ভাই সইফুল্লা-খাঁ। আর মির বকশীকে তো আপনি চেনেনই।

খুব ভাল করে তাকে চিনতুম না। এবার স্পষ্ট লক্ষ্য করে দেখলুম। বয়েস তো খুবই কম! অথচ এই কিনা এত সব কাণ্ড করেছে! তাজ্জব ব্যাপার সব।

দেখলুম আহমদ কুরাণ শরিফ তুলে দিচ্ছে শিহাবের হাতে। আরো কাছে গেলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম হাতদুটো কাঁপছে তার। বাদশা হয়ে এর চাইতে আর বড় অপমান আছে কি?

কুরাণ শরিফ হাতে নিয়ে মির বকশী যেন কি বলছে। হয় তো খুদাতালার নামে শপথ নিচ্ছে যে, বাদশার সে কোন ক্ষতি করবেনা কোন দিন।

আহমদকে দেখলুম—খিলাৎ তুলে নয়া ওয়াজীরের হাতে দিচ্ছে।

আগে হলে দরবার ভেঙে বাদশার নামে চিৎকার উঠতো। নয়া ওয়াজীরের দীর্ঘজীবন কামনা করতো আমীরেরা। কিন্তু এ যেন চুরি করে একটা কিছু হয়ে যাবার মতন ঘটনা। একেবারে নিঃশব্দ। চুপ-চাপ। মনে হয়, এসব কিছু বুঝি সত্যি নয়—খোয়াব দেখছি।

খিলাৎ নিয়ে নয়া ওয়াজীর শিহাবুদ্দিন দলবল নিয়ে বাদশাকে সালামত্‌ জানিয়ে দরবার ছেড়ে চলে গেল। নাজির রজ আফজুনকে পাশে নিয়ে বাদশা উঠে এল খোয়াব ঘরের দিকে। তওফাওয়ালীটা আহমদের মুখ দেখলেই বুঝতে পারবে সব। দুষ্‌মনটা ঢিট হয়ে গেছে এই যা সান্ত্বনা আমাদের। আমি মমতাজ মহলের ভিতরে চলে এলাম।

কিন্তু একি! সব তো হয়েই গেল। আবার এত হৈ চৈ কেন? ছুটে বেরিয়ে এলাম মহলের বাইরে।

জনা পঞ্চাশেক বাদাকশী ফৌজ দেখছি যে হারেমের ভেতর! সবার আগে শিহাবুদ্দিনের মৌলানা অকিবত। হল কি? ডাকতে লাগলুম: রহিমা, রহিমা! কিন্তু রহিমার পাত্তা নেই। সে শয়তানীটা বোধহয় তামাশা দেখবার জন্যে খোয়াব ঘরের দিকেই ছুটে গেছে। কিছু বুঝতে না পেরে মালেকা-ই-জামানীকে ডাকলুম: বেগম সাহেবা, এদিকে আসুন, দেখে যান।

আমি বোধহয় এমন করে আগে কখনো মালেকা-ই-জামানীকে ডাকি নি। সন্ত্রস্ত হয়ে মহল ছেড়ে বাইরে ছুটে এলেন তিনি: কি? কি হয়েছে সাহিবা মহল?

বললুম: দেখুন।

খোয়াব ঘরের ভেতরে ঢুকে আবার ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে বাদাকশীরা। হাঁটতে আরম্ভ করে দিয়েছে হায়াৎবক্স বাগানের দিকে।

মালেকা-ই-জামানী দেখে তাজ্জব। বললেন: ব্যাপার কি?

বললুম: কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

দেখতে দেখতে বাদাকশীরা চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

কিছুক্ষণ বাদে রহিমা বাঁদী ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো।

বললুম: কি হয়েছে? কাঁপছিস কেন?

ও বলল: সব হয়ে গেল বেগম সাহেবা।

—কি হল?

—হজরত কিব্‌লা-ই-আলম, আর বাদশাকে কয়েদ করে নিয়ে গেল বদাকশীরা।

—কোথায় ছিল তারা?

—হায়াৎবক্স বাগানে লুকিয়ে ছিল।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ, বেগম সাহেবা, নিজের চোখে দেখে এলুম।

আমি মালেকা-ই-জামানীর মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু তার অন্তরের ভাব মুখে ধরা গেল না। তিনি একটু চাপা ধরণের মেয়ে। অবশ্য তার আনন্দ হবারই কথা। তওফাওয়ালীটার মত বড় শত্রু তার আর কে আছে!

বললুম: গুণাহ্ কখনো চাপা থাকে না—কি বলেন বেগম সাহেবা? ভালই হল।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: ব্যাপারটা কি আগে দেখিতো। চল এখন মহলে যাই।

কিন্তু মহলের দিকে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই: ঝরোকার ও পাশে, দেওয়ানী আম থেকে ধ্বনি উঠলো: পাদিশা দ্বিতীয় আলমগীর বাদশা গাজি জিন্দাবাদ।

মালেকা-ই-জামানীর মুখের দিকে ফিরে তাকালুম: ও আবার কে?

মালেকা-ই-জামানী বললেন: নয়া কোন বাদশা বোধহয় তকৃতে বসলেন।

—কে?

—আল্লা জানেন। সময় মতো সবই জানা যাবে। চল এখন মহলে ফিরি। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা উচিত হবেনা।

—চলুন।

মালেকা-ই-জামানীর সঙ্গে মহলের ভিতর চলে এলাম।

॥ ১১ ॥

মির বক্‌শী শিহাব হোল সাপের বাচ্চা। রাগ হলে সে ভুলে না কোনদিন। বয়স অল্প হলে কি হবে, হাড়ে হাড়ে শয়তান।

কিব্‌লা-ই-আলম ভেবেছিল কাজ হাসিল করে মির বক্‌শীকে বুঝিয়ে

সুঝিয়ে শান্ত করবে। কিন্তু মহব্বত বলতে যে একটা কথা আছে তা ঐ তওফাওয়ালীটাতো বুঝলে তো! মুসায়েরের মেয়ের জন্য এত করল অথচ আহমদ আর তার আম্মার জন্য তাকেই কিনা পেলনা সে! এ-যন্ত্রণা ভুলতে পারে সে? দিয়েছে তেমনি কামড়। একেবারে গদিছাড়া করে চালান দিয়েছে অন্ধকূপে। এবার দিল্লীর তক্‌তে-তাউস তো তার হাতের মুঠোর মধ্যে। নয়া বাদশার যা খবর পেলাম, তাতে ওয়াজীরের খপ্পরের বাইরে যাবার হিম্মত নেই তার। বয়সও প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাছাড়া বাদশা হবার মত শিক্ষাদীক্ষাও পায় নি। শা আলম বাদশার ছেলে, বাদশা মুইজুদ্দিন জাহান্দার শার পুত্র হল নয়া বাদশা। জাহান্দার শাকে খুন করে যেদিন ফররুকসিয়র বসেন দিল্লীর তক্‌তে, সেদিন থেকেই লালকেল্লার দেওরী-ই-সালাতিনে দিন কাটাচ্ছেন। না পেয়েছেন শিক্ষা, না দীক্ষা। রাজ্য চালাবার হিম্মত পাবে কোথায়?

তবে গুণের মধ্যে শুনছি এই যে, সরাব, সিরাজী, গাঁজা, ভাঙ, আর চরসের মধ্যে নেই। দিনরাত কিতাব আর নামাজ নিয়েই থাকেন। যা-হোক, তবু রক্ষা। দুই দুই বাদশাকে কেল্লার ভেতরেতো দেখলুম—সরাব, সিরাজী আর জেনানা আদমি নিয়েই গেলেন। অন্তত এ-পাপ থেকেও বাদশার হারেম যদি রক্ষা পায় তবে মন্দ কি?

আমাদের হজরত বেশ বড় হয়ে উঠেছে। একটা সাড়া পড়ে গেছে তার মধ্যে বেশ বোঝা যায়। নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টার তার অন্ত নেই। আর্শীতে যে কতবার সে নিজের মুখ দেখে তার হিসাব রাখা ভার। নিজের রূপ সম্পর্কে সে ভারি সচেতন। অবশ্য আল্লাতালা তাকে সত্যি দেখবার মত রূপই দিয়েছেন বটে। কিন্তু সে রূপ এই কেল্লার ভেতর দেখবে কে? খোজা, না বাঁদী। পুরুষ বলতে হারেমের মধ্যে অবাধ গতি শুধু বাদশার। নিজের ভাই হলেও লম্পট আহমদের সামনে হজরত কে কখনো যেতে দেইনি আমরা। এখন মাঝে মাঝে সে খাস দরবারের দিকে উঁকি দিতে চায়। একমাত্র সেখানেই বাদশার বাছাই বাছাই পেয়ারের আমীরেরা আসে। হারেমের মধ্যে

পরপুরুষ বলতে তারাই শুধু আসে। কিন্তু ঘরের জেনানাদের পর-পুরুষের চোখের সামনে তুলে ধরব হেন বুদ্ধিহীন তো আমরা নই। সঈয়দ হুসেন আলি যে হারেমের মধ্যে বাদশা রফি-উদ্-দরজাতের বেগমকে দেখে কি কাণ্ড করেছিলেন আমরা তো সে-কথা ভুলি নি! শেষে নিজের মাথার চুল কেটে দিয়ে আমীর-উল্-উমারার হাত থেকে রেহাই পায় সে। হজরতকে তাই আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে রাখি। কিন্তু হজরত চায় নিজেকে বাইরে টানতে, দশ জনকে নিজের রূপ দেখাতে। লোকে দেখুক—রূপ কাকে বলে!

নয়া বাদশা তক্‌তে বসেছে শুনে হজরত প্রথমটা বেশ উল্লসিত বোধ করেছিল। কিন্তু এখন তার বয়েসের কথা শুনে একেবারে চুপ্‌সে গেছে। একগাদা লেড়কা-বাচ্চাতো আছেই, তাছাড়া তার নিজের বড় ছেলে আলি গহরেরই ছেলেপিলে কয়েকজন। দিল্লীর বাদশাদের ডাল-পালা বেড়ে গিয়ে এখন এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, নিজেদের মধ্যে বিয়ে সাদী হতে আপত্তি নেই। সে ক্ষেত্রে তরতাজা একজন শাজাদা গদিতে বসলে খবসুরত কোন শাজাদীর তো উল্লাস বোধ করা স্বাভাবিক। কিন্তু হজরত বেগমের দুর্ভাগ্য।

নতুন বাদশার কথা শুনে অনেকের মধ্যেই একটা ভরসা এসেছিল। হাজার হোক আলমগীর উপাধি যে বাদশা গ্রহণ করেছেন, তিনি ফেলনা হতে পারেন না! হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা আজো সকলে আলমগীর বাদশার নাম শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়। কিন্তু সে ধারনা ভেঙে যেতে দেরী হোল না। আলমগীর বাদশার মত সাহসও নেই তাগদও নেই। যুদ্ধ কাকে বলে নয়া বাদশা তা জানেই না। শিকার-যাত্রায় বেরুবার সাহস পর্যন্ত নেই তাঁর। হারেমে বসে হাফিজ; সাদি, রুমি, জামী, নয়তো বা কুরাণ শরিফ নিয়ে পড়ে থাকেন। কিতাব পাগল হলেও না হয় বরদাস্ত করা যেত। কিন্তু আরো অনেক গুণ আছে। মোগল-রক্তে পাপ ঢুকেছে, সেটা যাবে কোথায়। সরাব সিরাজী ছোঁন না বটে নয়া বাদশা কিন্তু খবসুরত জেনানা আদমি দেখলে একেবারে পাগল।

পয়গম্বর বলেছেন চারজন বেগম পর্যন্ত রাখা চলে। কিন্তু প্রথম আল-মগীর বাদশা—অতদূর পর্যন্তও যান নি। কিন্তু নয়া আলমগীর তক্‌তে বসে চার দিনেই চারজন বেগম এনে ঘরে তুলেছেন। আগের বেগম তো আছেই! তোবা! তোবা!

খবর শুনে মালেকা-ই-জামানী বললেন: বুড়ো বয়েসে যে একটু খোলামেলা ঘুরে বেড়াব হারেমের মধ্যে সে উপায়ও রইল না। আমি ঠাণ্ডা করে বললুম: বুড়ো বয়েসেও বেগম সাহেবার যে রূপ আছে তা দেখলে নয়া ওয়াজীরই হয়তো ভিড়মি খাবে। সে অবস্থায় নয়া বাদশার জেনানা আদমির রূপের তারিফ-জ্ঞান যে-রকম দেখছি তাতে ভয় পাবারই তো কথা।

কিন্তু পরিহাস ছেড়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গম্ভীরভাবে মালেকা-ই-জামানী বললেন: না, ঠাণ্ডার কথা নয় সাহিবা মহল। নয়া আলম-গীরের যে রুচির কথা শুনছি তাতে হজরতকে সামলে চলতে হয়।

বললুম: তা ঠিক। শুনছি কোন্ এক শাজাদীকে জোর করে ঘরে উঠিয়েছেন বাদশা!

সত্যি, আচ্ছা বেকুব মোগল শাজাদাগুলো। এত দেখেশুনেও যদি কিছু শিখলো! তক্‌তে বসার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন প্রাণভরে সরাব সিরাজী গেলা, আর নিত্য নতুন জেনানা আদমি উপভোগ করা। আসলে বাদশার মূল্য যে একটা খোজার চাইতেও কম এখন, এরা তা বুঝতে চায় না। ছি! ছি!

মোগল বাদশাকে শুধ্‌রাবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই, তাই আমরা নিজেরাই সমঝে চলবার চেষ্টা করি। নজরে নজরে রাখি হজরত বেগমকে, পাছে সে গিয়ে ঐ লম্পট বাদশাটার চোখে পড়ে।

নয়া ওয়াজীর শিহাবুদ্দিনের এসবের দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত নেই। সে এখন মরছে নিজের জ্বালায়। ইরানী সেই মুসায়েরের মেয়েটার কথা এখনো সে ভুলতে পারেনি। তার জন্যই তো এত সব কাণ্ড। একটা হাতের পুতুল বাদশা বসাতে না পারলে নিজের ইচ্ছা

মত কাজ করা যায় না বলেই নয়া বাদশা বসিয়েছে সে তক্‌তে। তার লক্ষ্য সেই লক্ষ্ণৌ—যেখানে সফদর জঙ্গ সেই মুসায়ের আর তার পরিবারকে নিয়ে গেছেন। সুযোগ পেলেই লক্ষ্ণৌ থেকে গন্না বান্নুকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে শিহাব সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সুযোগ করতে গিয়েই হয়েছে বিপদ। মারাঠাদের দোস্তী চাইতে হয়েছে শিহাবকে। এই পাহাড়ী ইঁদুরগুলো টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। যে টাকা দেবে তারা তার হয়েই লড়বে। নয়া ওয়াজীর তো মারাঠাদের নিজের পক্ষে লড়িয়েছে—এখন তাদের টাকা দিতেই হিমসিম। টাকা টাকা বলে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। বাদশার দিকে ফিরে তাকাবার তার সময় আছে নাকি ?

মারাঠারা কম করে এখনো চল্লিশ লাখ রুপিয়া পাবে ওয়াজীরের কাছ থেকে। শুনলাম টাকার জন্যে ইতিমধ্যেই নয়া ওয়াজীর আহমদের আম্মা সেই তওফাওয়ালীটার আত্মীয় স্বজনের উপর হামলা শুরু করেছে। আহমদের আমলে কিব্‌লা-ই-আলম দেহাত থেকে ধরে এনে যাকে যাকে বড় বড় মনসব দিয়েছিল। এখন সে-সব বের করছে শিহাবুদ্দিন। শুনলাম মারধোর করে কেল্লা থেকে সবাইকে বের করে সাবাজপুরের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে ওয়াজীর। তারপর তাদের যথাসর্বস্ব লুঠে নিয়েছে। কিন্তু মেরে কেটেও তিন লাখ রুপিয়ার বেশী আদায় করতে পারেনি।

জেননা আদমির জন্য দুনিয়ায় কি না হয়। একটা মুসায়েরের মেয়ের জন্য যে ভুল করেছে শিহাব, এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে। টাকা না দিলে মারাঠারা ছাড়বে কেন ? টাকা ওয়াজীরের চাই-ই। টাকা আদায়ের জন্য নয়া বাদশার পাঞ্জা দিয়ে এক ফরমান জারি করেছে ওয়াজীর। ঘরে ঘরে ফৌজ বসিয়ে দিয়েছে। আমীরদের ঘরে ঢুকতে গেলেই টাকা দিতে হবে, বাইরে যেতে হলেও। বাজারে বাজারে ব্যবসায়ীদের মারধোর চলেছে টাকা আদায়ের জন্য। কিন্তু আমীর আর বেনেরা সেই বান্দা নাকি যে সহজে টাকা ছাড়বে ? ফলে বাজার বন্‌ধ।

হাজার হাজার আমীর আর বেনে এসে নিত্য হল্লা জুড়ে দিয়েছে ঝরোকাতে, ফরমান বাতিল কর বলে। কিন্তু বাদশার হিম্মত কি যে ফরমান সে বাতিল করে? ওয়াজীর শুনবে না। অবশেষে শুনছি আলমগীর বাদশা অনশন করবার হুমকি দেওয়াতে শিহাবুদ্দিন ফরমান বাতিল করতে রাজি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কে জানে।

কিন্তু টাকা তো ওয়াজীরের চাই-ই। নইলে মারাঠা দোস্তেরা ওয়াজীরের নিজেরই গর্দান নেবে না! অনেক করে জমাসানি মাস শেষে আরও নয় লাখ রুপিয়া তাদের দিয়েছে সে। বাংলা থেকে টাকা এলে, আর নয়া দুইজন মির বক্‌শীর কাছ থেকে নজরানা নিয়ে বাকি সতের লাখ রুপিয়া তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবে বলেছে ওয়াজীর। কিন্তু বাংলার টাকা এলে তো দেবে সে? নয়া মির বক্‌শীরাও অত টাকা দিতে পারেনি। অবশেষে নয়া এক বুদ্ধি ঠাওরেছে ওয়াজীর। কে যেন বুদ্ধি দিয়েছে যে, দিল্লী শহরের আদমিরা যদি শির পিছু দুটো করে তঙ্কাও দেয় তাহলে দুই কোটী রুপিয়া সংগ্রহ হবে। নয়া বাদশাকে দিয়ে সেই উদ্দেশ্যে এক ফরমান জারি করিয়েছে সে।

কিন্তু কোথায় রুপিয়া? দুই কোটী তো দূরস্থান মাথা পিছু জোর জবরদস্তি করে পাঁচ দশ টাকা আদায় করেও এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়নি। ফলে ক্ষেপে গিয়ে শিহাবুদ্দিন হুকুম করেছে যে, ধনী আমীরদের হাজার টাকা করে দিতে হবে। কিন্তু ধনী আমীর আর দিল্লীতে আছে নাকি? নাদিরকুলি, আর মারাঠা দুষ্‌মনেরা লুঠ করে করে কিছু বাকি রাখেনি? কাল যে আমীর ছিল আজ সে প্রায় ফকির। সুতরাং আদায় কিছুই হলনা। বরং আবার সেই আগের মত হল্লা হল। বেনেরা বাজার বন্ধ করে দিল। ঝরোকাতে হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়ে বলতে লাগলো: অত্যাচার বন্ধ কর। হাদিসের নিয়ম ছাড়া এক কানা কড়িও দেওয়া হবেনা।' অগত্যা ৭ই শাবান ওয়াজীর বলল: হুকুম বাতিল। তবে দিল্লী শান্ত।

মোগল বাদশাহী যখন জাহান্নামে যেতে চলেছে তখন তাকে আর রুখবে কে ? দোজখে গিয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত এর আর ছাড়ান নেই। হেন একটা দিন যাচ্ছে না—যেদিন কোন না কোন গোলমালের কথা না শুনছি। দিল্লীতে রোজই কোন না কোন লুঠতরাজ চলছে। মারাঠাদের লাখ লাখ রুপিয়া দেওয়া হচ্ছে। ওদিকে মোগলাই ফৌজেরা এক কানা-কড়িও মাইনে পাচ্ছে না, তারাই বা এটা মানবে কেন। তারা যে যার নিজের ইচ্ছেমত দিল্লী লুঠ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

ঝরোকাতে নিত্য আর্জির আর শেষ নেই। কিন্তু তাগদছাড়া বাদশা আর্জি শুনে করবে কি ? তাঁর প্রতিকার করবার কোন উপায় থাকলে তো ? কানে তুলো দিয়ে কিতাব ঘরে পড়ে থাকছে সে। আর সন্ধ্যাবেলা নয়া নয়া বিবি নিয়ে আমোদ করছে। বাহাদুর দিল্লীর বাদশা বটে !

৫ই রবিয়স-সানি সন্ধ্যাবেলা খবর পেলুম যে, গোলন্দাজ ফৌজেরা রাস্তায় টেনে এনে ওয়াজীরের মৌলানা অকিবত মহম্মদের গায়ের পিরাণ আর পরনের পায়জামা ছিঁড়ে তাকে প্রায় উলঙ্গ করে রাস্তায় ঘুরিয়েছে : এ-জন্যে ওয়াজীর দায়ী করেছে মৌলানাকেই। দুপুরবেলা দাওয়াতে খেতে ডেকে এনে বৈঠকখানা ঘরে নাকি ওয়াজীরের আফগান বান্দারা তার পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। মৌলানার খেল্ খতম। হবেই। সেকেন্দ্রাবাদে দুষ্‌মনটা আমাদের অযথা কি হয়রান করেছিল। আল্লাতালা তার বিচার করবে না ? যমুনার বালুচরে নাকি এখনো মৌলানার দেহটা পড়ে রয়েছে। কেউ কবরও দেয়নি।

মৌলানার কথা নিয়ে আমি আর মালেকা-ই-জামানী আলোচনা করছিলাম। হজরত বসে বসে আমাদের কথা শুনছিল। এমন সময় কেমন ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে রহিমা বাঁদী আমাদের মহলে ঢুকে বড় বড় চোখে ফিস্‌ফিস্ করে বললো : শুনেছেন বেগম সাহেবা ?

ওর ভাবসাব দেখে আমরাও যেন একটু ঘাবড়ে গেলুম। বললুম : —কি হয়েছে আবার ?

—কিব্‌লা-ই-আলম আর আগের বাদশাকে অন্ধ করে দেওয়া হল এই মাত্র!

চমকে উঠে বললাম: সত্যি?

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা, আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।

কতদিন কত আক্রোশ দেখিয়েছি উধম বাঈয়ের উপর। কতবার তওফাওয়ালী বলে তাকে গালি দিয়েছি। কিন্তু এ-কথা শুনে হঠাৎ আজ যেন কেমন বেদনা বোধ করলাম। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল ক্ষমতা হারিয়েই। আবার তাঁকে অন্ধ করা কেন? ওয়াজীর বোধহয় ক্ষেপে গেছে। তাঁর মাথার ঠিক নেই। একটা মুসায়েরের মেয়েকে দেখেই এমন হয়ে গেল শিহাবুদ্দিন! কি আর করব। আল্লাতালার কাছে প্রার্থনা জানালুম—তিনি যেন আহমদ আর তার আম্মাকে এবার থেকে দুয়া করেন।

মালেকা-ই-জামানীকেও দেখলুম—এ সংবাদ পেয়ে কেমন যেন ব্যথায় নীরব হয়ে গেছেন।

আমদের সকলেরই মুখের কথা যেন হারিয়ে গেল।

মানুষের দরবারে পাপ করে ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আল্লা-তালার দরবারে সব কিছুরই চুল চেরা বিচার হয়। ওয়াজীরকেও এর শাস্তি পেতে হল। হিজরী ১১৩২ সাল। ৮ই শাবান। নয়া ওয়াজীর তার গোলন্দাজদের কথা দিয়েছিল যে, এগার দিনের মধ্যে তাদের বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দেবে সে। কিন্তু টাকা থাকলে তবে তো দেবে? শুনলাম কথা রাখতে পারেনি বলে গোলন্দাজেরা ওয়াজীরের মহল লুঠ করেছে। শুধু তাই নয়, সোলাপুরী বেগমকেও খুব অপমান করেছে। ওয়াজীরকেও রেহাই দিয়ে যায় নি। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে শিহাবুদ্দিনের এখনো সমঝে চলা উচিত, নইলে এর পরিনাম ভয়াবহ হবে।

কিন্তু ওয়াজীর এখন অন্ধ হয়ে আছে। কাণ্ডজ্ঞান তার হবে কোত্থেকে? সেই মুসায়েরের মেয়েটাকে না পাওয়া পর্যন্ত ওয়াজীরের

শান্তি নেই। টাকার খোঁজে শিহাবুদ্দিন ব্যস্ত। টাকা পেলে মারাঠা দোস্তদের খুশী করে তবে সে হাত বাড়াবে মুসায়েরের বেটী গন্না বেগমের দিকে। সেই এক চিন্তাতেই সে পাগল। ১৮ই শওয়াল দুপুর বেলা খবর পেলাম যে, গোলন্দাজ ফৌজেরা আবার ওয়াজীরের মহলে ঢুকে লুটপাট করছে। মুখের কাছ থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে চলে গেছে পর্যন্ত। অবশেষে প্রত্যেক-টা গোলন্দাজ ফৌজকে মাথা পিছু পাঁচ টাকা আর পয়দালী সিপাহদের মাথা-পিছু এক টাকা করে দিয়ে তবে রেহাই পেয়েছে।

কিন্তু কয়জনকে খুশী করবে ওয়াজীর? বাদশার ফৌজেরাতে এখন পর্যন্ত কেউ কিছু পায়ই নি। ফলে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা বলবার নয়। ৭ই জমা-য়ল আবার গোলমাল আরম্ভ হোল। মির বক্‌শী সাম-সুদ্দৌলা মারা গেলে তার ফৌজেরা কফিন আটকে বসে রইলো, বকেয়া মাইনে মিটিয়ে না দিলে কবর দিতে দেবেনা তাকে। সেই সঙ্গে কেল্লায় বসানো ওয়াজীরের ফৌজেরাও হুজ্জোৎ শুরু করে দিল। সারা শহরে ভয়ের ছায়া। মোগলাই ফৌজেরা নাকি নিজেদের খেয়াল খুশী মত চলতে শুরু করেছে। যেখানে সেখানে কামান নিয়ে বসে গেছে। জামা মসজিদেও কামান বসেছে। শহরের সমস্ত দরজায় তাদের চৌকি। খেয়াল খুশী মত কউকে বা শহরে ঢুকতে দিচ্ছে না—কাউকে বা ঘাড় ধরে শহরের বার করে দিচ্ছে। একি শয়তানের রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে! বুড়ো-বাদশাটা করছে কি? এসব যদি দেখতে না পারে তবে আলমগীর বাদশা নাম নিয়ে তৈমুরের বংশকে বে-ইজ্জত করবার মানে কি? লালকেল্লা ছেড়ে দিয়ে ফকিরের ঝোলা কাঁধে নিয়ে রাস্তায় নেমে যাওয়াই ভাল তার। কেল্লার হারেমে বসে থাকতে নিজেরই এখন যেন সরম লাগে।

বিমর্ষ হয়ে বসে ছিলাম। এসব দেখে শুনে কিছুই যেন আর ভাল লাগে না। হারেমের বান্দা বাঁদীরাও কেমন বে-আদব হয়ে উঠেছে। কারো কথা কেউ শুনে না। আমাদের রহিমাটাকে পর্যন্ত দেখছি

যেন আজাদী পেয়েছে। মমতাজ মহলে সে বড় একটা থাকেই না। ঘুরে ঘুরে সব মজার খবর কুড়াতেই ব্যস্ত। কোথায় বেরিয়েছে সে দুপুর না পড়তেই। এখন পর্যন্ত পাত্তা নেই। ভাবছিলুম—ফিরে এলে একচোট গালাগাল করব বাঁদীটাকে। ঠিক সেই সময়ই দেখি সে এসে হাজির। রেগে বললুম ঃ কোথায় ছিলেন এতক্ষণ নবাবের বেটী ?

কিন্তু ভয় বা লজ্জা পাবে তো দূরস্থান—দাঁত বার করে হাসতে হাসতে রহিমা বলল ঃ জানেন বেগম সাহেবা, এক মজার কথা শুনে এলাম !

মজার কথা শুনবার জন্য আমার নিজের গোপন মনেও কেমন যেন একটা কৌতূহল আছে। তাই ধমকে উঠতে গেলেও রহিমাকে ধমকাতে পারলুম না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

রহিমা বলল ঃ শাহেনশা কেল্লায় নেই জানেন ?

—কেল্লায় নেই ?

—আজ্ঞে বেগম সাহেবা। গোলমাল হবে শুনে কেল্লা ছেড়ে লুনি গিয়ে পালিয়ে আছেন।

—তারপর !

—কেল্লা থেকে নয়া দুই বেগম সাহেবাকে লুনি যাবার জন্য হুকুম পাঠিয়েছিলেন। শহরের দরজায় ফৌজেদের হাতে বে-ইজ্জত হবার উপক্রম হয়েছিল তাদের।

—হ্যাঁ ?

—আজ্ঞে বেগম সাহেবা।

—তারপর ?

—ভিস্তিওয়ালী সেজে কোন রকমে পালিয়ে গেছেন তারা।

তোবা! তোবা! কিছু আর বাকি রইল না। যেমন বাদশা, তেমন তার বেগম। ছোটলোকের মেয়েদের হারেমে এনে উঠালে এর চাইতে ভাল আর কি আশা করা যাবে। আল্লা জানেন শেষ পর্যন্ত হারেমের মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

অবশেষে কেল্লার দুয়ারে ফৌজেরাও গোলমাল শুরু করে দিল। ১৫ই জমা-সানি রহিমা বাঁদী মুখ কালো করে এসে মমতাজ মহলে দাঁড়ালো। তাকে এমন চুপ্‌ষে যাওয়া ভাবে আগে কখনো দেখিনি। বললুম: কি হয়েছে রে?

রহিমা বলল: বেগম সাহেবা, আজ দুপুরের খানা পাওয়া যাবে না।

—কেন?

—বাইরের ফৌজেরা ভেতরে কোন খানা ঢুকতে দিচ্ছে না ক'দিন ধরে। কেল্লায় নাকি খাবার নেই।

শুনে যেন মুখে কোন কথা থাকলো না আমাদের। ক'দিন ধরেই খানার যে বহর দেখছিলাম তাতেই বুঝেছিলাম যে একটা কিছু বিপর্যয় ঘটবেই। খুব তাড়াতাড়ি সেটা ঘটে গেল।

রহিমা বলল: কি করব বেগম সাহেবা?

বললুম: কি আর করবি। পানি পাওয়া যাবে তো? পানি নিয়ে আয়—ওজু করে নামাজ পড়ি। খুদাতালা ছাড়া আমাদের দেখবার এখন আর কেউ নেই।

সত্যি, নসিবে এত লাঞ্ছনাও ছিল সেটা আগে কোনদিন ভাবতে পারিনি। পেটে দেবার দানা তো দূরস্থান—শেষে পানিরও টানাটানি পড়ে গেল কেল্লাতে। সাতদিন প্রায় একেবারে অনাহার। অবশেষে সইতে না পেরে হজরত বললেন: আম্মা, কেল্লায় থেকে আর কি হবে? চল বেরিয়ে পড়ি।

সেকথা শুনে মালেকা-ই-জামানী হু-হু করে কেঁদে ফেললেন। সইতে না পেরে রহিমা বাঁদীকে ডেকে বললুম: দেখ্‌তো একদানা খাবার কোথাও পাওয়া যায় কিনা। রুপিয়া তঙ্কা যা লাগে দিচ্ছি। খাস জমিনের ভাগ বোধহয় আমাদের আর দেবে না বাদশা, নিজের সঞ্চয় ভেঙেই খেতে হবে।

রহিমা বলল: হজরত সাহেবা, তঙ্কা দিলেই খাবার মিলবে

কোথায়? সারা শহরে একটা গমের দানা ঢুকতে দিচ্ছে না ফৌজেরা। তাদের মাইনে মিটিয়ে না দিলে তারা সকলকে না খাইয়ে মারবে। শাজাদা আলি গহরের বেগমেরা লেড়কা বাচ্চার হাত ধরে হারেম ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল লাহোর দরজা পর্যন্ত। হারেমে আর থাকতে চান না তারা। শাজাদা দেওয়ান শাকির খাঁর কাছে চুপিচুপি এক বালতি বাজরার লপ্সি এনে হারেমের বেগমদের খেতে দিয়েছেন।

সে-কথা শুনে হজরত বললেন: আম্মা, আমায় এক হাতা লপ্সি এনে দাওনা লঙরখানা থেকে?

মনে হল চিৎকার করে কেঁদে উঠি। কিন্তু মোগল হারেমের বেগমের তো সহজে চোখের পানি ফেলবার উপায় নেই। গম্ভীরভাবে বললুম: না হজরত, শাজাদী হয়ে লঙরখানার খাবার তুমি খেতে পারনা।

হজরত বললেন: আমার যে বড় ভুখ্ লেগেছে আম্মা?

বললুম: ভুখ্ লেগে না খেয়ে যদি কবরে যেতে হয়, তাও যাবে—কিন্তু তাই বলে গরিবের খানা খাওয়া চলবে না।

আমার কথার উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল হজরত। কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আর কোন কথা বলতে পারল না। পাশে তাকিয়ে দেখলুম মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেন মালেকা-ই-জামানী। হায় রে বাদশাহী!

কেল্লার দরওয়াজা খুললো ২৯শে জমা-সানি। তাও খুললো সুবে বাংলার জগৎশেঠের দুয়ায়। জগৎশেঠের কর্মচারীরা হারেমের দুর্দশা দেখে ফৌজেদের মাইনে নিজেরা মিটিয়ে দিলে তবে দুয়ার খুললো। অথচ নয়া ওয়াজীর শিহাবুদ্দিন কি করছে? সে তখনো মোগলাই ফৌজ ছেড়ে দিয়ে শহরসুদ্ধো লোক পিটছে টাকার জন্যে। আসলে এ-সবই তার কাজ। তুর্কী রক্ত যার মধ্যে আছে সে যে এত নিচে নামতে পারে ভাবা যায় না। মোগল হারেমকে বে-ইজ্জত করবার যদি তার এত ইচ্ছা, তাহলে আহমদকে হটিয়ে আর একজন তৈমুরের বংশ-

খয়ক্কে সে তক্‌তে বসালো কেন? নসমন-জিল্ ইলাহীতে বসে মৌলানাদের দিয়ে নিজের নামে খুত্‌বা পাঠ করালেই তো পারতো! একটা সাধারণ মেয়ের জন্য জাহান্নামে গেছে ওয়াজীর। কিন্তু খুদাতালা এত গুণাহ্ সইবেন না বলে দিলাম। ঐ মুসায়েরের মেয়েটাকে সে পাবে না, কিছুতেই পাবে না।

ছিঃ। ছিঃ। ছিঃ। শেষ পর্যন্ত এ বে-আদবিটাও করল তাহলে বুড়ো বাদশাটা। ষাট বছর বয়স, অথচ সে কিনা……। সত্যি তৈমুরের রক্তে পচন ধরেছে—নইলে উচ্ছন্নমতি উজবুক হবে কেন দিল্লীর বাদশারা। কুরাণ পড়ে এ উজবুকটার হবে কি? খুদাতালার পথ তো সে নিজেই বন্ধ করেছে। এর চাইতে লম্পট বাদশারাও যে ভাল ছিল। এমন ভড়ং দেখায় নি। মদ খেয়েছে, বাজারের মেয়েছেলে এনে ভোগ করেছে, তওফাওয়ালী নাচিয়েছে। ক্ষমতা নেই, বুড়ো দেখি হাত বাড়িয়েছে হারেমের ভিতর। মালেকা-ই-জামানীর কাছে কথাটা শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। বললুম: কৈ দেখি বাদশার হুকুমনামা?

তখনো হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল হুকুমনামাটা, মালেকা-ই-জামানী আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। হুকুমনামা পড়ে আমার যেন পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল। বাদশা দ্বিতীয় আলমগীর হুকুম করেছেন বেগম মালেকা-ই-জামানীকে: তোমার কন্যা হজরতকে দেখে বহুৎ খুশ্ হয়েছি। হেন খবসুরত জেনানা হিন্দুস্থানে আছে বলে আমার বিশ্বাস ছিল না। তোমার লেড়কি সুখে থাকবে। তাকে আমি খাস মহলের পয়লা সারির বিবি করব। খিলাৎ পাঠালাম। বলতো আমার খোজা গিয়ে শাজাদীকে সালামত্ জানিয়ে এখনি নিয়ে আসবে খোয়াব ঘরে। তোমাদেরও আর মমতাজ মহলে এক কোণে পড়ে থাকতে হবে না। মহলে এসে আবার রোজ 'বেগম সালামত্' পাবে।

হুকুমনামা পড়ে মালেকা-ই-জামানীকে বললুম: উল্লুকটার সাহস আছে দেখছি। তা ঐ বুড়ো শকুনটা হজরতের খবর পেল কোত্থেকে?

কপাল চাপড়ে মালেকা-ই-জামানী বললেন : আমার নসিব সাহিবা মহল। নইলে বুড়ো মেয়ে হজরত যাবে কেন শা' বুরুজে বেড়াতে। সেখানেই দেখেছে সে হজরতকে। কত বলি সমঝে চল, দিল্লীর হারেমে এখন শয়তানের রাজত্ব। কার কথা কে শুনে। এখন হল তো?

আমি বললুম : হজরতের দোষ কি? মমতাজ মহলে সে কুঁজো হয়ে বসে থাকবে? বুড়োটার চোখে পড়েছে বলেই তাকে সাদী করতে হবে নাকি?

মালেকা-ই জামানী বল্লেন : কিন্তু এখন আমি কি করি?

বললুম : কি আর করবেন, গালাগাল করে জবাব পাঠিয়ে দিন বে-আক্কেলটাকে, যাতে এমন সাহস সে আর কখনো না করে। কিন্তু আমার জবাবের তোয়াক্কা সে করবে কেন? যদি বলে জোর করে ছিনিয়ে নেব তোমার মেয়েকে?

বললুম : ইস্ বললেই হোল আর কি। সে কি চিঙ্গিস খাঁ না তৈমুর লঙ, না নাদিরকুলি, যে তাকে ভয় করে চলতে হবে? বাড়াবাড়ি করে তো উজীর শিহাবউদ্দিনকে খবর দিন। ও বাঁদরটা তো উজীরের হাতের পুতুল। ওয়াজীর একটা ধমক দিলে খোয়াব ঘরের পালঙ্কের নিচে সেঁধিয়ে যাবে।

মুখ বাঁকিয়ে মালেকা-ই-জামানী বললেন : হুঁ, ওয়াজীরই আমার দরবেশ কিনা! সে এখন আছে নিজের ধাঁধায় সেই মুসায়েরের মেয়েটা দিল্লীতে এয়েছে। আলিকুলির বাড়ি গিয়ে মুসায়েরটাকে এখন সে দিনে চারবার সালামত্ জানাচ্ছে। তোবা! তোবা! আমীর, ওমরা, বাদশা, ওয়াজীর, সব এখন এক দলে। উপরের দিকে নজর নেই। চোখ ভাগাড়ের দিকে। নইলে মুইন খাঁর মেয়ে উমদা বান্নুর সঙ্গে সাদীর কথা পাকা। পাঞ্জাব থেকে ঘন ঘন খবর পাঠাচ্ছে মুঘলানী বেগম—'মেয়েকে নিয়ে যাও।' কিন্তু সেদিকে ফিরে তাকাবার অবসর আছে তার?

মনের দুঃখে মালেকা-ই-জামানী অনেক কথাই বলে গেলেন। নইলে

সে-সব শুনবার কৌতূহল আমার তেমন নেই। এসব কথা আমিও জানি। তবে মুঘলানী বেগম আমীরের বেগম হলেও বাজারের মেয়ের চাইতে তার ইজ্জত বেশী নেই। নিত্য নতুন পুরুষ নইলে তার চলেনা। পাঞ্জাবে তা নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। ও-সবে আমার আগ্রহ নেই। আমার কৌতূহল ঐ মুসায়েরের মেয়েটাকে নিয়ে। শুনছি শুধু খবসুরত নয়, যথেষ্ট গুণেরও অধিকারিণী। নাচতে পারে, গাইতে পারে। সে নিজেও নাকি এখন জেনানা মুসায়ের। নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলা পাগল গন্না-বান্নুর জন্যে। আলিকুলি কথা দিয়েছেন, তার মেয়ের সাদী দেবেন তিনি নবাবজাদার সঙ্গে। তবে কি সফদর জঙ্গ মারা যাওয়াতে কথার খেলাপ করবে আলিকুলি? হিন্দুস্থানের ইরাণীগুলোর স্বভাবই এই। সূর্য যেদিকে—তাদের মুখও সেদিকে। মালেকা-ই-জামানীকে বললুম: তা হঠাৎ মুসায়ের সাহেব দিল্লীতে কেন?

মালেকা-ই-জামানী মুখ বাঁকিয়ে বললেন: খুদাতালা জানেন। আমি মরছি নিজের ঘায়ে, পরের খবর রাখে কে। শুনছি অযোধ্যা থেকেই মিটমাটের জন্য দূত করে পাঠানো হয়েছে আলিকুলিকে। সুজাউদ্দৌলা তো জানে না যে মুসায়েরের প্রতি দুর্বলতা আছে ওয়াজীরের। একটা মিটমাট করতে চায় সে শিহাবের সঙ্গে।

বললুম: মিটমাট না করে ওয়াজীর যদি এখন মেয়েটাকে আটকে রাখে?

মালেকা-ই-জামানী বললেন: মরুক গে। সে খবরে আমার দরকার কি। এখন ঐ বুড়ো উল্লুকটাকে নিয়ে কি করি তাই ভাবছি।

বললুম: ভাববার কি আছে। জবাব দিয়ে দিন যে একটা ডবগা মেয়েকে বুড়োর হাতে তুলে দেবনা কিছুতেই।

—তুমি বলছ?

—হ্যাঁ।

—সে যদি না শুনে?

—আমি বলছি শুনবে। এত হিম্মত হবে না আলমগীরের যে জবরদস্তি করবে।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: তাহলে সে জবাবই দিয়ে দিই আলমগীরকে, কেমন?

বললুম: হ্যাঁ, তাই দিন।

আমার ভরসা পেয়ে মালেকা-ই-জামানীর চোখে যেন একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো।

মানুষের সব চাইতে বড় রোগ বোধহয় মেয়েছেলের রোগ। দুনিয়ার কত বড় বড় রাজা বাদশা জেনানা আদমির জন্য তাবৎ রাজ্য-সুদ্ধো হারিয়েছেন। ট্রয় নগরী ধ্বংস হল গ্রীক রাণী হেলেনের জন্য। এণ্টনি একটা রোমান সাম্রাজ্যই ছেড়ে দিলেন ক্লিয়োপেট্রার জন্য। অমন যে বীর স্যামসন তিনি জান্ বরবাদ করলেন ডেলাইলাকে পাবার জন্যে। দিল্লীর সুলতান কায়কোবাদ জেনানা আদমির ভিড়ে নিজেকেই হারিয়ে ফেললেন। বাঈজী আর তওফাওয়ালী মোগল বাদশাদের খেয়েছে। এ-রোগ সহজে যাবার নাকি? বুড়ো বাদশা আলমগীরও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে খবসুরত হজরত বেগমকে দেখে। মালেকা-ই-জামানীর জবাব পেয়ে ক্ষেপে গিয়ে বুড়োটা জানিয়েছে যে, ভালভাবে সে হজরতকে খোয়াব ঘরে পৌঁছে দেয় তো ভাল—নইলে জোর করে নিয়ে যাবে। শুনে মালেকা-ই-জামানী চোখের পানি ফেলে অস্থির। বলছেন: হায় আল্লা! দুনিয়ায় বিচার নেই নাকি? বাদশা বলে আলমগীর যা খুশী তাই করবে?

শুনে হজরত পর্যন্ত ক্ষেপে লাল। হাজার হোক—তৈমুরের রক্ত তো তার গায় আছে! সে বলেছে, বুড়ো বাদশার মুখে সে পয়জার মারবে। আলমগীর ভেবেছে কি! একটা কফিনের মড়াকে সাদী করবে নাকি সে? পারে তো সে তক্ষুণি ছুটে যায় খোয়াব ঘরে বুড়ো-টাকে গালাগাল করবে বলে। আমিতো জানি হজরত তার রূপ সম্পর্কে

কতটা সচেতন। আর্শীতে তার মুখ দেখবার নমুনা দেখেই তার মনের কথা বোঝা যায়। সে স্বপ্ন দেখে তরতাজা এক শাহেন শার। সে ক্ষেত্রে একটা বুড়োর দৃষ্টি পড়া মানে তার যৌবনকে বিদ্রূপ করা। রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু রক্তের মধ্যে জেনানার নেশা মানুষকে পশু করে দেয়। তখন তার জ্ঞান-গম্যি কিছু থাকে নাকি। হজরতকে বোঝালুম: অমন বেসামাল হ'তে নেই। খোয়াবঘরে ঢুকলে পরে ছাড়বে নাকি বাদশা! বরং সে নিজেই একটা চিরকুট লিখে পাঠিয়ে দিক্ আলমগীরকে—যাতে সে বুঝতে পারে যে, কত বড় বে-সরমের মত একটা প্রস্তাব করেছে সে।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: হ্যাঁ, সেটাই ভাল। হজরত নিজেই লিখে দিক যে, এ সাদীতে সে গররাজী।

রাগে গড় গড় করতে করতে দোয়াত কলম নিয়ে বসে গেল হজরত। খস্ খস্ করে কি লিখে আমাদের হাতে দিয়ে বলল: নাও, পাঠিয়ে দাও।' তর্ তর্ করে মহলের ভিতরে ঢুকে গিয়ে পালঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে রাগে গড় গড় করতে লাগলো।

চিরকুট খুলে পড়ে দেখলাম—জব্বর লিখেছে হজরত। লিখেছে—আমার আব্বাজানের বয়স তোমার। আমাকে সাদী করবার কথা ভাববার সময় তোমার নিজের কন্যা গহর উন্নিসার কথা মনে পড়ল না? জোর করে কি মন পাওয়া যায় নাকি যে ধরে নিয়ে যাবে? অমন সাদীর আগে আমি জহর খেয়ে মরব না! আমাকে কি বাজারের মেয়েমানুষ পেলে নাকি? তৈমুরের রক্ত রয়েছে আমার মধ্যে। জোর করলে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে মরব। দু-দিন পরে কবরের নিচে যাবে, তার চেয়ে বরং আল্লাতালার কথা ভাব।"

চিরকুট পড়ে মালেকা-ই-জামনৌ বোধহয় ভয় পেলেন। বললেন: আলমগীর যদি হজরতের জবাব পেয়ে ক্ষেপে যায়?

আমি বললুম : আর ক্ষেপবে না। এবার ঠিক উপযুক্ত দাওয়াই পড়েছে। দেখলে চুপ করে যাবে। দিন পাঠিয়ে।

অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত চিরকুট পাঠিয়ে দিলেন মালেকা-ই-জামানী আলমগীরের কাছে।

যা ভেবেছিলুম তাই। জবাব পেয়ে আর সাদীর কথা তুলল না বুড়োটা। কিন্তু লম্পট মানুষের মান অপমান জ্ঞান থাকে না। একরত্তি মেয়ে হজরত, তাকেই কিনা শাস্তি দেবার জন্য হুকুম করলো সে। বলল : শাজাদী নজর বন্দী। মমতাজ মহলের বাইরে এক পা বেরুতে পারবে না।

মালেকা-ই-জামানী শুনে কেঁদে উঠলেন : একি জবরদস্তি!

হজরত শুনে বলল : কেঁদো না আম্মা! ঘরে পড়ে থাকি সেও ভাল। তবু ঐ হারামীটার কোলে গিয়ে বসব নাকি!

আমি কিছু বললুম না। শুধু মনে মনে ভাবলুম—দিল্লীর বাদশার হুকুমের এক্তিয়ার শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে নেমেছে। তৈমুরের বংশধরেরা আর কতকাল দিল্লীর তক্‌তে বসে থাকবে? আর কিছু না হোক একদিন ভূমিকম্পেই লালকেল্লাটা ডুবে যাবে। ডুববেই।

দু'দিন বাদে খবর পেলাম– হজরতকে না পেয়ে ডব্‌গা আর এক ছুঁড়িকে হারেমে উঠিয়েছে আলমগীর। দেখতে নাকি বেশ খবসুরত মেয়েটা। কার সর্বনাশ করে তাকে ঘরে উঠিয়েছে বুড়োটা কে জানে। নয়া বেগমের নাম—জিনৎ আফ্রজ। জাহান্নামে যাক মোগল বাদশারা! তোবা! তোবা!

বেয়াদব বাদশাকে জব্দ রাখতে পারে ওয়াজীর। কিন্তু তার কাছে এখন আর্জি রাখবার উপায় আছে নাকি! কতকাল পরে মুসায়েরে আর তার মেয়েটাকে পেয়েছে সে। হিন্দুস্থানের ওয়াজীর হয়ে সামান্য একটা মুসায়েরকে সে দিনে দশবার সালামত্ জানাচ্ছে। হারেমের মধ্যে কোন্ বাদশা, কোন্ শাজাদীকে বে-ইজ্জত করল সে-সব শুনবার সময় আছে নাকি? তার ইচ্ছা মুসায়েরের বেটীকে সাদী করে সে। কিন্তু গোল

বাঁধাচ্ছে মুসায়েরটাই। ঘুষ দিয়ে, বড় বড় মনসব দিয়ে, কোন কিছুতেই তাকে রাজী করানো যাচ্ছে না। তার এক কথা। আল্লার নামে কসম খেয়ে সফদর জঙ্গকে সে কথা দিয়েছে যে নবাব জাদা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে নিজের বেটীর সাদী দেবে। এখন সে-কথা খেলাপ করা যায়! কিন্তু ইমাদ লেগে আছে জোঁকের মত। সম্মতি আদায় না করে কোন কথা নয়। সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মিটমাটের কোন কথাই বলছে না শিহাবুদ্দিন। অথচ নাও করছে না। আবার মুসায়েরটাকে অযোধ্যাতেও ফিরে যেতে দিচ্ছে না।

সবই হয়েছে ভাল। যেমন বাদশা, তেমন ওয়াজীর। অথচ দেশ তো উচ্ছন্নে যেতে চলেছে। কে মানে আর দিল্লীর বাদশাকে! না মারাঠা, না আফগান, না রাজপুত। এদিকে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নতুন করে ঢু মারতে আরম্ভ করেছে আর এক লুঠেরা—শা নাদির কুলির সিপাহশালার—আহমদ আবদালী। শায়ের মৃত্যুর পর এখন সে নিজেই শা। কিন্তু সে-সব দিকে কারও খেয়াল নেই। পাঞ্জাব তো মোগলদের হাত ছাড়া হয়ে গেল। পাঞ্জাবের শিপাহশালার মুইন খাঁ মারা যাবার পর কি না চলছে সেখানে!

আফগানেরাই সেখানে সর্বেসর্বা। আহমদ আবদালীর সিপাহশালারেরা কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত যা খুশী তাই করছে। আজ একজনকে সুবেদার করছে তো কাল তাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিচ্ছে গদি থেকে।

মোগলদের আর এক কলঙ্ক হচ্ছে মুইন খাঁর বেগম মুঘলানী। তুর্কী রক্তের মধ্যেই বোধহয় পচন ধরেছে। নইলে শুধুমাত্র ক্ষমতা হাতে রাখবার জন্য সে কি না করছে? হেন কোন আমীর নেই বোধহয় লাহোরে যাকে সে নিজের দেহ দেয়নি। আফগানদের সঙ্গে দিল্লাগী করে করে আবদালীটাকে সে হাত করেছে। শুনছি আবদালী শা'টা নাকি তাকে বেটী বলে ডাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব রক্ষা হয়নি। একটা জেনানার হাতে লাহোরের ক্ষমতা তুলে দেননি আবদালী।

তার নায়েব করে দিয়েছেন খাজা আবদুল্লাকে। কিন্তু খাজা একটা লম্পট জেনানাকে সুবেদার বলে সেলাম জানাবে কেন? আবদালী আফগানিস্থানে ফিরে না যেতে যেতেই মুঘলানীকে লাহোর থেকে বের করে দিয়েছে সে। পাঞ্জাবে তাই নিয়ে গোলমাল। খবর এসেছে দিল্লীতে। মুঘলানী আর্জি পাঠিয়েছে দিল্লীর দেওয়ানীতে ওয়াজীরের কাছে। কিন্তু ওয়াজীর এখন ব্যস্ত মুসায়েরের বেটীকে নিয়ে। মুঘলানীর কথা সে থোড়াই চিন্তা করছে। অথচ করা উচিত। মুঘলানীর বেটী উমদা-বানুর সাথে সাদীর করার রয়েছে না ওয়াজীরের? কিন্তু আমরা জানি ও করারের কোন মূল্য নেই। ওয়াজীর সাদী করবে সেই মুসায়েরের বেটীটাকেই।

মমতাজ মহলে বড় বিষণ্ণ হয়ে আমরা ভাবছিলাম। আলমগীরের হুকুম পেয়ে হজরত যেন একটা সাপের বাচ্চার মত ফোঁস ফোঁস করছে। এই ভাবেই বুড়ো-বাদশাটা তার ষোল বছরের তরুণী দেহটাকে পেতে চায় নাকি? সে গুড়ে বালি। ঘরের মধ্যে পচে মরবে সেও ভাল—তবু বুড়োর কোলে নিজেকে ছেড়ে দেবেনা হজরত বানু। হজরতের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দগ্ধ হচ্ছিলাম একই যন্ত্রণাতে। কবে যে এর শেষ হবে খুদাতা'লা জানেন!

রহিমা বাঁদীটার স্বাধীনতা একটু বেশী বেড়েছে। এখন আমাদের সে যেন কম তোয়াক্কা করছে। তার কারণ বোধহয় এই যে, সে বুঝতে পেরেছে যে, আমরা নয়া বাদশার সুনজরে নেই। বিরাগ-ভাজন বেগম আর বাঁদীর মধ্যে তফাৎ কি? সে তাই আমাদের হুকুম করা অপেক্ষা ঘুরে বেড়ানোটাকেই বুদ্ধিমতীর কাজ বলে মনে করছে। ভাবছিলাম, আজ খুব চোখ রাঙিয়ে কথা বলব তাকে। ঠিক সেই সময়েই একগাল হেসে মমতাজ মহলের উঠানে ঢুকলো সে: জানেন বেগম সাহেবা?

ধমকে উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পারলাম না। এ-কথা তো ঠিক যে তার কাছ থেকে অনেক ভাল ভাল খবর পাওয়া যায়। এসব

খবরের জন্য তার একটু ঘুরে বেড়ানো চাই বই কি। গভীর কৌতূহলে তার মুখের দিকে তাকালাম : কি ?

রহিমা বলল : উজীর সাহেব সাদী করতে যাচ্ছেন।

রহিমাকে আরও কাছে ডেকে আনলাম : সাদী। কাকে ? মুসায়েরর বেটীটাকে ?

—আজ্ঞে না বেগম সাহেবা।

—তবে ?

—সাদী করতে যাচ্ছেন পাঞ্জাবে। মুঘলানী বেগমের বেটী উমদা-বান্নুকে।

—সত্যি !

—জী বেগম সাহেবা। উজীর সাহেবের মোগলিয়া ফৌজেরাও প্রস্তুত। দু-এক দিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বেন।

নিজেকেই যেন বোকা মনে হল। তাহলে কি এতদিন গুজব শুনেই মুসায়েরের বেটী সম্পর্কে যা-ইচ্ছে ভেবেছি নাকি ? তাহলে কি সব ভুল ? নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে। জানা দরকার। কিন্তু জানা যাবে কার কাছে ? নাজির রজ আফজুন ছাড়া এসব জানাবার আর কেউ নেই।

রহিমাকে বললাম : হ্যাঁরে রহিমা, নাজির সাহেবকে একবার খবর দিতে পারবি ?

রহিমা বলল : হুকুম করেন তো এখনি আসতে বলি বেগমসাহেবা। বললুম : না, এখন নয়। বলবি সাঁঝের বেলায় মালেকা-ই-জামানী তাঁকে মমতাজ মহলে একবার তলব করেছেন।

রহিমা বলল : জো হুকুম বেগম সাহেবা।

খবর পেয়ে নাজির সাহেব এলেন সন্ধ্যা এক প্রহরে। মালেকা-ই-জামানীকে সালামত্ জানিয়ে বললেন : আমায় তলব করেছিলেন বেগম সাহেবা ?

আমি বললুম : হ্যাঁ, নাজির সাহেব। আমি তলব করেছিলুম।

—হুকুম করুন বেগম সাহেবা।

বললুম : ওয়াজীর শুনলাম পাঞ্জাব গেছে? ব্যাপার কি?

একটু হাসলেন নাজির সাহেব। বললেন : খোঁড়া নবাব আহমদ বঙ্গাসের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ফৌজ নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে গেলেন তো দেখতে পেলুম। ওয়াজীরের মনে কি আছে ঠিক জানিনে।

—তবু কিছু আঁচ করতে পারেন নি?

—শুনছি তো আফগানদের লাহোর থেকে হটিয়ে দেবার জন্তে গেছেন।

—না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

—আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে বেগম সাহেবা?

—শুনছি মুঘলানী বেগমের বেটী উমদা বানুকে সাদী করবার জন্ত গেছেন?

—খুদাতালা জানেন।

—মুসায়েরের বেটী গন্না বেগমের আশা তবে ছেড়ে দিল নাকি ওয়াজীর?

—কিন্তু আমরা তো শুনছি তাকেই খুব পেয়ার করেন ওয়াজীর সাহেব। আলিকুলি সাহেবকে সেজন্য নজর বন্দী করে রেখেছেন। তবে খোঁড়া মানুষের হদিশ পাওয়া ভার। কি পরামর্শ দিয়েছেন তাকে নবাব বঙ্গাস সাহেব, খুদা মালুম।

আমি বেশ কিছুক্ষণ নাজির রজ আফজুনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলুম। নয়া জমানায় নাজির সাহেবকে একটু কেমন কেমন দেখছি যেন। নয়া বাদশা আর তার ওয়াজীর নাজির সাহেবের মনসব বাড়িয়ে দিয়েছেন। হয় তো বা সাট আছে এদের সঙ্গে। সব জেনেশুনেও ভেঙে বলতে চান না। কথাটা জিজ্ঞাসা করে ভুল করলুম কিনা কে জানে। তাই বললুম : একটা কৌতূহল হয়েছিল বলে আপনার কাছে

জানতে চাইলুম নাজির সাহেব। অন্য কিছু ভাববেন না যেন। নয়া জমানাতে আমরা সুখেই আছি।

আমার মনের অবস্থাটা নাজির সাহেব বুঝতে পেরেছেন। নয়া জমানার উপর যে আমাদের বিন্দুমাত্র খুশ হবার কোন কারণ নেই তিনি এটাও জানেন। তাই বললেন: বেগম সাহেবেরা এ বান্দাকে ভুল বুঝবেন না। আলমগীর বাদশা গাজির নিমক খেয়েছি আমি। আপনাদের অশুভ কামনা করি না কোন দিন। বেগম সাহেবেরা আমায় বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সময় মত সবই জানতে পারবেন।' মালেকা-ই-জামানীকে কুর্ণিশ জানিয়ে নাজির সাহেব চলে গেলেন।

রজ আফজুন চলে গেলে মালেকা-ই-জামানী তাকালেন আমার দিকে: কি ব্যাপার সাহিবা মহল?

আমি বললুম: না, কিছু না। এমনিই কৌতূহল মাত্র।

মালেকা-ই-জামানী বললেন: কিন্তু যখন তখন রজ আফজুনকে ডেকে এনে এমন কৌতূহল আর প্রকাশ করো না। মনে রেখ, নয়া জমানায় আমাদের আর কোন স্থান নেই। আহমদ তওফাওয়ালীর বেটী হলেও আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। আলমগীরের হারেমে আমাদের কোন স্থান নেই।

বললুম: হ্যাঁ বেগম সাহেবা, এখন সেটা বুঝলুম।

ওয়াজীর দিল্লীতে নেই। এক একদিন এক এক খবর ভেসে আসছে হারেমের মধ্যে। শুনছি ইরাণীদের মধ্যে খুব তোড়জোড় চলছে আগের মত। দিল্লীর ইরাণীরা উঠে পড়ে লেগেছে এই ফাঁকে একজন সিয়া ওয়াজীরকে বাদশার উপর চাপিয়ে দেবার জন্য। ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে সেই মুসায়ের আর ফরাক্কাবাদের খোঁড়া নবাব আহমদ বঙ্গাস। নবাব-জাদা সুজাউদ্দৌলাকে এই ফাঁকে দিল্লীতে এনে ওয়াজীরের গদিতে বসাতে চায় তারা। এতদিনে বুঝলাম মুসায়েরের বেটীকে কেন সাদী করতে পারেনি ওয়াজীর। তাহলে পাঞ্জাবে ওয়াজীর সাদী করবার জন্যই

গেছে? করুক। তবু যদি সাদী করে মনটা ঘুরে শিহাবুদ্দিনের। গল্পা গল্পা বলে ব্যস্ত হয়ে মাথাটা গেছে তার। যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে। এবার যদি পাগলামোটা থামে। কিন্তু যে ষড়যন্ত্র চলছে দিল্লীতে—ফিরে এসে ঝরোকার নিচে ওয়াজীরের গদিতে বসতে পেলে হয় সে। বুড়ো বাদশাটাও যে খুব খুশমেজাজ ওয়াজীরের উপর তা নয়। উল্লুকটা তো ওয়াজীরের হাতের সং-এর মত। শাজাদা আলি গহর কেল্লা ছেড়ে নিজের বালবাচ্চা নিয়ে পালিয়েছে। শুনছি সে গিয়ে উঠেছে অযোধ্যাতে সুজাউদ্দৌল্যার কাছে। আছে এলাহাবাদে। ওয়াজীরকে হটাবার চেষ্টাটা অসম্ভব কিছু নয়। উজির হয়ে দিল্লী এসে শিহাবের পেয়ারের মেয়েকে হয় তো সে-ই সাদী করবে। নসিবের খেয়াল বোঝে কে। কখন কারো উপর খুশী, কারো উপর অখুশী হয় সে।

মমতাজ মহলে বসে বসে এসব কথাই ভাবছিলাম—আর অপেক্ষা করছিলাম রহিমা বাঁদীর জন্য। তাকে পাঠিয়েছি কেল্লার বাইরে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার দরগাতে, আমাদের হয়ে দরবেশের কাছে দুয়া মাগতে। দরগার কূয়োর পানিতে গোছল করে দরবেশের কাছে মানত করলে তিনি নাকি কাউকে নিরাশ করেন না। হাজার হাজার ফকির দরবেশ রোজ এসে ভিড় জমান দরগাতে। আমাদের বদ-নসিব কি ফকিরের দুয়াতেও এতটুকু খুলবেনা! চোখের উপর হজরতটা শুকিয়ে যাচ্ছে মমতাজ মহলে। দুনিয়ার মালিক বিচার করবেন না? একটা নির্দোষ মেয়েকে বুড়ো-বাদশাটা খামকা এমন করে আটকে রেখেছে। জমানা যদি পাল্টায় নয়া ওয়াজীর সুজাউদ্দৌলার কাছে বিচার চাইব।

ভাবছিলাম। এমন সময় যেন একটা কৌতূহলে জ্বলতে জ্বলতে রহিমা বাঁদী এসে ঢুকলো মহলের মধ্যে। দেখেই বুঝতে পারলুম খবর আছে। ওর কাছ থেকে দরগার সিন্নি নিতে নিতে বললুম: কি রে, খবর আছে নাকি কিছু?

রহিমা বলল: বেগম সাহেবা, মুসায়ের আলিকুলি মারা গেছেন।

—এ্যাঁ!

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা। মুসায়েরের বেগমটা তার বেটী গন্না-বান্নুকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

—কেন?

—কি জানি বেগম সাহেবা। দিল্লীতে জোর গুজব—উজীর সাহেব লাহোর থেকে রেগেমেগে দিল্লী আসছেন। ইরাণীদের তিনি দেখে নেবেন। ইরাণীরা নাকি নবাবজাদা-সুজাউদ্দৌলাকে ওয়াজীর করবার জন্য চেষ্টা করছিল।

বললুম: শিহাব ফিরে আসছে শুনে ভয় পেয়ে বুক ধড়ফড় করে মারা গেল নাকি আলিকুলি?

—কি জানি বেগম সাহেবা। দিল্লীর ইরাণীরা শুনছি অনেকেই ভয় পেয়েছে।

শিহাবের উপর খুব একটা রাগ নেই আমার। সে তো আমাদের কখনো বে-ইজ্জত করে নি! সিকান্দ্রাবাদে মারাঠাদের হাতে কয়েদ হলে সে বরং আমাদের যথেষ্ট সম্মানই দেখিয়েছিল। আমাদের দুঃখ—বুড়ো বাদশাটা হজরতের উপর যে এত অত্যাচার করছে সে তা দেখেও দেখলো না। রহিমাকে বললুম: হ্যারে রহিমা, তা উজীর কি একাই ফিরে আসছে, না মুঘলানী বেগমের বেটী উমদাকে সাদী করে নিয়ে আসছে?

রহিমা বলল: শুনছি পাঞ্জাবের মালেকান মুঘলানী বেগম আর তার বেটীকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন উজীর সাহেব।

আর বলতে হলনা। বুঝতে পারলুম সাদী করতেই লাহোর গিয়েছিল ওয়াজীর। আমি তখনই জানতুম, নসিবের খেয়াল বোঝা ভার। চাই-লেই কি আর কাউকে পাওয়া যায়! না যায় সেটাই ভাল। এতবড় একটা আমীরের ছেলে হয়ে শিহাব সাদী করবে সামান্য এক মুসায়েরের বেটীকে! এতে শেষ পর্যন্ত ফল ভাল হয় না। ছোটলোকের বেটী ঘরে আনলে কি ফল হয়, নিজের চোখে তো সেটা হারেমের মধ্যে

দেখলুম! উধম বাঈকে হারেমে এনেই বাদশা মহম্মদ শা জাহান্নামে গেলেন।

ওয়াজীর দিল্লীতে ফিরলেই এখন সব বোঝা যাবে। এর মধ্যে যদি বুড়ো বাদশা আর তার বেটা শাজাদা আলিগহুর যুক্ত থাকে, তবে নিশ্চয়ই বুড়ো আলমগীরের গর্দান যাবে।

বাদশা বলে ছেড়ে দেবার পাত্র শিহাব নয়। চোখের উপর তো দেখলাম আহমদ আর কিব্‌লা-ই-আলমের কি হাল করে ছাড়লো সে। দরবেশ আউলিয়া যদি এ বাঁদীদের আর্জি শুনেন, তবে নিশ্চয়ই চুলচেরা বিচার হবে। বুড়ো আলমগীরকে সাজা পেতেই হবে।

নতুন করে কৌতূহল নিয়ে বসে রইলাম শিহাবুদ্দিন কবে দিল্লী ফিরে আসে সেইজন্যে।

কিন্তু কয়দিন কোন খবরই নেই দিল্লীতে। নাজির রজ আফজুনকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আর ভরসা হচ্ছে না। রহিমা বাঁদীকে দিয়েও যে খবর জানব সে উপায় নেই। কেন যেন হারেমের দরজায় কড়া পাহারা বসে গেছে। খোজা হোক, বাঁদী হোক, হারেমের ভেতরে ঢুকতে, বাইরে যেতে, বেশ কড়াকড়ি। কে জানে ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে শিহাবই এ-ব্যবস্থা করেছে কি না। আসমানের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবনা করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। সে দিকে তাকিয়েই ভাবছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম আসমান ভরা আগুনের ফুলকিহার দেখে। একটা নয়, দুটো নয়, হাজার হাজার হাউই উঠে ফুল্‌কিহার ফোটাচ্ছে। দূরে কোথায় বাজি ফুটছে অনবরত। সানাই বাজছে। যেন একটা হৈ হুল্লোড়। উজীর সফদর জঙ্গের বেটা নবাবজাদা সুজাউ-দ্দৌলার সাদীর সময় এমন লক্ষ্য করেছিলাম—হিজরী ১১২১ সালে। তারপর বহুদিন এসব লক্ষ্য করা যায় নি। কি হচ্ছে, কে জানে। কৌতূহলের বাইরে আমাদের এখন আর কোন উপায় নেই। যে-করেই হোক হারেমের দুয়ারে কড়াকড়ি। হয়তো বা বুড়ো বাদশাটা

আমাদের জন্যই এ-ব্যবস্থা করেছে। সে নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে যে, নানা কাজে রহিমা বাঁদীকে আমরা হারেমের বাইরে পাঠাই।

আমরা ক'জন মমতাজ মহলের আঙিনায় বসে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মাঝে মাঝে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলাম —কিন্তু কোন হদিস পেলাম না।

অনেকদিন পরে ঠিক সেই সময় নাজির রজ আফজুন মমতাজ মহলে ঢুকলেন। অভ্যাসবশত তৎক্ষণাৎ নাজির সাহেবকে কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম আমি। কিন্তু মালেকা-ই-জামানী চোখের ইশারাতে কিছু বলতে বারণ করলেন আমাকে।

নাজিরের মুখ হাসিহাসি ছিল। আমাদের দু'জনকে সালামত্ জানিয়ে তিনি বসলেন। বললেন ঃ কি করছেন বেগম সাহেবারা ?

বিষণ্ণ কণ্ঠে মালেকা-ই-জামানী বললেন ঃ কি আর করব নাজির সাহেব, নসিব আমাদের বদ্‌খুশ। বাদশার হুকুমে কয়েদ আছি। আসমানের দিকে তাকিয়ে সময় গুনছি।

রজ আফজুন বললেন ঃ খুদাতালা নিশ্চয়ই সুবিচার করবেন। উজীর সাহেব দেহলীতে ফিরে এয়েছেন।

বললুম ঃ কবে এলেন ?

—জুমা-বারে দিল্লী এসে পৌঁচেছেন। আজ উজীর সাহেবের সাদী।

—সাদী !

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা। আসমানে দেখছেন না কেমন হাউই উড়ছে ? সানাই শুনছেন না ?

—কাকে সাদী করেছেন ? মুঘলানী বেগমের বেটী উম্‌দাকে ?

—না বেগম সাহেবা। আলিকুলি মুসায়েরের বেটী গন্নাবান্নুকে সাদী করেছেন উজীর সাহেব।

—গন্না বান্নু।

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা। শোনেন নি, আলিকুলির বেটীকে খুব পেয়ার করতেন উজীর সাহেব ?

আশ্চর্য হয়ে রজ আফজুনের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলুম। বললুম : তবে যে শুনছি গন্নাকে নিয়ে তার আম্মা দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে গেছে ?

নাজির সাহেব বললেন : ঠিকই শুনেছিলেন বেগম সাহেবা। তবে পালিয়ে অনেক দূর যেতে পারেন নি। নসিব যদি থাকে দিল্লীতে লক্ষ্মৌ সে যাবে কি করে, বলুন ?

নাজির সাহেবের কাছে এতদিনে ওয়াজীরের পাঞ্জাব অভিযান থেকে দিল্লীর ষড়যন্ত্র—সব কথা শুনতে পেলুম। সাদী করতে যায়নি ওয়াজীর লাহোরে। গিয়েছিল সে মুঘলানী বেগম আর তার বেটী উমদাকে কয়েদ করে আনতে। আর সেই ফাঁকে লাহোরের উপর নিজের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে। মুঘলানীকে হাড়ে হাড়ে চেনে শিহাবুদ্দিন। তাকে লাহোরে ছেড়ে রেখে দিল্লীতে যদি মুসায়েরের বেটীকে সাদী করতো ওয়াজীর, তাহলে প্রলয় কাণ্ড করতো মুঘলানী। সেইজন্যে খোঁড়া নবাব আহমদ বঙ্গাসের পরামর্শে সাদীর আগে তাকে দিল্লী ধরে নিয়ে এসেছে ওয়াজীর ?

অবশ্য ইতিমধ্যে দিল্লীর ইরাণীরা একটা ষড়যন্ত্রও করেছিল নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলাকে উজীর করবার জন্য। নবাব বঙ্গাস সাহেবেরও কিছুটা হাত ছিল এর মধ্যে। খবর পেয়ে লাহোর থেকে ওয়াজীর ছুটে আসে ফরাক্কাবাদে। নবাব সাহেবকে এলাহাবাদের সুবেদারী দেওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে সুজাউদ্দৌলার দল ছেড়ে আবার শিহাবুদ্দিনের দলে ভিড়ে পড়েছেন তিনি। ওদিকে ভয় পেয়ে মুসায়ের আলিকুলির বেগমটা আশ্রয়ের জন্য পালিয়েছিল বঙ্গাস সাহেবের কাছেই। কিন্তু সে কি তখন জানতো যে বঙ্গাস সাহেব ততক্ষণে যোগ দিয়েছেন ওয়াজীরের দলে ! মুসায়েরের বেগমকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বঙ্গাস সাহেবই এ-সাদীর ব্যবস্থা করেছেন শিহাবের সঙ্গে। সত্যিই তো ! নসিবে যদি দিল্লী থাকে তবে লক্ষ্মৌ কি কেউ যেতে পারে ? মুসায়েরের বেটীর বরাত ভাল—দিল্লীর ওয়াজীরের বেগম হবে সে। আল্লা যেন খুশমেজাজ হন তার উপর।

আমাদের হজরতের মত একটা তর্‌তাজা যৌবন যেন নষ্ট না হয়ে যায়। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললুম।

নাজির সাহেব বললেন : বেগম সাহেবা, আমি এখন উঠি। সাদীতে যেতে হবে আমাকেও। ওয়াজীর যদি এবার খুশমেজাজ থাকেন তো মমতাজ মহলের কথা বলব তাকে।

বললুম : আল্লা মেহেরবান আপনার ভাল করুন নাজির সাহেব। হজরতের শাস্তি দেখে কল্‌জে ফেটে যায়।

নাজির সাহেব বললেন : আল্লার উপর বিশ্বাস রাখুন। শাজাদীর নিশ্চয়ই এ অবস্থা থাকবে না। সেলাম বেগম সাহেবা।

রূজ আফজুন চলে গেলেন।

জানি না কেন তিনি এসেছিলেন। কেনই বা এতদিন পরে উজীরের সাদীর খবর দেবার জন্য মালেকা-ই-জামানীকে সালামত্‌ জানালেন। যা-হোক খবরটা তবু পাওয়া গেল।

হিজরী ১১৩৪ সাল। রমজান মাস। সাদীর উৎসব কেটে যেতে না যেতেই দেখি দিল্লীতে কেমন একটা সন্ত্রাসের ছায়া নেমেছে। সন্ধ্যা-বেলা শোকাতুর মুখে রহিমা বাঁদী এসে বলল : বেগম সাহেবা শুনেছেন?

চমকে ফিরে তাকালাম রহিমার দিকে : কি রে?

—দিল্লীর আমীরেরা সব শহর ছেড়ে পালাচ্ছেন!

—সে কি! কেন রে?

—ইরাণের সেই শা নাকি আবার দিল্লী আসছেন।

ধমকে উঠলুম রহিমাকে : কি যা তা বলছিস? শা নাদির কুলিতো কবে মারা গেছেন!

রহিমা বলল : কি জানি বেগম সাহেবা, যমুনার ওপারে নাকি শায়ের ফৌজেরা এসে শিবির ফেলেছে। দু-এক দিনের মধ্যেই শহরে ঢুকবে তারা।

—কি বলছিস!

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা। কেল্লার ধারে এসে দাঁড়িয়ে দেখুন—দরিয়ার ওপারে শায়ের ছাউনি দেখা যাবে।

—এ্যাঁ!

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা।

আমার যেন আর বিস্ময়ের অন্ত থাকলো না। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম মালেকা-ই-জামানীর কাছে: বেগম সাহেবা শুনেছেন?

নিজের স্বভাব-মত গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন মালেকা-ই-জামানী। আমার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন তিনি: কি হল সাহিবা মহল?

—ইরাণের শা নাকি আবার দিল্লী আক্রমণ করেছেন?

—ইরাণের শা! কে বললে?

—রহিমা বলছে।

কিছু বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মালেকা-ই-জামানী।

আমি বললুম: বেগম সাহেবা, আমি নাজির সাহেবাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ব্যাপার-টা জানা দরকার। শুনছি দিল্লীর লোকেরা নাকি শহর ছেড়ে সব পালাচ্ছে। একটা কিছু না হলে লোকেরা পালাবে কেন? ডাকৃব নাজির সাহেবাকে?

হতবাক মালেকা-ই-জামানী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন: ডাক।

রহিমাকে দিয়ে তৎক্ষণাৎ নাজির রজ আফজুনকে খোঁজ করে পাঠালুম।

রজ আফজুন এলেন রাত এক প্রহরে। রীতিমত চিন্তিত তিনি। তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলুম: কি হয়েছে নাজির সাহেব? লোকেরা নাকি দিল্লী ছেড়ে পালাচ্ছে?

ক্লান্ত কণ্ঠে রজ আফজুন বললেন: জী বেগম সাহেবা।

—কেন?

সমস্ত ঘটনা ভেঙে বললেন রজ আফজুন।

বদ্‌নসিব! বদ্‌নসিব মোগলদের। সমস্ত ইজ্জত তাদের ধূলোয়

লুটিয়ে পড়বে। পাপের প্রায়শ্চিত্ব করতে হবেনা? সবই শুনলুম। জানিনা নসিবে আবার কি নতুন লাঞ্ছনা লেখা আছে।

আবদালী শা শীতের মরশুমেই বেরিয়ে পড়েছিলেন কাবুল ছেড়ে। ২১শে রজব তার এক দল ফৌজ এসে ঢোকে লাহোরে। ওয়াজীর যে খাজা-আবদুল্লাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—সেই খাজাকে আবার লাহোরের সিপাহশালার করে বসায়। আবদালী শার পরোয়ানা নিয়ে ইতিমধ্যেই ১৮ই শাবান তার দূত এসে ঘুরে গেছে দিল্লী থেকে। সাদী নিয়ে মস্‌গুল ওয়াজীর—পাত্তাই দেয়নি আবদালীর দূতকে। ওদিকে আবদালী শা বসেছিলেন পেশোয়ারে। ওয়াজীরের ব্যাপার দেখে ক্ষেপে গিয়ে ৪ঠা রমজান হিন্দের দরিয়া পার হয়ে এসে নামেন অট্টকে। ওয়াজীরের তবু যদি হুঁশ হয়। মুসায়েরের বেটীকে পেয়ে সব ভুলেছে। মহলে গিয়ে দোর দিয়ে বসে তখনো মজা করছে সে।

আবদালী শা যখন লাহোর দখল করেছিল—তখনো হুঁশ নেই ওয়াজীরের। ওদিকে কোন্ ফাঁকে সারহিন্দ পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে আফগানেরা। খেয়াল হয়েছে দিল্লীতে গুজব শুনে, মুঘলানী বেগমের খোঁজ করে। যে বেটী পাঞ্জাবকে নাচিয়ে ছেড়েছে—সে যে সহজ মেয়েছেলে নয় এটা ওয়াজীরের বোঝা উচিত ছিল না? মুসায়েরের বেটীকে পেয়ে মুঘলানী আর উম্‌দার কথা ভুলেই গিয়েছিল শিহাব। সে বেটি ডামা-ডোলের ফাঁকে সাদীর রাতে পালিয়েছিল দিল্লী থেকে। এখন সে লাহোরে আবদালীর শিবিরে। আবদালী তাকে বেটী বলে ডাকে নি? আর্জি পড়েছে শায়ের দরবারে: এর বিচার কর। মুঘলানী ধরেছে শাকে—দিল্লীর ওয়াজীর শুধু কথার খেলাপ করেনি, বে-ইজ্জত করেছে তাকে। তার যথা-সর্বস্ব লুটে-পুটে নিয়েছে।

দিল্লীতে এখন জোর গুজব—আবদালী শা নাকি বেয়াদব ওয়াজীর শিহাবকে শিক্ষা দেবার জন্য লাহোর থেকে দিল্লীর দিকে রওনা হয়েছেন। শুনে তক্ চোখের নেশা ছুটে গেছে ওয়াজীরের। এখন সে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় কার কাছে সাহায্য পাওয়া যায় সেই জন্যে।

আবদালী শা আসছে দেহলীতে। ওদিকে ওয়াজীরের নিজের হাতে একটিও ফৌজ নেই। সেই যে রাস্তায় ধরে মাইনের জন্যে অপমান করেছিল তারপর থেকেই 'সিনদাগ রিসালা' ভেঙে দিয়েছে শিহাব। আছে শুধু বাহাদুর খাঁ বালুচ। কিন্তু কয়জন লোক আছে তার কাছে যে, আফগান লুঠেরাদের ঠেকাবে। শ-দুয়ের বেশী নয়। হাজার হাজার ফৌজ নিয়ে নাদির কুলির একটিও থাপ্পর সইতে পারল না মোগল বাহিনী কারনালে তো কোথায় কয়েক শ' বালুচ ফৌজ!

আগেকার সেই বুড়ো বকৃশী সলাবত খাঁ, তাকে ডেকেছিল ওয়াজীর। কিন্তু কেল্লায় এসে বাদশাকে সেলাম ঠুকবার আগেই কবরে গেছে। ডাক পড়েছে রোহিলা নাজিব খাঁর। নাজিব ওয়াজীরকে সাহায্য করবে তো দূরস্থান—২২শে শাবান ওয়াজীরের বহর লুঠ করে গেছে সবার চোখের সামনে দিয়ে। লোকে বলছে সে নাকি এখন আবদালীর দলে।

সুরজমল জাঠকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু মারাঠারা ওয়াজীরের দলে থাকলে সে নেই, এ-কথা সে জানিয়ে দিয়েছে। ওয়াজীর মারাঠা দোস্ত-দের ছাড়তে রাজী নয়। ফলে নিজের দেশ মথুরাতে চলে গেছে সুরজমল। শেষ তক নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার তলব পড়েছে। কিন্তু ফল হয় নি কোন। ওদিকে দোস্ত খুঁজতে খুঁজতেই আবদালী শা এসে গেছেন আদিনা নগর পর্যন্ত। দিল্লী আর কতদূর? ঘোড়ায় চেপে একবার লাগাম ছেড়ে দিলেই দিল্লী। ভয়ে লোকেরা পালাতে আরম্ভ করে দিয়েছে যমুনা অতিক্রম করে। হায়রে বুর্বকের দল!

নাদির কুলির সময়ও তো পালাতে আরম্ভ করেছিল সবাই। কিন্তু পালাতে পেরেছিল কি কেউ? লুঠেরার হাত থেকে আসান নেই তার। বেকুবের দল পথে বেরিয়ে জাঠ আর মারাঠা লুঠেরাদের হাতে সব দিয়ে আবার দিল্লীতে ফিরে আসবে। ওদিকে আবদালীর আফগান ফৌজেরা ঘরে ঘরে হানা দিয়ে কিছু যদি না পায়, মেরে কেটে কিছু রাখবে না।

মাথার উপর খাড়া ঝুলে থাকলে যেমন অস্বস্তি, দিল্লীর লোকের অবস্থা ঠিক তেমনি। সারা শহর থম্ থম্ করছে কখন খাড়াটা মাথার

উপর খসে পড়ে। নাজির সাহেবকে বললাম : আপনাদের শাহেনশার খবর কি ?

নাজির বললেন : শাহেন-শাকে তো জানেনই বেগম সাহেবা। তিনি এখন দিনরাত কুরাণ পড়ছেন।

ভয়ানক রাগ হল। বললাম : কেন, নতুন করে সাদীর কথা ভাবছেন না ?

নাজির চুপ করে থাকলেন। কোন কথা বললেন না।

মালেকা-ই-জামানী আমাকে চোখের ইশারাতে এসব কথা বলতে বারণ করে নিজেই এগিয়ে এলেন। নাজির সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন : ইনতিজাম করছে কি ? শিহাব তাকে খবর দিতে পারেনা ?

নাজির বললেন : খবর দেওয়া হয়েছিল বেগম সাহেবা। কিন্তু তিনি আবদালীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ওয়াজিরী পাবার জন্য।

শুনে কি আর বলব ! শুধু বললুম : তোবা ! তোবা !

দিল্লীর লোকেরা খবর শুনে পালাচ্ছিল। কিন্তু আগেই জানতুম পালাতে তারা পারবে না। পথে মারাঠা আর জাঠেরা লুঠ করে ফিরিয়ে দেবে তাদের। ঠিক তাই হল।

নিজের মুখ রাখবার জন্য ওয়াজীর তিন হাজার ঘোড়-সওয়ার পাঠিয়েছিলেন যমুনার পুব পারে। যে-যাচ্ছে তাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে তারা। কিন্তু ফিরেও রেহাই আছে নাকি—পথে লুঠ করছে মারাঠা আর জাঠেরা। অবশেষে একে একে সব দিল্লীতে ফিরে আসছে খালি হাতে। দিল্লীতে ফিরে অভিসম্পাত করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু দুর্বলের অভিসম্পাতের মূল্য আর এ-যুগে কি আছে ? যা হচ্ছে—তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আবদালী দিল্লীতে ঢুকবেনই। তখন এ হতভাগ্যগুলো তাকে কিছু না দিতে পেরে আরো মরবে। তবে কিছু কিছু হিন্দুর—নসিব ভাল যে জাঠদের নজরানা দিয়ে মথুরায় ঢুকতে পেরেছে। কিন্তু

ঐ ছোট শহরে কত আর লোক ধরবে? শুনছি লোকে লোকে ঠাঁসাঠাঁসি।

বুড়ো-বাদশাটার জেনানার নেশা বোধহয় ছুটে গেছে। কয়দিন ধরে দেখছি দু-বেলাই দেওয়ানী আমে যাচ্ছে। দেখলে হাসি পায়। দেওয়ানী আমের মর্যাদা এখন আর আছে নাকি? সরাব, সিরাজী, আর জেনানা আদমিতেই শেষ করেছে সব।

খবর পেলাম রাত্রিবেলা। আবদালী শাকে বাধা দেবার কোন ব্যবস্থাই করতে পারেনি আম-দরবার। বাদশাহী বাহিনীতে নাকি তিন হাজারের বেশী ফৌজ নেই। রসদ নেবার জন্য আছে মাত্র ছয়টা ভাঙা গরুর গাড়ি। শেষ পর্যন্ত এত নিচে নেমে এসেছে মোগল বাদশাহী! হায় রে আল্লা!

ফৌজ না পাঠিয়ে মুঘলানী বেগমের কাছে খুব কাতর অনুনয় বিনয় করে নাকি একটা চিরকুট পাঠিয়েছে ওয়াজীর, যাতে আবদালী শা দিল্লীর দেওয়ানীর উপর গোসা না করেন। দিল্লী না এলে আবদালী শা'কে সাধ্যমত নজরানা পাঠাবে আলমগীর বাদশা। মূর্খ আর কাকে বলে! মুঘলানী বেগমকে দিল্লী এনে অপমান করল ওয়াজীর। উম্‌দাকে ফেলে সাদী করল মুসায়েরের বেটীকে। সেই মুঘলানী করবে—ওয়াজীরের জন্য উমেদারী! একে সাপের বাচ্চা, তার উপর লেজে পা দিয়েছে ওয়াজীর, মুঘলানী ছাড়ছে আর কি! এর একটা প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে।

আশা-ভরসা আর কিছুই নেই। দরওয়াজায় দুষ্‌মন দাঁড়িয়ে। এমন সময় কিনা মোগলাই ফৌজেরা হল্লা করছে ওয়াজীরের মহলের সামনে তাদের মাইনে মিটিয়ে নেবার জন্য। এত যে লোকের সর্বনাশ করে টাকা উঠালো শিহাবুদ্দিন—সে টাকাগুলো সে করলো কি? একটা মুসায়েরের বেটীর জন্যই সব ব্যয় করে বসে আছে নাকি! হতচ্ছাড়া উজ্‌বুকের দল।

মুঘলানী বেগমের কোন জবাব আসে নি। আসবে কি,—সে নিশ্চয়ই

আবদালী শাকে নিয়ে দিল্লীতে ঢুকবে, বলে রাখলুম। ছাড়বার মত মেয়ে সে নয়। তবে আবদালী শা নিজে ওয়াজীরের দূত—আগা রাজাকে বলে দিয়েছেন যে, দিল্লীর দেওয়ানী যদি দুইকোটী তঙ্কা দেয়, আর শায়ের সঙ্গে সাদীর জন্য শাজাদী গহর উন্নিসাকে, শা তবে ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারেন। খুদাতালার বিচার আছে। এখন বুড়ো বাদশাটা বুঝুক যে ডব্‌গা-ছুঁড়িকে কবরের বুড়ো সাদী করতে চাইলে কেমন লাগে।

খবর শুনেই রাজা যুগলকিশোর একদল হিন্দু নিয়ে রাতারাতি দিল্লী শহর ছেড়ে পালিয়েছেন। পাঁচ শো গাড়ি-ভর্তি নাকি শুধু জিনিস-পত্র গেছে তাদের। ভাল বাদশার শাসনে বাস করছে হিন্দুস্থানের মানুষেরা!

নির্লজ্জ ওয়াজীর আর তার বাদশা। নইলে আবার সেধে তারা আগা-রাজাকে আবদালী শার কাছে পাঠায়? না আছে লড়াই করবার হিম্মত, না টাকা দেবার। আবেদন করা ছাড়া উপায় কি? চোখের পানি ফেলে নাকি চিরকুট লিখে পাঠিয়েছে বাদশা—এবারকার মত যেন তাকে ক্ষমা করে দেন আবদালী শা।

আবদালী শা ক্ষমা করেন নি। বোধহয় দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে আফগানেরা। দলে দলে লোক দেখছি শহরে ঢুকে আশ্রয় নিচ্ছে। কেউ যাচ্ছে পুরানো কেল্লাতে, কেউ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগাতে। ওদিকে মারাঠারা দরিয়ার ধারে ঘরবাড়ি সব লুঠ করে নিচ্ছে। বাঘের আগে ফেউয়ের মত যে-কোন লুঠেরার আগে মারাঠা-দের দেখবেই।

গুজবের মত খবর ছড়াচ্ছে দিল্লীতে। কোনটা যে সত্য আর কোনটা মিথ্যা, বোঝা ভার। শুনছি আবদালীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে নাজিব খাঁ রোহিলা। সে বেটা এমনিতেই পাজির পা ঝাড়া। লুঠেরার সঙ্গে মিশলে তো কথাই নেই। কেল্লার ভিতর ওয়াজীরকে সাহায্য করবার জন্য যে-সব ফৌজ আসছিল—তারা নাকি 'মসজিদ পারি' আর লাহোর

দরওয়াজার বাইরে বসে ভয়ে কাঁপছে। বলছে: 'আবদালীর সঙ্গে আছে পেল্লাই বাহিনী, মোগলেরা পারবে না।' তারা সব কেটে পড়বার ব্যবস্থা করছে। সে-কথা শুনেতো হারেমের মধ্যে কান্নার রব পড়ে গেছে। আমার নিজেরও কেমন ভয় করতে লাগলো যেন। মালেকা-ই-জামানীকে বললুম: কি হবে বেগম সাহেবা?

নিস্পৃহ একটা ভঙ্গী করে মালেকা-ই-জামানী বললেন: কি আর হবে, নাদিরকুলি হারেমের মণিমুক্তাগুলো সব খুলে নিয়ে গেছেন, আবদালী লালকেল্লার সব ইঁটগুলো খুলে নিয়ে যাবেন।

আমি বললুম: আবার যদি কারনালের মত আমাদের বে-ইজ্জত করেন?

তেমনি নিস্পৃহ ভঙ্গীতে মালেকা-ই-জামানী বললেন: করবেন। ইজ্জত আমাদের কোথায় আছে যে বে-ইজ্জত করবেন?

৮ই জেল্কদ শুনলুম—রাজঘাটের বালুতটে ওয়াজীর কয়েকটা কামান বসিয়েছে। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও শুনে হাসি পাচ্ছে যে—কামান বসানো হয়েছে বটে তবে কামান দাগবার লোক পাওয়া যায়নি। গোলন্দাজ ফৌজেরা মাইনে না পেলে কেউ কোন কাজ করতে নারাজ। দরিয়ার ধারে ঝরোকাতে একা দাঁড়িয়ে আছেন ওয়াজীর। ওপারে আবদালীর ফৌজেরা মাঝেমাঝেই ঘুর্ ঘুর্ করে লালকেল্লা রক্ষার ব্যবস্থা দেখে যাচ্ছে।

ওয়াজীরের দোস্ত মারাঠারা কাজের কাজ কিছু তো করছেই না বরং দিল্লীর লোকদেরই লুটপাট করছে। তবে সন্ধ্যাবেলায় শুনলুম, আবদালীর ফৌজেরা সরে গেলে একবার দরিয়া পার হয়ে ওপারে পটপারগঞ্জ থেকে মির জেবা বাগিচা পর্যন্ত ঢু মেরে এসেছে।

সাবাস হিন্দুস্থানী জোয়ানেরা! সমস্ত হিন্দুস্থান শুদ্ধোই জাহান্নামে গেছে। ছোভানাল্লা!

ভাবছিলুম, মারাঠাদের হঠকারিতায় আবদালী শা ক্ষেপে গিয়ে

সত্যিই বুঝি এবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন দিল্লীর উপর। কিন্তু ৯ই জেল্কদ সকালবেলা খবর পেলুম যে, আগা রাজা আর ইয়াকুব আলি আবদালী শার কাছ থেকে বার্তা নিয়ে ফিরেছে যে, শা আলমগীর বাদশা আর ওয়াজীর শিহাবুদ্দিনকে তাঁর সঙ্গে ভেট করতে বলেছেন। শা আছেন বাদলীতে। সেখানেই তিনি সন্ধির কথাবার্তা বলবেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে যেন বাঁচলুম। আল্লা মেহেরবান। আবদালী শা তবে নাদির কুলির মত দিল্লী লুঠ করতে আসছেন না।

১৫ই জেল্কদ। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই খবর পেলুম যে মাত্র চারজন মোগলাই ফৌজ নিয়ে ওয়াজীর রাত থাকতেই আবদালী শার সঙ্গে মোলাকাত করবার জন্য বাদলী রওনা হয়ে গেছে। সমস্ত দিল্লী শহর আর কেল্লা থমথম করছে। আবদালী শা ওয়াজীরকে কি বলেন কে জানে। সবই নির্ভর করছে শায়ের মর্জির উপর। শা যদি খুশমেজাজ থাকেন তবে হয়তো লালকেল্লা বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু মেজাজ বিগ্‌ড়ে গিয়ে যদি বলেন, দিল্লী আসব—তবেই হয়েছে।

সারাটা দিন হাজার অপেক্ষা করেও কোন খবর পাওয়া গেল না। খবর না পেলে কারোর স্বস্তি নেই। পাগলের মত লোকে একে ওকে জিজ্ঞেস করে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু কিছুই জানা গেল না। ১০ই জেল্কদ অনিশ্চিত অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটলো। আশা করতে লাগলুম—ভোরবেলা নিশ্চয়ই একটা খবর-টবর পাওয়া যাবে। কিন্তু ১১ই জেল্কদ সারাদিনেও কোন খবর পাওয়া গেল না। তাহলে? সমস্ত দিল্লীতে যেন একটা সন্ত্রাসের ছায়া নেমে এল। চাপা হাহাকার ফুটে উঠলো দিল্লীতে। আবদালী শা তবে ওয়াজীরকে খুন করে ফেলেছেন নাকি? দুপুর থেকেই দলে দলে লোক দিল্লী শহর থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু নসিব মন্দ। শহরের দরজা বন্ধ। বাইরে মারাঠা আর জাঠ লুঠেরারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফাঁকে পেলেই সব লুটেপুটে নেবে। একটা চাপা কান্না ফুটে উঠলো যেন সারা শহরে। আমরা নিজেরাও যেন বিহ্বল হয়ে পড়লুম। মালেকা-

ই-জামানী একেবারে চুপ করে আছেন। কোন কথাই বলছেন না তিনি। বুড়ো বাদশা শুনছি খানাপিনা বাদ দিয়ে কুরাণ নিয়ে সারাদিন পড়ে আছেন। আমাদের হয়েছে আরেক জ্বালা। মহলে কয়েদ থেকে থেকে হুজরতের বুঝি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। আবদালী শা'র কথা শুনে আপন মনেই সে সারাদিন খুব জোরে জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাসছে। তাকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। হাসছে তো হাসছেই। অদ্ভুত অবস্থা। দেখে শুনে চোখের পানি ছেড়ে দিলুম আমি। হায় আল্লা! বিপদের উপর আবার একি যন্ত্রণা দিলে তুমি!

সারাদিনটা কেটে গেল এমনিই। সন্ধ্যাবেলা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লুম আমি। এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে রহিমা বাঁদী এসে ঢুকলো মমতাজ মহলে। বলল : শুনেছেন বেগম সাহেবা?

রহিমার কণ্ঠ শুনে আমার বুকটা একটা অজানা আশঙ্কায় লাফিয়ে উঠলো যেন। ফিরে তাকালুম : কি হয়েছে?

—ওয়াজীর সাহেবের খবর এসেছে।

—ফিরে এসেছে সে?

—না বেগম সাহেবা। লোক মারফত খবর দিয়েছেন।

—ওয়াজীর জিন্দা আছেন তো?

—আজ্ঞে বেগম সাহেবা।

—'বল্, বল্, খবর বল্।' রহিমাকে প্রায় হাত ধরে টেনে নিজের কাছে বসালাম। সত্যি, পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নিয়ে এসেছে রহিমা। বাঁদীটা খবরও সংগ্রহ করতে পারে বটে। ওর কাছ থেকে যা শুনলাম—তার অর্থ হল এই : ১০ই জেল্কদ আবদালী শা'র সঙ্গে ভেট করতে পারেনি ওয়াজীর। ভেট হয়েছিল শাহের ওয়াজীর শা ওয়ালী খাঁ-এর সঙ্গে। শা ওয়ালী ১১ই জেল্কদ আবদালী শা'র সঙ্গে মোলাকাত করিয়েছে শিহাবুদ্দিনের।

আবদালী শাকে খুব তাঁতিয়ে রেখেছিল মুঘলানী বেগম। আমি

আগেই জানতুম ছেড়ে দেবার পাত্রী সে নয়। ওয়াজীরকে জব্বর পয়জার মেরেছে সে। আবদালী শাকে কুর্ণিশ জানাতে না জানাতেই খুব ধমকে দিয়েছেন তিনি ওয়াজীরকে: আমীরের মেয়ে ছেড়ে একটা বাঈজীর বেটীকে সাদী করেছ কেন? ওয়াজীর জবাব দিয়েছে, গন্না বেগমকে সাদী করবার জন্য কথা দিয়েছিলাম আমি আলিকুলিকে। সাদী না করলে কথার খেলাপ হোত। মুঘলানী ছিল কাছেই। সেও ধমকেছে ওয়াজীরকে। ওয়াজীরের আব্বাজান মুইন খাঁকে কথা দিয়েছিলেন ছোট বেলায় উমদাবানুর সঙ্গে তার লেড়কার সাদী দেবেন বলে। তার আগেই মুসায়ের আলিকুলির সঙ্গে তার ভেট হয়েছিল নাকি যে, তাকে সে কথা দেবে? সব ঝুটা কথা। ইচ্ছা করে ওয়াজীর তাকে বে-ইজ্জত করেছে, তার বিচার চাই। আবদালী শা জানতে চেয়েছেন মুঘলানী কি করতে চায়? মুঘলানী বলেছে--মুসায়েরের বেটীকে একটা কানাকড়ির দামে বিকাতে হবে উমদার কাছে। সে তার কেনা বাঁদী হয়ে থাকবে। আর সেই সঙ্গে ওয়াজীরকে সবার চোখের উপর উমদাকে সাদী করতে হবে।

ওয়াজীর নাকি গাইগুই করেছিল খানিকটা। শেষে আবদালী শা'র ধমক খেয়ে স্বীকার করেছে যে পেয়ারের বিবি মুসায়েরের বেটীকে সে তালাক দিয়ে বেচে দেবে উমদার কাছে।

তোবা! তোবা! দিল্লীতে আর মানুষ নেই। শ্যাল-কুকুরের অধম হয়েছে মোগল আমীরেরা। নইলে নিজের ঘরের বিবিকে কেউ ধমক খেয়ে বিক্রী করতে চায়? জাহান্নামে যাক উজবুকেরা। সে-জন্যে দুঃখ নেই একবিন্দু। কিন্তু সত্যি এখন দুঃখ লাগছে মুসায়েরর বেটীটার জন্য! তার নসিবে লেখা ছিল বে-ইজ্জত হওয়া। নইলে অযোধ্যা ছেড়ে দিল্লীতে আসবে কেন সে? দিল্লী আসবার আগে সাদী করে আসতে পারল না নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলাকে। এতদিন গালাগাল করেছি। এখন দুঃখ হচ্ছে। আমাদের হজরতের চাইতেও বদ্‌নসিব তার। হাতে পেতে না পেতেই হারালো। আবদালী শা

যখন হুকুম করেছেন, উমদার বাঁদী তাকে হতেই হবে। দুনিয়ার মালিক দুয়া করুন গম্না বেগমকে।

আবদালী শার বড় গোসা হয়েছে—মোগল আমীরদের কাপুরুষতা দেখে। খুব করে বকে দিয়েছেন ওয়াজীরকে : ছি ছি ছি। একটুখানি রুখে দাঁড়াবার হিম্মতও হয় নি? একটা লেজগুটানো কুত্তার মত পয়জার কামড়াতে এসেছে?

ওয়াজীর কোন জবাব দিতে পারে নি।

কাজের কথা পেড়েছেন আবদালী শা সবার শেষে। আর এক কুত্তা ইনতিজাম। রাতের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সে নাকি চুপি চুপি গেছে শায়ের শিবিরে। বলেছে, তাকে ওয়াজীরী দিলে দুইকোটী টাকা নগদ দিতে পারবে? সে যদি এককোটী টাকা দেয় তাহলে তার হাতেই ওয়াজীরীটা রেখে দিতে রাজী আছেন শা।

ওয়াজীরের মুখে কথা নেই। গরীব লোকের উপর অত্যাচার করলে খুদাতালার দরবারে একদিন বিচার হবেই। দিল্লীতে হেন লোক নেই যাকে ঠেঙ্গায়নি শিহাব টাকার জন্য। এখন? এখন সেই টাকার জন্যই তাকে বে-ইজ্জত হতে হোল তো?

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়। ওয়াজীর নাকি বলেছে—তার মত বান্দাকে এক লাখ রুপিয়া দেবার হুকুম করলে তাই দিতে পারবেনা সে—এককোটী টাকা তো দূরঅস্ত্। দিল্লী শহর চষে ফেললেও এক কোটী পাথর-কুচি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। শায়ের কাছে নাকি সে নিজের নাম দস্তখত্ করে ওয়াজীরের পদ ছেড়ে দিয়েছে। হারামজাদা ইনতি-জাম-টা লুকিয়ে ছিল শায়ের শিবিরেই। কুত্তাটাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে এনে শিহাবের সামনেই নাকি ওয়াজীরের পদটা দিয়ে দিয়েছেন আব-দালী শা। তাজ্জব কাণ্ড। মোগল বাদশার ওয়াজীরের পদ কিনা কাবুলের শা দিচ্ছেন বাদলীতে বসে!

তবে শিহাবকে ছেড়ে দেননি আবদালী শা। কয়েদ রেখেছেন নিজের শিবিরে। ভেবেছিলুম শা দিল্লীতে না এসে বাদলী থেকেই ফিরে যাবেন।

কিন্তু তা নয়।। মুঘলানীর কাছে খবর পেয়েছেন যে, দিল্লীতে এলে দুই কোটী টাকা কেন—বিশকোটী আসরফিও পেতে পারেন শা। তাই তিনি দিল্লী আসাই স্থির করেছেন।

আল্লা বে-খুশ মোগলদের উপর। আমরা চিন্তা করে করব কি? একবার নাদির কুলি বে-ইজ্জত করে গেছেন আর একবার হয় তো আবদালী শা করবেন। বে-সরম, বে-তাগদ, কাপুরুষের হারেমের জেনানা হলে এটাই তগদীরে লেখা থাকে। শুধুমাত্র হারেম কেন, এহেন বাদশার যে 'সালামত্' করে তারো কপালে দুর্দশা। তবে গরীব লোকের ভরসা এই যে ১১ই জেল্কদ শায়ের পাঁচজন 'নাসাকচি' ফৌজী আদমি দিল্লী এসে ঘেষণা করে গেছে যে, গরীব আদমির ভয় নেই। আবদালীর শার হুকুমে তাদের উপর হাত পড়বে না।

আবদালী দিল্লী আসবে শুনে রাত্রিবেলা বাকি সব আমীরেরাও পালালো শহর ছেড়ে দরওয়াজার ফৌজেদের ঘুষ দিয়ে। কিছু দিতে হল মারাঠা আর জাঠদেরও। তবু পালাতে হবে। আবদালী ঢুকলে পিটুনির চোটে আর পিঠের চামড়া থাকবে না।

১২ই জেল্কদ জুম্মাবার। বাদশা আলমগীর নামাজ পড়তে গেছে মতি মসজিদে। ওদিকে মির বক্শী সইফুদ্দিন মহম্মদ কাশ্মীরী রৌসন-উদ্দৌলা মসজিদে গিয়ে সদর কাজী আর মুফ্তিদের নাকি হুকুম করেছে আবদালী শা'র নামে খুত্বা পড়তে। হায় আল্লা!

তবে তো সব গেল। বুড়ো-বাদশাটা আর বসে কেন? বাদলীতে গিয়ে আবদালী শা'র পয়জার কামড়ে ধরুক গে? শুনলুম, শুধুমাত্র রৌসন-উদ্দৌলা মসজিদ নয় জামি-মসজিদেও খুত্বা পড়া হয়েছে আবদালীর নামে। তোবা! তোবা!

এখন যেন এ-সব কথা হাওয়ার চাইতেও বেগে ছড়াচ্ছে দিল্লীতে। দেখতে দেখতে সারা হারেমে খবর ছড়িয়ে গেছে। রহিমা বাঁদী ছুটতে ছুটতে এসে বলল: বেগম সাহেবা, দেখবেন শিগ্গীর আসুন।

রহিমাকে দেখলেই এখন বুক কাঁপে। কি খবর আবার কে জানে। মহল থেকে ছুটে বাইরে এলুম উঠানে। বললুম : কি রে?

—'ঐ দেকুন বেগম সাহেবা।' রংমহল আর খোয়াব ঘরের দিকে আঙুল তুলে ধরলো সে।

তাকিয়ে দেখলাম—আলমগীর বাদশা। নামাজ পড়তে পড়তে তার কানেও বোধহয় খবরটা গেছে। আবদালীর নামে খুত্‌বা পড়া মানে গদি যাওয়া। বাদশার মহলে আর তবে থাকা যায় কি করে? লেড়কা বাচ্চা আর বেগমদের হাত ধরে আলমগীর দেখি বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতের চাবি নাজিরকে দিয়ে শা-বুরুজের মাঠের দিকে চলেছে সে।

অপদার্থ কোথাকার! তাগদ নেই তার আবার বাদশা হবার সখ! এতগুলো বেগমকে এখন খাওয়াবে কি উজবুক্‌টা?

খবর বুঝি গেছিল হজরতের কানেও। সে দেখি উঠে এসে উঠানে নেমেছে। দেখতে এয়েছে বুড়ো বাদশাকে।

চম্‌কে উঠে বললুম : একি করছিস! আলমগীরের হুকুমে' তোর বাইরে বেরুনো নিষেধ না?

হেসে কুটিকুটী হজরত। বললঃ আম্মা তোমার মাথার ঠিক নেই। আলমগীর আর বাদশা আছে নাকি যে আমি তার হুকুম মানবো? ও উজ্‌বুকটা তো এখন ফকির। তাগদ নেই উল্লুকটা বলে আমায় সাদী করবে। শাজাদীকে ইজ্জত দেবার মুরাদ আছে তার?

কি আর বলব হজরতকে,—অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

হজরত বলল : দেখছ কি আম্মা। ও বুড়ো-বাদশাটার নসিবে অনেক দুঃখ। শা-বুরুজ মহলে ওকে থাকতে দেবে নাকি শা!

আমি বললুম : থাক। ও-কথা আর বলিস নে। আহারে! মায়া লাগছে বুড়োটাকে দেখে।

বুড়োর অবস্থা দেখে কেমন এক অজানা আশঙ্কায় আমিও যেন কুঁকড়ে গেলাম।

১৩ই জেল্কদ—সকালবেলা মতি মসজিদে আজান উঠবার আগেই শুনলুম—হজরত যা বলেছিল তাই ঠিক। শা বুরুজ-মহলেও থাকতে দেওয়া হয় নি বাদশাকে। রোহিলা নাজিব শা-বুরুজ থেকে খেদাতে খেদাতে তাকে নামিয়ে দিয়েছে বাঁদী-মহলে। আল্লাতালার মনে কি আছে কে জানে। হয়তো আমাদেরও এ-মহল থেকে নামিয়ে ছাড়বে রোহিলা নাজিব। ভয়ে যেন সেঁধিয়ে গেলাম।

দুটো দিন দিল্লীতে যেন একটা হৈ চৈ কাণ্ড চলছে। দরিয়ার পান্‌সীতে হাল না থাকলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। যার যা খুশী তাই বলছে, যার যা খুশী তাই করছে। হারেমের বান্দা বাঁদীদের আজাদী জমানা এখন। খাসমহলের বৈঠকখানায় সকলের চোখের সামনেই দেখি তারা সরাব খাচ্ছে। যে শিষমহলে শাজাদী আর বেগম ছাড়া আর কারো গোছল করবার হুকুম নেই, সেখানেই খোসবাই পানিতে মনের খুশ্‌মত নাহাচ্ছে বাঁদীরা। দুনিয়ার মালিক আমাদের উপর বে-খুশ নন বলেই বোধহয় রহিমাটা এখনো বে-আদবী করছে না। কি যে হবে খুদা মালুম।

১৪ই জেল্কদ সংবাদ পেলাম যে, আবদালী শা বাদ্‌লী ছেড়ে ওয়াজীর-বাদে এসে পৌঁচেছেন। শা কিজিবিলাস ফৌজেরা নাজিবের হাত থেকে কেল্লার দায়িত্ব নিয়েছে। বহুদিন পরে খুব ঝাড়পোঁছ হচ্ছে কেল্লা। ভয়ে আমাদের মুখ বন্ধ। কখন হুকুম হয় মহল ছেড়ে দেবার জন্য কে জানে।

কিন্তু দেখলুম রোহিলাদের মত অসভ্য নয় কিজিবিলাসেরা। কিছু খারাপ ব্যবহার করছে না কারো সঙ্গে। হিন্দুস্থানের মুসলমানেরাই বুঝি শুধু বয়ে গেছে—জেনানার পর্যন্ত ইজ্জত দিতে জানেনা। নাদির কুলি দিল্লী এসে মোগল বাদশা বা তাঁর হারেমকে অপমান করেন নি। কিজিবিলাসদের যা চলাফেরা দেখছি তাতে মনে হয় আবদালী শাও খুব একটা ইজ্জতে হাত দেবেন না।

১৬ই জেল্কদ রাত্রিবেলা খবর পেলাম, আবদালী শা খিলাৎ পাঠিয়ে-ছেন আলমগীরকে। হিন্দুস্থানের বাদশা থাকবে আলমগীরই। সকাল-

বেলা মোগল বাদশাকে ওয়াজীরাবাদ গিয়ে ভেট করবার জন্য হুকুম করেছেন শা। যাক, বাঁচা গেল! সমস্ত হারেমে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যেন সবে।

বদ্ মতলব থাকলে আবদালী শা এমন ভাল ব্যবহার করতেন না আলমগীরের সঙ্গে। বান্দা বাঁদীদের দাপাদাপি কমবে।

শাহী ফরমান যখন এসে গেছে তখন নিশ্চয়ই আবার তাড়াতাড়ি খোয়াব ঘর আর রংমহলে বেগমেরা উঠে আসবে। কিন্তু স্বস্তি অনুভব করতে করতেই আবার অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। আলমগীর বাদশা ক্ষমতা ফিরে পেলে আমাদের হুজরতের অবস্থা হবে কি? সে কি আবার মমতাজ মহলের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে নাকি?

সত্যি! নসিবে সুখ নেই একবিন্দু। নইলে মানুষের চতুর্দিক থেকে এত যন্ত্রণা হতে পারে?

১৭ই জেল্কদ ভোরবেলা আলমগীর বেরুলেন তকৃত-ই-রাওয়ান করে। একটা হাতী আর ঘোড়ার পিঠে গেল বাদশার দামামা। শুনলুম মুসায়েরের বেটী—ওয়াজীরের বেগম গন্নাকেও বাদশা নিয়ে গেছে শায়ের হুকুম মত। তায়ে নাকি বাঁদী করে দেওয়া হবে উমদা বানুর। হায় আল্লা! মানুষের কি অদ্ভুত নসিব!

সারাদিন সকলেরই এক অসহ্য অস্বস্তিতে কাটলো। আবদালী শা কি ব্যবহার করেছেন মোগল বাদশার সঙ্গে কে জানে। শাহেন-শাদের মেজাজের তো ঠিক নেই। এই খুশমেজাজ তো এই বে-খুশ। আলমগীরের সঙ্গে ব্যবহারের উপর নির্ভর করছে দিল্লীর ভাগ্য। যদি ভাল ব্যবহার করেন তো —দিল্লীর উপর খুব একটা অত্যাচার হবেনা। এখন খুদাতালা জানেন কি হচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলা দলবল নিয়ে আলমগীর বাদশা ফিরে এল দিল্লীতে। শহরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো। আবদালী শা মোটেই দুর্ব্যবহার করেন নি বাদশার সঙ্গে। নিজে উঠে এসে হাত ধরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন আলমগীরকে। নিজের গালিচায় পাশাপাশি বসিয়েছেন। শুধু

তাই নয়, দরবার শুদ্ধো আদর করে খুব খাইয়েছেন সকলকে। বাদশার সঙ্গে পাগড়ি বিনিময় করেছেন। নয়া ওয়াজীর ইনতিজামকেও খিলাৎ দিয়ে বাদশার সঙ্গে দিল্লী পাঠিয়েছেন। আল্লা মেহেরবান। দিল্লীর মানুষদের রক্ষা করুন। তৈমুর লঙের মত অকারণে যেন মানুষের জীবন নিয়ে খেলা না হয়।

১৮ই জেল্কদ আবদালী শার কিলিবিলাস বান্দা জাহান খাঁ নিজে দেখেশুনে শা'-এর কেল্লায় ঢুকবার বন্দোবস্ত পাকা করে গেলেন। পর দিনই শা আসবেন দিল্লীতে। হুকুম হল বাজার থেকে কেল্লা পর্যন্ত শায়ের পথের ধারে যেন কোন হিন্দুস্থানী দাঁড়িয়ে না থাকে বলাতো যায় না, কেউ হঠাৎ যদি কিছু একটা করেই বসে! বাজারের দোকানপাটও বন্ধ রাখবার হুকুম হোল। দিল্লীতে এক অদ্ভুত উত্তেজনা।

১৯শে জেল্কদ জুম্মাবারে শা ঢুকলেন কেল্লাতে। কিজিবিলাস ফৌজেরা রাস্তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে তোপ দেগে সালামত্ জানালো শাকে। বাদশা ফতেপুরী মসজিদ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আবদালী শাকে সালামত্ জানিয়ে কেল্লায় নিয়ে এল।

শায়ের বেগমেরা উট আর ঘোড়ার পিঠে চেপে একেবারে এসে হারেমের মধ্যে ঢুকলো। এসে দাঁড়ালো খাসমহলের মাঠে। বান্দা বাঁদীরা একেবারে চুপ। শায়ের বেগমদের খিদমত খাটবার জন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলুম আলমগীরের বেগমেরা। লজ্জা! লজ্জা! শেষে মোগল বাদশার বেগমদের এত অধঃপতন! হবেই বা না কেন। শায়ের মর্জি না হলে আলমগীর বাদশা এতক্ষণ গদিতে থাকতো নাকি! নাদির কুলির সময় আমাদেরও তো হারেমের বাঁদী সেই সিতারা-বাঈ-টাকে সালামত্ জানাতে হয়েছিল।

দূর থেকে শায়ের বেগমদের তাকিয়ে দেখলুম। কাছে যাবার আমাদের হুকুম নেই। খিদমত খাটার চেয়ে দূরে থাকা ভাল। এখন ভালয় ভালয় সব কেটে গেলে হয়।

আমরা মূর্খ, তাই লুঠেরার কাছেও ভাল ব্যবহার আশা করি।

সাদী করে কেউ বেগমের গতর ছুঁবে না এটা হয় নাকি! মেহনত করে দিল্লী এসে ফকির সেজে বসে থাকবেন আবদালী শা একথা ভাবাই তো অন্যায়। শাহের ফৌজেরা যদি পরাজিত দেশের উপর একটুখানি হাম্বিতাম্বিই করতে না পেল—তাহলে আর পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে হিন্দুস্থানে আসায় তাদের ফয়দা কি?

শাহী ফৌজেরা বসে গিয়েছিল শহরের বাজার, রাস্তাঘাট সর্বত্র। চুপ করে তারা বসে থাকতে পারে? শাহের পরোয়ানার অপেক্ষা না করে সেই সন্ধ্যাতেই লুঠতরাজ আরম্ভ করে দিল তারা। বড়বাজার আর বাদলপুরাতে আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দিল কিজিবিলাসেরা। কিছুই নয়। সবে তো শুরু। কি ঘটবে এ তার আভাষ মাত্র। খবর পেয়ে মুখ শুকিয়ে উঠলো আমাদের। শুনলাম হিন্দুদের উপর হুকুম হয়েছে কপালে তিলক কেটে রাস্তায় বেরুতে, যাতে করে আবদালী ফৌজেরা তাদের চিনতে পারে। আর যা-ই হোক কাফের হিন্দুদের তো ক্ষমা করা যায় না!

আবদালী শার আসল চেহারা ধরা পড়লো পরদিন দরবারে। নয়া ওয়াজীর ইনতিজাম কথা দিয়েছিল তাকে যদি ওয়াজীর করা হয় তবে দুই কোটী টাকা দেবে সে শাকে। শা বললেন: তড়িঘড়ি টাকা নিয়ে এস।' শুনে নাকি ইনতিজামের চোখ কপালে উঠে গেছে। ওয়াজীরের পদ পাবার লোভে সম্ভব অসম্ভব বিচার না করেই সে টাকার কথা বলেছিল। কিন্তু টাকা কোথায় যে দেবে? 'না' করবারও উপায় নেই, মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবেন শা!

ওদিকে শিহাবুদ্দিনের অবস্থা আরও খারাপ। শা বলেছেন, আড়াই বছর ওয়াজিরী করে কেল্লার হারেম থেকে যে-সব জিনিষ সরিয়েছ সব বের করে দিতে হবে। শিহাব গড়বড় করলে কিজিবিলাস ফৌজ দিয়ে সবার সামনে ঘাড় ধরে গালে থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছেন। তোবা! তোবা! গলায় দড়ি দেওয়া উচিত শিহাবুদ্দিনের।

আবদালী শা শেয়ানা বটে, দিল্লী ঢুকে প্রথমেই ফৌজ দিয়ে ঘিরে

ফেলেছিলেন শিহাবের মহল। যাতে লুকিয়ে ফেলতে না পারে কিছু। জিনিষপত্র কিছু না পেলে সমস্ত ঘরবাড়ি নাকি কুপিয়ে দেখবেন শা।

বোঝা যাচ্ছে, আটঘাট বেঁধে, ঝোপঝাপ জেনেশুনেই দিল্লী ঢুকেছেন শা। যাদের ধরলে টাকা পয়সা পাওয়া যাবে, তাদেরই ধরে এনেছেন দরবারে। নিশ্চয়ই খবর দেবার লোক আছে। খুব গোপনে নাজির রজ আফজুনের কাছে জানতে পারলুম যে, ঘর শত্রুর কাজ করছে মুঘলানী বেগম। দিল্লীর পথঘাট, ঘরবাড়ির সন্ধান দিচ্ছে সে-ই। শুধু ইনতিজাম আর শিহাব নয়, ইনতিজামের বান্দা সাঙ্গিবেগ আর আবদার রহমান, আলমগীরের খোজা বসন্ত খাঁ, আরও সব আমীর ওম্‌রা, সবাইকে ধরে এনে টাকাকড়ি ধন-দৌলতের জন্য খুব ঠেঙ্গিয়েছেন আবদালী শা। এসব দেখে শুনেই রজ আফজুন খবর পাঠিয়েছেন যে, গয়নাগাঁটি টাকা পয়সা যদি কিছু থাকে, তাহলে যেন মহলের মেঝের নিচে পুঁতে রাখি। ভাবসাব যা বোঝা যাচ্ছে তাতে আবদালী শা হারেমের উপর হাত দেবেই।

কিন্তু ধন-দৌলতের ভাবনা আমাদের নেই। সেই নাদির কুলির সময় যে সব কিছু লুকিয়ে ফেলেছিলাম—আজ পর্যন্ত তা তেমনিই আছে। বের করলে আফগান লুঠেরারা কেন, ঘরের বাদশাই লুটে নিত। যায় ঐ বুড়ো বাদশাটার যাবে, আর যাবে বড় বড় আমীর ওম্‌রার। দেখিনা ঘটনা কতদূর গড়ায়।

শুনছি ইনতিজাম নাকি মুখ আমসী করে দরবারেই বসে আছে। টাকার জন্য বেরোয় নি। এতক্ষণে বোধহয় বুর্বকটা বুঝতে পেরেছে যে, দুই কোটী টাকা তো দূরস্থান—দিল্লী ঝেড়েপুঁছে তুললেও এক লক্ষ তঙ্কা বেরোবে না। কিন্তু শা তা শুনবেন কেন—পায়ের নিচে বেত মেরে আধমরা করে ফেলেছেন তাকে। বলেছেন—টাকা না দিলে পাঁজরে চেপে মারবেন তাকে। ভয়ে মুখে নাকি একছিটে রক্ত নেই ইনতিজামের। বেশ হয়েছে। কুত্তাটার এই শাস্তিই হওয়া উচিত। কর্ হারামজাদা, ওয়াজিরী কর এখন! শা ছাড়বার পাত্র নন।

বলেছেন, গোপন গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি, কোথায় আছে বলতে হবে তাকে। ভয়ে ভয়ে নাকি ইনতিজাম বলেছে যে, সে এসব কিছু জানে না। জানে তার আম্মাজান সোলাপুরি বেগম।

যাবে কোথায় হারামজাদারা। এতকাল যে বেইমানী করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেনা? সোলাপুরি বেগমকেই টেনে এনেছেন শা দরবারে। বলেছেন, টাকা কোথায় আছে বল। নইলে নখের নিচ দিয়ে আলপিন ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। শায়ের হুমকি শুনেই মূর্চ্ছা হয়েছিল সোলাপুরি বেগমের। ভয়ে ভয়ে সব বাতলে দিয়েছে। ছয় ঘণ্টা ঘরবাড়ি খুঁজে ইনতিজামের সব কিছু বের করে নিয়েছে আফ-গানেরা। নগদ টাকাই পায় ষোল লক্ষ। তাছাড়া সোনাদানা, মণি-মুক্তা জহরৎ তো আছেই। সব গেছে ইনতিজামের।

পুরানো মির বক্‌শী সামসাম উদ্দৌলার ঘরবাড়ি খুঁড়েও নাকি সব নিয়ে নিয়েছে আফগানেরা। দিল্লীর কোতোয়ালের বাড়িও বাদ যায়নি। ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে আফগানেরা। দিল্লীতে একটা কানাকড়িও নাকি রেখে যাবেনা আবদালীর ফৌজেরা। বুঝুক, বুঝুক এখন মোগল আমীরেরা যে, জেনানা, মদ, আর গাঁজা ভাঙ নিয়ে দিন কাটালে এমন শাস্তিই ভোগ করতে হয়।

সব খবরই হারেমে আসছে। শুনছি ঘরে ঘরে নজরানা দাবী করেছেন আবদালী শা। নজরানা আদায়ের জন্য দিল্লী শহরকে আফগান ফৌজেদের হাতে ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আমীরদের ডেকে এনে মারধোর করা হচ্ছে। কালাপোশ সর্দার বসেছে চারদিকে টাকা আদায়ের জন্য। না দিয়ে রেহাই নেই কারো। মারের চোটে ঘরে ঘরে কান্নার শব্দ উঠেছে। যার যা আছে বিক্রী করে টাকা চাচ্ছে —নজরানা দিতে হবে শাকে। কিন্তু কিনবে কে? কেনার লোক নেই। ভয়ে কেউ জহর খেয়ে মরছে, কেউবা ফাঁসী দিচ্ছে নাদির-কুলি কুড়ি হাজার লোক মেরে যা করতে পারেন নি, তার চাইতে বেশী অত্যাচার চলছে। দিল্লী নাজেহাল। হায় আল্লা! রোজ কেয়ামতের

দিন নেমে এসেছে কি না কে জানে। হারেম এখনো বাকি। হারেমের ইঁট কাঠ পর্যন্ত এবার হয়তো খুলে নেবে আফগানেরা। খবর পেয়ে খানাপিনা সব বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের। মোগল বাদশা আর ফকিরে এখন তফাৎ কি? হারেমে ঢুকে জান নিলেও তো এক কানাকড়ি পাবেন না আবদালী শা। হায় খুঁদাতালা! তোমার বান্দাদের তুমি না দেখলে আর কেউ দেখবার নেই।

ভয়ে সবাই আধমরা হয়ে আছি। কখন আবদালী শার পরোয়ানা এসে হারেমে ঢুকে কে জানে। রহিমা বাঁদীটাকে আর বাইরে যেতে দিইনা। আড়ালে থেকে যদি শায়ের নজর আমাদের উপর না পড়ে তো বাঁচি। হারেমের বেড়ালটাও উঠানে চলাফেরা করলে যেন ভয় লাগে। মনে হয় আবদালী শার কোন ফৌজ ঢুকলো 'রুপিয়া নিকালো' বলে।

সন্ধ্যাবেলাতেই চিরাগ নিভিয়ে বসেছিলাম আমি, মালেকা-ই-জামানী আর হজরত বেগম। পায়ের কাছে বসেছিল রহিমা। চোখে কারো ঘুম নেই। একটা পাখির পালক পড়লেও যেন শুনতে পাচ্ছি। খোয়াব ঘর থেকে আবদালী বেগমদের হৈ-হুল্লোড়, হাসি তামাসা শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ মমতাজ মহলের উঠানে কার পায়ের শব্দ শুনে মড়ার মত ফেঁকাসে হয়ে গেলাম সবে। টুক্‌টুক্‌ করে দরওয়াজায় কার হাত পড়ছে। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও থেমে গেলাম আমরা। গলা দিয়ে যেন স্বর বেরুচ্ছে না। শব্দ হয়েই চলেছে। মালেকা-ই-জামানী রহিমাকে বললেন: যা, কি আর করা যাবে। দরওয়াজা খুলে দিয়ে আয়।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে গেল রহিমা।

আমি কালমা পড়তে লাগলুম।

দরজা খুলে দিয়েই দৌড়ে ছুটে এল রহিমা। আমরা তিনজনেই অনুচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলুম! রহিমা বলল: ভয় পাবেন না বেগম সাহেবারা। চিরাগ জ্বালি। নাজির সাহেব এয়েছেন।

'খুদা মেহেরবান।' বাঁচলুম যেন। চিরাগ জ্বেলে রহিমা মহল আলো করল।

ধীরে ধীরে নাজির রজ আফজুন এসে ঢুকলেন হারেমে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—মড়ার মত ফেঁকাসে মুখ।

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: কি হয়েছে নাজির সাহেব? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

ক্ষীণ কণ্ঠে নাজির বললেন: বেগম সাহেবা, বড় দুঃসংবাদ।

—কি হয়েছে? ভীতার্ত দৃষ্টিতে আমরা তিনজনেই নাজিরের দিকে তাকালুম।

নাজির বললেন: আবদালী শা বড় বে-সরম হুকুম করেছেন।

—কি?

—আমাদের কসুর নেবেন না বেগম সাহেবারা, আবদালী শার হুকুম।

নাজিরের ভাব দেখে আমাদের কপালের পানি যেন শুকিয়ে গেছে।

কাঁপতে কাঁপতে মালেকা-ই-জামানী বললেন: বলুন নাজির সাহেব। আবদালী শা টাকাকড়ি চেয়ে পাঠিয়েছেন?

—না।

—তবে?

একটু থেমে থাকলেন নাজির সাহেব। আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলুম। ধীরে ধীরে নাজির বললেন: আবদালী শা শাজাদী হজরত বানুর পানি প্রার্থনা করেছেন।

যেন চিৎকার করে উঠলেন মালেকা-ই-জামানী: কি বললেন!

নাজির বললেন: আবদালী শাজাদী হজরত বানুকে সাদী করতে চেয়েছেন।

বাজ পাখি ছোঁ মারলে একটা পাখির বাচ্চা যেমন কুঁকড়ে যায়—তেমনি সংকুচিত ভঙ্গীতে সন্ত্রস্থ হজরত বেগম আমাকে জড়িয়ে ধরে

বুকের মধ্যে মুখ লুকালো। যেন আমার বুকে মুখ লুকালে তুনিয়ার সমস্ত অন্যায়ের হাত থেকে সে মুক্ত। কিছুকাল থ' বনে থেকে মালেকা-ই-জামানী বললেন : আবদালী শা, হজরতের কথা জানলেন কার কাছে ?

—মুঘলানী বেগমের কাছে।

চিৎকার করে উঠলাম আমি : তুষ্‌মন! তুষ্‌মন মুঘলানী বেগম! নিজে সে ইজ্জত হারিয়েছে, এখন মোগল হারেমের ইজ্জত নিতে চায় সে।

হঠাৎ যেন ছিলাকাটা ধনুকের মতন ছিটকে উঠলেন মালেকা-ই-জামানী : —না, তা হবেনা। আমার বেটীকে আমি গলা টিপে মারব তবু এ সাদী দেব না। তু-দিন পরে যে কবরে যাবে তার সঙ্গে দেব হজরতের সাদী ? না তা হবেনা। শুনছি কুষ্ঠ হয়ে তার নাক খসে গেছে, কান খসে গেছে—তবু একি বদ্‌খেয়াল আবদালী শার! খুদা-তালার ভয় নেই! জাহান্নামে, দোজখে যাবে আব্‌দালী।

লজ্জায় মাথা নিচু করে নাজির বললেন : কিন্তু বেগম সাহেবা, আব-দালীর হুকুম যদি তামিল না হয়, তিনি ক্ষেপে যাবেন। লালকেল্লাকে ধূলোর সঙ্গে গুড়িয়ে দেবেন তিনি। জানেন না, হাজারে হাজারে জেনানা আদমি ধরে নিয়ে গেছে আফগানেরা। বহু জেনানা জহর খেয়ে মরেছেন। লালকেল্লার কথা ভেবে, দিল্লীর কথা ভেবে, অমত করবেন না বেগম সাহেবা।

তুটো মৃত নিস্তব্ধ চোখের মত জ্যোতিহীন চোখে মালেকা-ই-জামানী তাকালেন হজরতের দিকে। হজরত আমাকে আরো কঠিনভাবে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো : না, না, এ-সাদী আমি করব না আম্মা।

রজ আফজুন আর একটু এগিয়ে এলেন। হজরতকে সালামত্‌ জানালেন। বললেন : শাজাদী, দিল্লীর কথা, সাধারণ মানুষের কথা ভাবুন। আপনি অমত করলে মোগলদের সর্বনাশ হবে।

হাহাকার করে কেঁদে উঠলো হজরত, তার মুখে কোন কথা সরল না।

আমি জানি কত ভালবাসে হজরত তার নিজের উদ্গত যৌবনকে। কত স্বপ্ন দেখে সে। একটা গলিত কুষ্ঠ রোগীর কাছে কি কেউ এ যৌবনকে স'পে দিতে চায়! না, না। তা হয় না। হজরতকে বাঁচাতে হবে। আমি তাকালুম নাজিরের দিকে : নাজির সাহেব?

শির নুইয়ে নাজির জবাব দিলেন : হুকুম করুন বেগম সাহেবা?

—কোন কি পথ নেই হজরতকে বাঁচাবার?

—কি পথ আছে বেগম সাহেবা?

—আপনি মুঘলানীর সঙ্গে ভেট করতে পারবেন?

কিছুক্ষণ ভাবলেন রজ আফজুন। তারপর বললেন : চেষ্টা করলে হয়তো পারি বেগম সাহেবা।

—যান তবে তার সঙ্গে মোলাকাত্ করুন।

—কেন বেগম সাহেবা?

—জানুন, মুঘলানী কত টাকা চায়। যত টাকা চায় দেব। আবদালী শাকে সে শুধু বুঝিয়ে বলুক্—যে হজরত দেখতে কুৎসিত।

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে নাজির বললেন ; হ্যাঁ, আপনি মন্দ বলেন নি বেগম সহেবা। আমি যাচ্ছি।

তৎক্ষণাৎ তিনি আমাদের কুর্ণিশ জানিয়ে মমতাজ মহল ত্যাগ করে গেলেন।

আবদালী শা আছেন মোগল হারেমের খাসমহলে। সেখানেই আছে—মুঘলানী বেগম। খুব বেশী সময় লাগবেনা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যাবে মুঘলানীর মনোভাব। তবে অর্থের লোভ তার প্রচণ্ড এ-কথা আমি জানি। ছুনিয়ার মালিক মুখ তুলে চাইলে হজরত হয় তো কুষ্ঠরুগীটার হাত থেকে রেহাই পাবে।

প্রচণ্ড উদ্বেগে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

নাজির রজ আফজুন ফিরলেন প্রহরখানিক পরে। আমরা এক সঙ্গে প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম তার দিকে : কি খবর নাজির সাহেব?

ভগ্নকণ্ঠে নাজির বললেন : না, হলনা বেগম সাহেবা।

—হলনা !

—না। মুঘলানী রাজী না হওয়াতে স্বয়ং বাদশা আলমগীর অনুরোধ করেছিলেন আবদালী শাকে। বলেছিলেন যে, শাজাদী হজরত বানু একজন মোগল শাজাদার বাগদত্তা। কিন্তু তবু শোনেন নি শা। বলেছেন, শাজাদীকে না পাওয়া গেলে লালকেল্লাকে তিনি গুঁড়িয়ে দেবেন।

এ-খবর শুনে বুক চাপড়ে হাহাকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন মালেকা-ই-জামানী।

নাজির তাকালেন হজরতের দিকে।

হজরত প্রবলভাবে চিৎকার করে উঠলেন : না, না। আমি জহর খাব তবু ঐ কুষ্ঠ রুগীকে সাদী করব না।

নাজির বললেন : শাজাদী, তৈমুরের রক্ত আপনার মধ্যে রয়েছে। আপনি তো সাধারণ মেয়ের মত নন। সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের দায়ভাগ আপনারও। দিল্লীর এতগুলো মানুষের মুখ তাকিয়ে আপনি নিজেকে ত্যাগ করতে পারবেন না ?

হুঁ-হুঁ করে কেঁদে ফেললো হজরত বেগম।

নাজির বললেন : আপনি কথা দিন শাজাদী।

হজরত কোন কথা বলতে পারলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

—কই বলুন ?

ক্রন্দনার্ত কণ্ঠে হজরত বলল : কি কথা ?

—খুদার নামে কসম করুন, আবদালীকে আপনি সাদী করবেন ?

আবার ফুঁপিয়ে উঠল হজরত।

নাজির বললেন : এতগুলো মানুষের কথা আপনি ভাবুন।

—আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

—কিন্তু ভাবতে যে হবে শাজাদী ?

—কি করব ?

—কথা দিন।

—কি কথা ?

—আবদালী শাকে আপনি সাদী করবেন ?

—করব।

—খুদার কসম ?

—খুদার কসম।

—আল্লা মেহেরবান আপনার ভাল করুন শাজাদী।

বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধীর পদক্ষেপে নাজির রজ আফজুন আমাদের মহল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হজরত বেগম।

১৫ই জেলহজ্জ। কেল্লা ছেড়ে বাইরে এসেছি। শুধু হজরত বেগমকেই নয়, মোগল হারেমের বহু জেনানাকেই ধরে নিয়ে চলেছেন আবদালী শা। আমরাও বাদ যাইনি। ভালই হয়েছে। হজরত বেগমকে ছেড়ে বাকি জীবনটা লালকেল্লায় কাটাতুম কেমন করে ? খুদা মেহেরবান, শেষ পর্যন্ত একটি উপকার করেছেন, কন্যার কাছ ছাড়া করেন নি আমাদের।

কেল্লার বাইরে সারে সারে হাতী দাঁড়িয়ে আছে। মোগল হারেমের বিরাট এক অংশই যেন সওয়ার হয়েছে। শুধু টাকা পয়সা নয়, মোগল হারেমের ইজ্জতও দিতে হয়েছে আলমগীর বাদশাকে লালকেল্লার ইটগুলো রাখবার জন্য। হাওদায় উঠে দেখি শুধু আমরা নই, বসে আছে আরও অনেকে। লালকেল্লা ছেড়ে আবদালী শার হারেমে চলেছে আহমদের বেটী মুহ্‌তারম উন্নিসা, আলমগীরের মেয়ে গহর উন্নিসা, দাবার বক্‌সের কন্যা আইফৎ উন্নিসা, সবাই। যেন

মোগল শাজাদী আর বেগমদের মিছিল চলেছে এই লুঠেরা আফগানটার সঙ্গে।

দুঃখ নেই। ভালই চলেছি। দুনিয়া আর জেনানা বীরেদের জন্যই। বুড়ো হোক, জোয়ান হোক—একজন বীর পুরুষই তো আমাদের নিয়ে চলেছেন! অস্থাবর সম্পত্তির মত জেনানা আদমি কবে কোথায় স্থির থাকে?

তবু, তবু কেন যেন বুকের মধ্যে কেমন করছে। তাকাতে পারছি না লালকেল্লার দিকে। সমস্ত অন্তরাত্মা যেন হাহাকার করে উঠছে। সেই কবে কৈশোর না অতিক্রম করতেই এসে ঢুকেছিলাম মোগল বাদশার বেগম হয়ে হারেমে, আজ বার্ধক্য আসছি আসছি করছে। নাড়িতে নাড়িতে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন মোগল হারেম জড়িয়ে গেছে। সুখ পাইনি কোনদিন। তবু যেন কেমন মায়া পড়ে গেছে।

চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে হাতীগুলো খিজিরাবাদের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে চোখের উপর থেকে হারিয়ে যাবে চিরকালের চেনা লালকেল্লা। একে একে ভেসে উঠছে ভেতর থেকে রং মহল, দেওয়ানী খাস, খাস মহল, হামাম, মতি মসজিদ, শা বুরুজ, মমতাজ মহল, সব। আমার রক্তের সঙ্গে যে মিশে গেছে ওরা। ভুলি কেমন করে?

অপরাহ্ণ নেমেছে দিল্লীর আসমানে। ম্লান হলুদ সূর্যের আলো পড়েছে শ্বেত মর্মর খচিত হারেমে। নিস্তব্ধ, বিমর্ষ, ম্লান লালকেল্লা। যেন সন্ধ্যা নেমেছে মোগল সাম্রাজ্যের উপর,—মোগল সন্ধ্যা। এ ম্লান সন্ধ্যার শেষ নেই।

অঝোরে অশ্রু ঝরছে দুই চোখ বেয়ে। আমি কাঁদছি, কাঁদছেন মালেকা-ই-জামানী। কাঁদছে হজরত বেগম, মুহ্‌তারম উন্নিসা, গহর উন্নিসা, আইফৎ উন্নিসা, সবাই। এ কান্নাকে রোধ করব কি দিয়ে?

শেষ